নিরীক্ষা

অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২৩

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি) এর গণমাধ্যম সাময়িকী

২৪৮তম সংখ্যা

বাঙালির বিজয়গাথা

নিরীক্ষা

২৪৮তম সংখ্যা: অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২৩

বাঙালির স্বাধিকার তথা স্বাধীনতাসংগ্রামের গৌরবময় দিন ১৬ ডিসেম্বর। ১৯৭১ সালের এই দিনে বাঙালির চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হয় হানাদার পাকিস্তানিদের আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে। আজ আমরা গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় স্মরণ করছি সকল শহিদের আত্মদান ও সম্ভ্রম হারানো মা-বোনদের। স্মরণ করছি বাংলার অবিসংবাদিত নেতা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে, যাঁর ডাকে সর্বস্তরের মানুষ মরণপণ লড়াই করে দেশকে স্বাধীন করেছেন।

বাঙালির মতো গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস আর কোনো জাতির নেই। সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সামনে রেখে স্বাধীনতা ঘোষণার পর সফলভাবে সশস্ত্র যুদ্ধের মধ্য দিয়ে বিজয় অর্জনও সব জাতিকে করতে হয়নি। শুধু রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ নয়, বাঙালি প্রাণপণ যুদ্ধের মাধ্যমে শক্তিশালী পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে পরাজিত করেছিল। হাজার বছরের ইতিহাসে ভাষাভিত্তিক বাঙালিত্বের পরিচয়ে এবং বাঙালি জাতীয়তার ভিত্তিতে এমন শৌর্যবীর্যময় বিজয় বাঙালির জাতীয় জীবনে আগে কখনো ঘটেনি। বাঙালি সেই অনন্যসাধারণ কাজটি করেছে বলেই তাঁদের কাছে বিজয় দিবসের তাৎপর্য ও ব্যঞ্জনা অপরিসীম। সহজ করে বললে–বাংলাদেশের গণমানুষ বীরত্বপূর্ণ ও গৌরবময় অধ্যায় রচনা করেছে মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে।

ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে পাকিস্তানি অপশাসনবিরোধী প্রতিটি আন্দোলনে এক অনিবার্য চেতনা আমাদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক জীবনে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে ছিল। 'মুক্তি' আন্দোলনের গণজাগরণ ও সংগ্রামী চেতনার স্পর্শে এক অপরিমেয় সম্ভাবনায় উজ্জীবিত হয়ে উঠেছিল এই অঞ্চলের মানুষ। ১৯৭১ সালের আগে বাঙালির জীবনে এমন মুহূর্ত আর কখনো আসেনি, যখন পুরো জাতি অভিন্ন লক্ষ্যে এতটা দৃঢ়ভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে চূড়ান্ত বিজয়ের প্রধান লক্ষ্যই ছিল সমগ্র জাতির ইস্পাতকঠিন ঐক্য। সেই ঐক্যশক্তিই একাত্তরের রক্তস্নাত অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে বর্তমান সময়েও চলমান। সংগত কারণেই একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়ে বাংলাদেশের অগ্রগতিতে মুক্তিযুদ্ধের অবদানকে নতুন করে মূল্যায়ন করা জরুরি হয়ে পড়েছে। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের কালো অধ্যায় সদ্যস্বাধীন দেশের বাস্তবতায় ছিল ভয়ংকর ও অনাকাঙ্ক্ষিত। এ সময় থেকে বাংলাদেশ ভূখণ্ডের নবতর অভিযাত্রা ব্যাহত হয়। জাতির পিতার নেতৃত্বে যুগান্তকারী সব পরিবর্তন-সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হওয়ার পরও আবার রুদ্ধ হয়ে যায়। মুক্তিযুদ্ধের মুক্ত চেতনা, গণতন্ত্র ও শিল্পবিপ্লবের অবাধ বিকাশ প্রলম্বিত হয়।

বিজয়ের ৫৩তম বর্ষে এসে প্রাপ্তি ও প্রত্যাশার বিশ্লেষণ হচ্ছে, গবেষণা হচ্ছে। একথা সত্য যে, আমাদের মুক্তিযুদ্ধের প্রাথমিক লক্ষ্য অর্জিত হয়েছে। অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে আমাদের অনেক অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। দারিদ্র্য কমেছে উল্লেখযোগ্য মাত্রায়; কমেছে শিশুমৃত্যু, মাতৃমৃত্যুর হার। বেড়েছে গড় আয়ু, উন্নতি হয়েছে পুষ্টি পরিস্থিতির ও স্বাস্থ্যব্যবস্থার, বিস্তার ঘটেছে শিক্ষার। যোগাযোগ খাতে কল্পনাতীত সাফল্য অর্জিত হয়েছে। স্বাধীনতাকে ঘিরে যে স্বপ্ন আমরা দেখেছি, তা অনেকটাই বাস্তবায়ন করেছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা। তাঁর নিরলস পরিশ্রম ও দক্ষ নেতৃত্বে বাংলাদেশ আজ বিশ্বদরবারে একটি উন্নত দেশ হিসাবে আত্মপ্রকাশ করতে যাচ্ছে। শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে একটি উন্নত দেশ, স্মার্ট সোসাইটি, আধুনিক উৎপাদনব্যবস্থা, নতুন অর্থনীতি–সব মিলিয়ে একটি অসাম্প্রদায়িক ও জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গঠনই এবারের বিজয় দিবসে সবার প্রত্যাশা।

গত ৭ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আবারও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছে। টানা চতুর্থবার সরকার গঠনের মাধ্যমে নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করল দলটি। একইভাবে টানা চতুর্থ এবং পঞ্চমবার প্রধানমন্ত্রী হলেন শেখ হাসিনা। স্মার্ট বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার নিয়ে ইতোমধ্যে ৩৭ সদস্যের নতুন মন্ত্রিসভাও গঠিত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীসহ মন্ত্রিসভার সব সদস্যকে অভিনন্দন এবং সরকারের সফলতা কামনা করছি।

বরাবরের মতো নিরীক্ষা একটু ভিন্ন আঙ্গিকে বিজয় দিবস বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করছে। এবারও সাংবাদিকতা ও গবেষণার বিষয়টি মাথায় রেখে স্বনামধন্য লেখক, কলামিস্ট ও সাংবাদিকের লেখায় সমৃদ্ধ হয়েছে সংখ্যাটি। এই সংখ্যায় রয়েছে একাত্তরের গেরিলা যোদ্ধা নাট্যজন নাসির উদ্দিন ইউসুফ বাচ্চুর দীর্ঘ সাক্ষাৎকার, যেখানে উঠে এসেছে একাত্তরে রণাঙ্গনে তাঁর নানা স্মৃতি। সবমিলিয়ে সংখ্যাটি পাঠক, সাংবাদিক ও গবেষকদের নিকট সমাদৃত হবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

সম্পাদক
জাফর ওয়াজেদ

সহযোগী সম্পাদক
আবুল কালাম মোহাম্মদ শামসুদ্দিন

সহকারী সম্পাদক
দুলাল কৃষ্ণ আচার্য

সহ-সম্পাদক
আকিল উজ জামান খান

শিল্প নির্দেশনা
সোহেল আশরাফ খান

প্রকাশনা কর্মকর্তা
সরদার মো. রেজাউল করিম

প্রতিবেদক
নুরুন্নাহার নুরু

সংশোধক
রিয়াজ মো. মনজুরুল হক খান
মো. লুৎফর রহমান

কম্পিউটার বিন্যাস
শাহ্ মুহাম্মদ গোলাম রহমান

প্রকাশকাল: ফেব্রুয়ারি ২০২৪

মূল্য: ৫০ টাকা

ISBN: 978-984-35-4812-2

সূচিপত্র

গণমাধ্যমে বিজয়ের সংবাদ ৩
মোস্তফা হোসেইন

বাঙালির মহান বিজয়ের মাস ডিসেম্বর ৬
হারুন হাবীব

বড়ো বড়ো প্রকল্প আমাদের দেশের চিত্রই বদলে দিচ্ছে ৯
ড. আরএম দেবনাথ

সে বড়ো কঠিন সময় ১১
জাহীদ রেজা নূর

যে বাংলাদেশ চেয়েছিলাম, সেই বাংলাদেশ এখনো হয়নি পারিনি সেভাবে গড়ে তুলতে –নাসির উদ্দিন ইউসুফ বাচ্চু ১৫
বনশ্রী ডলি

কলঙ্কিত ৩ নভেম্বর ও অভিশপ্ত রাজনীতি ২৯
আলী হাবিব

বিজয়ীদের মুখেই শুনেছি বাংলাদেশের বিজয়গাথা ৩১
জুলফিকার আলি মাণিক

৩৪ মুক্তিযুদ্ধে যশোর রোড
সাজেদ রহমান

৩৭ বঙ্গবন্ধু এবং একাত্তরে বাঙালির সাহসের বিজয়
সালাম জুবায়ের

৪১ স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সংবাদপত্র দৈনিক আজাদী
রাশেদ রউফ

৪৪ চেতনার দিনে বারবার ফিরে যেতে ইচ্ছা করে
রাজন ভট্টাচার্য

৪৬ সংবাদপত্রের পাতায় প্রথম বিজয়োৎসব
শাহেলা আক্তার

৪৯ বাঙালির মুক্তিযুদ্ধে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট
জাফর ওয়াজেদ

৫৩ গণমাধ্যম সংবাদ

৬১ পিআইবি সংবাদ

ই-মেইল : pibnirikkha@gmail.com ■ ওয়েবসাইট : www.pib.gov.bd

পিআইবি'র সকল প্রকাশনা পেতে: প্রকাশনা কর্মকর্তা পিআইবি, বাতিঘর ঢাকা ও চট্টগ্রাম
অনলাইনে: www.rokomari.com; মোবাইল: ০১৯১৩০২৪১৫১

মূল্য ৫০ টাকা

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত এবং তিথি প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং, ২৮/সি-১, টয়েনবি সার্কুলার রোড
মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০ থেকে মুদ্রিত
ফোন : ৯৩৩৩৪০৩, ৯৩৩০০৮১-৮৪, ফ্যাক্স : ৮৮০-০২-৮৩১৭৪৫৮
ই-মেইল : pibnirikkha@gmail.com • ওয়েবসাইট : www.pib.gov.bd

গণমাধ্যমে বিজয়ের সংবাদ

■ মোস্তফা হোসেইন

দীর্ঘ ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের সংবাদ প্রকাশ হতো অত্যন্ত প্রতিকূল অবস্থায় হাতে গোনা কয়েকটি পত্রিকায়। তাও সেগুলো ছাপা প্রকাশনা ছিল বাংলাদেশের বাইরে। সামান্য কিছু পত্রিকা মুক্তিযোদ্ধাদের হাত দিয়ে কিংবা আওয়ামী লীগের কর্মী-সমর্থকদের মাধ্যমে দেশের ভেতরে ঢুকত। যে কারণে মুক্তিযুদ্ধের সংবাদ জানার জন্য মানুষকে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র, আকাশবাণী কিংবা বিবিসি রেডিয়োর ওপর নির্ভর করতে হতো।

নভেম্বর থেকে যখন একের পর এক এলাকা শত্রুমুক্ত হতে থাকল, ওই মুহূর্তে মুক্ত এলাকা থেকে পত্রিকা প্রকাশের তাগিদ বেড়ে যায়। বাস্তবতা হচ্ছে–ঢাকা থেকে প্রকাশিত পত্রিকাগুলো ছিল সামরিক বাহিনীর হাতে বন্দি। সামরিক বাহিনীর নির্দেশনা এবং অনেকটা তাদের তত্ত্বাবধানে পত্রিকাগুলো প্রকাশ হতো। সেখানেও পত্রিকাগুলো শব্দের মারপ্যাঁচে যুদ্ধের সংবাদ এমনভাবে প্রকাশ করত, যা ছিল দেখার মতো। অথচ আকারে-ইঙ্গিতে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে সংবাদ প্রকাশ করা ছিল অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। কারণ, প্রতিটি সংবাদই পাকিস্তান সেনাবাহিনীর নজরে আনতে হতো। কিন্তু পাকিস্তানিদের পক্ষের সংবাদগুলোও কখনো কখনো মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে চলে যেত শব্দ ব্যবহারের কারণে। হয়তো সেগুলো ওইভাবে পাকিস্তানিরা খেয়াল করত না কিংবা বুঝতে পারত না।

ওইসব সংবাদ ভবিষ্যতে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সাক্ষ্য হিসাবে গণ্য হবে, সেটা সংবাদকর্মী কিংবা পাকিস্তানি বাহিনীও ভেবেছে কি না সন্দেহ। যেমন: একটি সংবাদের দিকে দৃষ্টি দেওয়া যায়–

'কুমিল্লা থেকে সংবাদদাতা প্রেরিত খবরে বলা হয়েছে যে, কুমিল্লা সদর (উত্তর) মহকুমার শান্তি কমিটির উদ্যোগে গত ৮ই জুলাই দেবিদ্বার থানার জাফরগঞ্জে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় স্কুলের হেডমাস্টার জনাব শহিদুল্লাহ।

সভায় বক্তৃতা করেন মহকুমা শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান নুরুল ইসলাম খান ও সাবেক এমএনএ জনাব সাজ্জাদুল হক। বক্তাগণ তাদের দীর্ঘ বক্তৃতায় তারা প্রদেশে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে পূর্ণ সহযোগিতাদানের আহ্বান জানান। এছাড়াও দুষ্কৃতকারীদের দমন করে যোগাযোগ ব্যবস্থা রক্ষা করার আবেদন জানিয়েছেন।' (মুক্তিযুদ্ধে সালদানদী মন্দবাগ ও কসবা সাবসেক্টর, মোস্তফা হোসেইন, পৃ. ২৮৮)

বিশ্বব্যাপী যুদ্ধকালের সংবাদগুলো নিজ পক্ষের বিজয় এবং নিজ বাহিনীর বীরত্ব প্রকাশে প্রাধান্য দেওয়া হয়। কিন্তু যুদ্ধকালীন ঢাকার পত্রিকাগুলো পাকিস্তানি বাহিনীর প্রতিপক্ষ মুক্তিযুদ্ধের সংবাদগুলো এমনভাবে প্রকাশ করত, যা পরোক্ষভাবে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে চলে যেত। এমন একটি সংবাদ উল্লেখ্য–

'৬৪ জন নিহত

ভারতীয় গোলন্দাজ বাহিনী গতকাল পুনরায় চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, রংপুর এবং যশোরের সীমান্তবর্তী গ্রামসমূহে প্রায় ৩০৯৫ রাউন্ড গোলাবর্ষণ করিলে নারী ও শিশুসহ মোট ৬৪ জন নিহত হয়। তাছাড়া আরও বহুলোক আহত হয়।' (মুক্তিযুদ্ধে সালদানদী মন্দবাগ ও কসবা সাবসেক্টর, মোস্তফা হোসেইন, পৃ. ২৮৬)

উল্লেখ্য, সংবাদে ৬৪ জন মানুষের মৃত্যুর কথা বলা হয়েছে, তা ছিল ভুল। কারণ, ওইসময় সীমান্তবর্তী এলাকাগুলো ছিল জনশূন্য। মোটামুটিভাবে জুলাই-আগস্ট থেকে ওইসব গ্রামের অধিবাসীদের ৯০ ভাগ লোকই দেশত্যাগে বাধ্য হয়। যদি ৬৪ জন মৃত্যুর সংখ্যা ঠিক থাকে, তাহলে সেই মৃতদের মধ্যে নারী শিশু থাকার কথা নয়। মৃতের সংখ্যা ঠিক থাকলে তারা ছিল পাকিস্তানি বাহিনীর সদস্য। ওই সময় মানুষ সংবাদের বিপরীতই বুঝতে পারছিল। কারণ, সবাই জানত সীমান্তবর্তী এলাকার প্রায় সবাই শরণার্থী হয়ে ভারতে আশ্রয় নিয়েছিল।

'রংপুর জেলার একমাত্র...থানাতেই ফিল্ড কামান ও ভারী মর্টারের ১১শত রাউন্ডের বেশী গোলাবর্ষণ করা হয়। উক্ত জেলার বড়খাতা গ্রামে ১১৫ রাউন্ড গুলি করা হয়।

চট্টগ্রামের রামগড়ের পশ্চিমে আমজীঘাট সীমান্ত গ্রামে ভারতীয় মর্টারের ৮০ রাউন্ড গোলাবর্ষণ করা হয়। পশ্চিম সীমান্ত চুট্টিপুর, ভোমরাও ভাটশালাসহ বিভিন্ন সীমান্ত গ্রামে প্রায় ১৬শত রাউন্ড গোলাবর্ষণ করা হয়। অনুরূপভাবে পূর্বসীমান্তে সালদানদী, নয়নপুর ও পরশুরাম এলাকায়ও গোলাবর্ষণ করা হয়।

ঐসব গ্রামের অধিকাংশ বাড়ীই হয় পুরাপুরি ভস্মীভূত হইয়াছে না হয় মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। বহু পরিবার গৃহহারা হইয়া পড়িয়াছে।' (দৈনিক ইত্তেফাক, ২৮ অক্টোবর ১৯৭১)

বহুলপ্রতীক্ষিত বিজয়ের সংবাদ পত্রিকায় প্রকাশের আগেই মুখে মুখে প্রচার হয়ে গেছে সারা দেশে। কিন্তু সত্যতা এবং বিস্তারিত জানার জন্য সবাই তাকিয়ে ছিল পত্রিকার দিকে। আবারও বলা দরকার, ওইসময় রেডিয়ো-টিভি তুলনামূলক কম শক্তিশালী গণমাধ্যম ছিল।

১৬ ডিসেম্বরের ঐতিহাসিক ঘটনাগুলোই ছিল হানাদার পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণ এবং মুক্ত বাংলার পত্রিকাগুলোর প্রধান উপজীব্য। পত্রিকাগুলো তাদের সর্বত চেষ্টা করে ঐতিহাসিক দলিলকে উপস্থাপন করেছে।

১৭ ডিসেম্বর ঢাকা থেকে একাধিক দৈনিক পত্রিকা প্রকাশ হয়। সর্বাধিক জনপ্রিয় পত্রিকা হিসাবে প্রকাশ হয় দৈনিক ইত্তেফাক। তাদের প্রধান শিরোনাম ছিল–'দখলদার পাক-বাহিনীর আত্মসমর্পণ/সোনার বাংলা মুক্ত'। সংবাদের সূচনায় তারা লেখে–'স্টাফ রিপোর্টার: সাবাস মুক্তিযোদ্ধা! বিগত ২৫শে মার্চের বিভীষিকাময় রাত্রির অবসান ঘটিয়াছে। দখলদার পাক-বাহিনী গতকাল (বৃহস্পতিবার) বাংলাদেশ সময় অপরাহ্ন ৫.১ মিনিটের সময় বিনাশর্তে আত্মসমর্পণ করিয়াছে; জন্ম লইয়াছে বিশ্বের কনিষ্ঠতম ও অষ্টম বৃহত্তম স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলা দেশ।' দুই লাইনে ৮ কলামের শিরোনামটি করা হয়েছিল ব্লকে। প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ ও অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামের দুটি আহ্বান ছিল দৃষ্টিনন্দন স্থানে। যেখানে তারা দেশবাসীকে অভিনন্দন জানানোর পাশাপাশি করণীয় বিষয়ে অবহিত করেছেন। পত্রিকার বিশাল অংশজুড়ে ছিল বিজয়ের সংবাদ। পাশাপাশি ছিল শহিদদের তথ্যাবলি এবং শোকের সংবাদও। ছিল বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকারের (মুজিবনগরে প্রতিষ্ঠিত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার) জন্মকথা। বলা বাহুল্য, এ পত্রিকাটি বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে মুখপত্রের ভূমিকা পালন করেছে। কিন্তু পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ২৫ মার্চের রাতের পর পত্রিকা অফিস পুড়িয়ে দেয়। যে কারণে ১৭ এপ্রিল বাংলাদেশ সরকার গঠিত হওয়ার পরও সেই সংবাদটি তারা প্রকাশ করতে পারেনি। মুক্ত বাংলাদেশে সেই শূন্যতা পূরণ করেছে এটা বলা যায়।

স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম সংখ্যার এ পত্রিকাটিতে ভুলবশত তাদের টপ বিজ্ঞাপনে পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তান শব্দ দুটি থেকে যায়। অবশ্য দ্বিতীয় সংখ্যাতেই আর সেটি ছিল না।

স্বাধীনতা-পূর্বকালের অন্যতম একটি পত্রিকা ছিল দৈনিক পাকিস্তান। তারাও ১৭ ডিসেম্বর প্রথম সংখ্যা বের করে। এ পত্রিকার লক্ষণীয় দিক হচ্ছে পত্রিকার নামে। আগে নামের সঙ্গে পাকিস্তান শব্দটি যুক্ত ছিল। হয়তো ব্লক পরিবর্তন করতে পারেনি তারা। যে কারণে দৈনিক পাকিস্তান নামটি রেখেও ক্রস দিয়ে পাকিস্তানকে 'না' বলে দিয়েছিল পত্রিকাটি। পরবর্তীকালে অনেকে মন্তব্য করেছেন, দৈনিক পাকিস্তান ক্রস দেওয়াটা আসলে পাকিস্তানকে ক্রসচিহ্নের মাধ্যমে বাতিল করার উদ্দেশে করা হয়েছে।

ওইদিন পত্রিকাটির ব্যানার লিড ছিল–'জয় বাংলার জয়'। সাবহেড ছিল–'সোনার বাংলা আজ মুক্ত, স্বাধীনঃ জয় সংগ্রামী জনতার জয়'। বলা হয়, মুক্তিযুদ্ধকালে সাপ্তাহিক বাংলাদেশ নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ হতো। যে কারণে দৈনিক পাকিস্তান থেকে দৈনিক বাংলাদেশ নাম হওয়ার পরও ১৮ ডিসেম্বর থেকে এটি দৈনিক বাংলাদেশের পরিবর্তে দৈনিক বাংলা নামে প্রকাশ হতে থাকে।

১৬ ডিসেম্বর চূড়ান্ত বিজয়ের আগেও বাংলাদেশের কোনো কোনো মুক্ত এলাকায় পত্রিকা প্রকাশিত হওয়ার উদাহরণও পাওয়া যায়। এমনই একটি পত্রিকা কুমিল্লা থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক আমোদ। কুমিল্লা অঞ্চল মুক্ত হয় ৮ ডিসেম্বর। সেই সুযোগটি পেয়ে যায় সাপ্তাহিক আমোদ। তারা ১৬ ডিসেম্বরের আগে একটি সংখ্যা 'মুক্তির কথা' প্রকাশ করে।

আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়ার উল্লেখযোগ্য একটি দিক প্রথম পৃষ্ঠাতেই স্থান পেয়েছে। বিশেষ করে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বিরোধিতা করেছে যুক্তরাষ্ট্র। ওই মুহূর্তে শক্তিশালী এ দেশটির প্রতিক্রিয়া সাধারণ মানুষের জানার আগ্রহ ছিল। তখনও দেশটি বাংলাদেশকে স্বীকৃতি না দিলেও বাংলাদেশের জন্মের দিনই তারা ঘোষণা করে বাংলাদেশকে তাদের অর্থনৈতিক সহযোগিতা অব্যাহত রাখার বিষয়ে।

বাংলাদেশের মহান বিজয় দিবসের সংবাদ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ফলাও করে প্রচার হয়। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সমর্থনকারী দেশ যুক্তরাজ্যকে শ্রদ্ধার চোখে দেখত বাংলাদেশের সংগ্রামী জনতা। বিশেষ করে তাদের গণমাধ্যম মুক্তিযুদ্ধের সংবাদগুলো গুরুত্ব সহকারে প্রকাশ করত। বিজয়ের সংবাদও ব্রিটিশ গণমাধ্যমে অত্যন্ত গুরুত্বসহ প্রকাশ

পায়। ১৭ ডিসেম্বর যুক্তরাজ্যের পত্রিকা দ্য টাইমস, পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর আত্মসমর্পণ ও বাংলাদেশের মুক্তিলাভের বিষয়টি উপস্থাপন করে। তারা লিখেছে–

'ঢাকা রেসকোর্স ময়দানে আত্মসমর্পণের দলিল দস্তখতের জন্য একটি টেবিল বসানো হয়েছে। তখন ডিসেম্বরের শীতের পড়ন্ত রোদ। দূর থেকে অবিরাম গুলির আওয়াজ ভেসে আসছে। আর জনতা মুহুর্মুহু চিৎকার করছে।

একটু পরেই গম্ভীর ও কালো মুখে লে. জেনারেল এ এ কে নিয়াজি আত্মসমর্পণের দলিলে দস্তখত করলেন। ভারতীয় সৈন্যরা প্রায় পুরো ময়দানটাই কর্ডন করে বাঙালি জনতাকে অনেক কষ্টে ঠেকিয়ে রেখেছে। জেনারেল নিয়াজিকে যখন ফেরত নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, তখন তার চোখে পানি আর বাঙালি জনতা চারদিক থেকে চিৎকার করছে।'

এ পত্রিকাটিও আমাদের মুক্তিযুদ্ধকালে মুক্তিযুদ্ধের সংবাদ প্রচার করে মুক্তিযুদ্ধের সহায়ক শক্তি হিসাবে কাজ করেছে।

ভারতীয় পত্রিকাগুলো বিজয়ের খবর প্রকাশ করে আন্তরিকভাবে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের জনগণের আবেগ ও সহযোগিতার ক্ষেত্র বিবেচনা করে সেদেশের পত্রিকাগুলোও বিজয়ের সংবাদে গুরুত্ব প্রদান করে। ১৭ ডিসেম্বর কলকাতার দৈনিক যুগান্তরের লিড সংবাদ ছিল 'রাহুমুক্ত বাংলাদেশ'। এ সংবাদে বলা হয়, 'যে-মাটিতে পড়েছে শহীদের পূত শোণিতধারা, সে-মাটি নেবে না পিশাচের দূষিত রক্ত। তবে পাইকারী হারে ছাড়া পাবে না দেশদ্রোহী এবং সমাজদ্রোহী ঘাতকের দল। গণআদালতে তাদের বিচার অবশ্য কাম্য। যারা অপরাধী, তারা পেতে পারে না ক্ষমা–পেতে পারে না নিষ্কৃতি। যে-আগুন জ্বলছে আজ বাংলাদেশের বুকে, তা নিভানোর জন্যই দরকার উপযুক্ত বিচার। নইলে শান্ত হবে না বাঙালীর অশান্ত আত্মা। সত্য এবং ন্যায়ের ভিত্তিতে গড়ে উঠবে না সমাজ।'

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ত্রিপুরা রাজ্যের সাধারণ মানুষ এবং সরকার যে ভূমিকা পালন করেছে, তা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে অবিস্মরণীয় অবদান রেখেছে। শুধু শরণার্থীদের সেবাই নয়, সীমান্ত এলাকায় এ রাজ্যের কিছু গ্রামে পাকিস্তানিদের ছোড়া বোমায় মানুষ হতাহতও হয়েছে। ফলে মুক্তিযুদ্ধের প্রতি তাদের দরদ ছিল, বাংলাদেশের জন্মের সংবাদটি তাদের কাছে অধিক আনন্দেরও ছিল। এরই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে ত্রিপুরার পত্রিকাগুলোয়ও। বিশেষ করে আগরতলা থেকে প্রকাশিত দৈনিক সংবাদের কথা উল্লেখ করতে হয়। পত্রিকাটি ১৭ ডিসেম্বর সংখ্যায় 'রাজধানী আগরতলায় বাঁধ ভাঙ্গা আনন্দের জোয়ার' শিরোনামের সংবাদে বিস্তারিত বলা হয়, '২৬শে মার্চের মধ্যাহ্নে যে রাজধানী আগরতলা প্রবল বিক্ষোভে ফেটে পড়েছিল বাংলাদেশের বুকে জঙ্গী শাহীর উন্মত্ত বর্বরতার প্রতিবাদে, আজ পূর্ণ বিজয়ের আনন্দে সন্ধ্যার রাজধানী প্রাণোচ্ছল। বাংলাদেশ মুক্ত, ঢাকা স্বাধীন স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের মুক্ত রাজধানী–আকাশবাণীর এই ঘোষণাটি শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই শহর আগরতলায় উচ্ছ্বসিত আনন্দের স্রোত বয়ে যায়। আনন্দের প্রাবল্যে জনসাধারণ রাস্তায় বাজি ফাটিয়ে, জয় বাংলা ধ্বনি দিয়ে আকাশ কাঁপিয়ে তোলেন। অনেককেই উচ্ছ্বাসের কান্নায় প্রিয়জনদের মিষ্টি মুখ করিয়ে আলিঙ্গন করতেও দেখা যায়।' দৈনিক সংবাদের এ খবরটিতে ভারতীয় নাগরিকদের অনুভূতির প্রকাশ ঘটেছে।

দ্য নিউইয়র্ক টাইমস, দ্য ম্যানহ্যাটন মারকিউরি, ভিনসেন্স সান-কমার্শিয়ালের পত্রিকাগুলোয় বিজয়ের উল্লাসকে পাশ কাটিয়ে সংবাদ পরিবেশন হয়েছে। আবার তাদের কেউ কেউ বড়ো শিরোনামে মুক্তির কথাও বলেছে। এক্ষেত্রে পাকিস্তানের পত্রিকাগুলোর সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের কিছু পত্রিকার মিল খুঁজে পাওয়া যায়। যেমন পাকিস্তানের ডেইলি ডন ১৭ ডিসেম্বর পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণের সংবাদ সরাসরি প্রকাশ করেনি। লিখেছে–'পরিস্থিতি খুবই জটিল'। এর পরদিন পত্রিকাটি শিরোনাম করেছে, তাদের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা করেছে। অথচ বাস্তবতা হচ্ছে–১৬ ডিসেম্বর তাদের বাহিনী ঢাকায় আত্মসমর্পণ করে যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছে। স্বাধীন বাংলাদেশের আনুষ্ঠানিক বিজয় অর্জন হয়ে গেছে।

মুক্তিযুদ্ধের ৯ মাস যেমন আন্তর্জাতিকভাবে গণমাধ্যমে যুদ্ধের কথা, নৃশংসতার কথা প্রচার হয়েছে, বিজয়ের মাধ্যমে এর সমাপ্তির সংবাদটিও গুরুত্বসহ প্রকাশ হয়েছে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনায় এসব পত্রপত্রিকা তথ্যসম্ভার হিসাবে গণ্য।

লেখক: সিনিয়র সাংবাদিক ও গবেষক

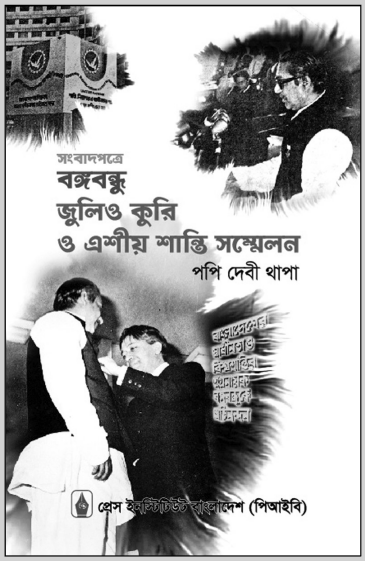

পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ

প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)

৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

প্রবন্ধ

বাঙালির মহান বিজয়ের মাস ডিসেম্বর

■ হারুন হাবীব

একাত্তরের জাতীয় রণাঙ্গনের মানুষ যাঁরা, তাঁরা সবাই স্মৃতিকাতর হই প্রতি ডিসেম্বরে। মনে পড়ে, অক্টোবর-নভেম্বর থেকেই দেশের প্রতিটি অঞ্চলে পাকিস্তানি সেনা ও তাদের এদেশীয় অনুচরদের তাড়া করে একের পর এক গ্রামগঞ্জ ও শহর মুক্ত করতে থাকে মুক্তিবাহিনী। যে হানাদার পাকিস্তানি সেনারা এবং তাদের এদেশীয় দোসর রাজাকার, আলবদর, আলশামস ও 'পিস কমিটি'র সদস্যরা ৯টি মাস সারা দেশে নির্বিচারে হত্যাযজ্ঞ, নারী নির্যাতন ও লুণ্ঠন-রাহাজানি চালিয়েছে, তারা দিশেহারা হয়ে পরাজয়ের দিন গুনতে থাকে।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ গণহত্যা শুরু হলে পাকিস্তানি সেনাদের হত্যাযজ্ঞ ও নিষ্ঠুরতার দাবানল শহর থেকে গ্রামে ছড়িয়ে পড়তে থাকে।

নিরুপায় মানুষ সীমান্ত পেরিয়ে ভারতের মাটিতে আশ্রয় নিতে শুরু করে। গোটা ভারতে ৮০০ শরণার্থীশিবির খোলা হয়। সর্বমোট এক কোটি মানুষ দেশান্তরিত হয়, আশ্রয় নেয় চার ভারতীয় রাজ্যে। এরপর থেকেই পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, আসাম ও মেঘালয়ের মাটি ও মানুষ প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত হয় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে।

পাকিস্তানি গণহত্যার মাত্র দুদিন পর, ২৭ মার্চ শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী লোকসভায় বাংলাদেশ সংক্রান্ত সর্বপ্রথম বিবৃতি দেন। বিবৃতিতে নিরস্ত্র মানুষের ওপর পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর নির্বিচার হামলায় উদ্‌বেগ প্রকাশ করে তিনি বলেন, 'যা ঘটে চলেছে, তা কেবল পূর্ববঙ্গের মাটিতে আন্দোলন দমানো নয়, কার্যত তা নিরস্ত্র মানুষকে ট্যাংক দিয়ে পিষে ফেলার এক নির্মমতা।'

৩১ মার্চ ভারতের লোকসভা ও রাজ্যসভা বাংলাদেশ পরিস্থিতি নিয়ে এক সর্বসম্মত প্রস্তাব পাশ করে পূর্ববঙ্গের মানুষের ওপর পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীর নির্বিচারে অত্যাচারের তীব্র নিন্দা জানানো হয়। সেই প্রস্তাবে সর্বসম্মতভাবে বাংলাদেশের সংগ্রামরত মানুষের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করা হয়।

এরপর শুরু হয় বাঙালির প্রতিরোধযুদ্ধ। ৯ মাস পর আসে আরেক ঐতিহাসিক দিন। সোমবার, ৬ ডিসেম্বর ১৯৭১। দিনটির প্রেক্ষাপট এ রকম: মুক্তিবাহিনীর লাগাতার আক্রমণ নভেম্বরের শুরুতেই হানাদার পাকিস্তানি বাহিনী পর্যুদস্ত হতে থাকে। এর মধ্যে আসে ৩ ডিসেম্বর।

বাংলাদেশ থেকে নজর সরাতে ভারতের পশ্চিম অংশে ব্যাপক হামলা চালায় পাকিস্তান। ফলে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধ ঘোষণা করে ভারত। প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন, 'বাংলাদেশের যুদ্ধ আজ থেকে ভারতেরও যুদ্ধ।' ফলে গড়ে ওঠে দুই দেশের যৌথ সামরিক কমান্ড। মুক্তি ও মিত্রবাহিনী একযোগে পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে আক্রমণ শুরু করে। ঠিক এর দুইদিন পর বাংলাদেশের জন্ম ইতিহাসের বহুল তাৎপর্যময় সিদ্ধান্তটি ঘোষণা করেন সেদিনকার ভারত নেত্রী।

৬ ডিসেম্বর দেশের পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে বিপুল হর্ষধ্বনির মধ্যে ইন্দিরা গান্ধী ঘোষণা করেন, অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে বিচারবিবেচনা করে ভারত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তিনি আরও বলেন, 'আমরা তড়িঘড়ি বা আবেগপ্রবণ হয়ে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিনি। স্বতঃস্ফূর্ত গণবিদ্রোহ এবং গণমানুষের সর্বাত্মক প্রতিরোধ-সংগ্রাম দেখে আমাদের বিলক্ষণ মনে হয়েছে, বাংলাদেশের মানুষকে আর কখনোই নিয়ন্ত্রণে নিতে পারবে না পাকিস্তান। শ্রীমতী গান্ধীর বক্তব্য শেষ হতে না হতেই জনপ্রতিনিধিরা 'জয় বাংলা', 'জয় বাংলাদেশ' বলে হর্ষধ্বনি দিয়ে ওঠেন। সবাই একযোগে নতুন রাষ্ট্রকে অভিনন্দিত করেন।

৬ ডিসেম্বর, একই দিন হিমালয় রাষ্ট্র ভুটান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। তবে ভারতের স্বীকৃতিটির বিষয়টি ছিল সমূহ তাৎপর্যপূর্ণ। যে ভারত এক কোটি শরণার্থীকে আশ্রয় দিয়েছে, যে ভারত মুক্তিবাহিনীকে প্রশিক্ষণ দিয়েছে, অস্ত্র-গোলাবারুদ জুগিয়ে বাঙালির মুক্তিযুদ্ধকে বেগবান করেছে, এমনকি পাকিস্তান, চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের প্রবল প্রতিরোধের মুখেও বাংলাদেশের পাশ থেকে সরে দাঁড়ায়নি, সেই ভারতের স্বীকৃতির ব্যাপারটি ছিল ইতিহাসের বড়ো আশীর্বাদ। এ স্বীকৃতি পাকিস্তানকে এতই ক্ষুব্ধ করে যে দেশটি ভারতের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করে। বলা বাহুল্য, ভারতীয় স্বীকৃতির তিলক আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশ রাষ্ট্রকে অবধারিত ভিত্তির ওপর দাঁড় করায়।

পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে প্রত্যেক সদস্যের করতালির মধ্য দিয়ে ৬ ডিসেম্বর ইন্দিরা গান্ধী ঘোষণা করেন, প্রবল প্রতিকূলতার মধ্যে বাংলাদেশের মানুষের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে এক বীরত্বপূর্ণ নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছে। বাংলাদেশের জনগণের ন্যায়সংগত সংগ্রামে আমাদের সহানুভূতি থাকা উচিত এবং এটিই স্বাভাবিক। কিন্তু স্বীকৃতির ব্যাপারে আমরা মোটেও তড়িঘড়ি করিনি।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী একই দিন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদকে লিখিতভাবে ভারতের স্বীকৃতির বিষয়টি নিশ্চিত করেন। তিনি বলেন, 'বাংলাদেশের স্বীকৃতি একটি মানবিক সত্যের স্বীকৃতি মাত্র। তবে ভারতের পক্ষে এমন সিদ্ধান্ত মোটেও ছোটো বিষয় ছিল না।' তিনি বাংলাদেশ রাষ্ট্রকে অন্তর থেকে শুভেচ্ছা জানান, বাংলাদেশের গণমানুষ ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুকে অভিনন্দিত করেন।

দৃশ্যতই ৬ ডিসেম্বরের পর থেকে যৌথ বাহিনী একের পর এক অঞ্চল দখল করে পাকিস্তানি বাহিনীকে পর্যুদস্ত করতে থাকে। ঢাকায় পরিপূর্ণভাবে অবরুদ্ধ হয় পাকিস্তানি বাহিনী। মিত্রবাহিনীর যুগপৎ আক্রমণে পাকিস্তানের বিমানবাহিনীর প্রতিটি যুদ্ধবিমান বিনষ্ট হয়। আত্মসমর্পণ ছাড়া পাকিস্তানের কাছে আর কোনো পথ খোলা থাকে না। ঠিক এ সময়ে দিল্লির মার্কিন দূতাবাসের মাধ্যমে পাকিস্তানের যুদ্ধবিরতির আর্জি পৌঁছে জেনারেল মানেক শ'র কাছে; কিন্তু ভারত যুদ্ধবিরতি মানতে রাজি হয়নি। বরং সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিয়েছে, যুদ্ধবিরতি নয়, হতে হবে পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণ এবং অবিলম্বে। সে আত্মসমর্পণ হতে হবে প্রকাশ্যে, যাতে সবাই দেখতে পায়।

এ সময় আরও একটি ঘটনা ঘটে। যুক্তরাষ্ট্রের দূতিয়ালিতে জাতিসংঘে অবিলম্বে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়। উদ্দেশ্য একটাই–নিশ্চিত আত্মসমর্পণ থেকে পাকিস্তানকে রক্ষা করা, যুক্তরাষ্ট্রের লজ্জা নিবারণ করা। কিন্তু সেদিনের সোভিয়েত ইউনিয়ন পর পর ভেটো প্রয়োগ করে প্রস্তাবটি অকেজো করে দেয়।

সব চেষ্টা বিফলে গেলে পাকিস্তান উপায়হীন হয়ে পড়ে। এরপর আসে ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১। হানাদার পাকিস্তানি বাহিনী নতজানু হয় সেই রমনার উদ্যানে, যেখানে দাঁড়িয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতিকে সর্বাত্মক যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে ডাক দিয়েছিলেন। ৯৩ হাজার হানাদার পরাজিত সেনা নিয়ে মুক্ত ঢাকায় হাজার হাজার মানুষের আকাশ ফাটানো জয় বাংলা ধ্বনির মধ্যে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ করেন জেনারেল নিয়াজি। হাজারো বাঙালি জে. অরোরা এবং মিত্রবাহিনীর সদস্যদের জড়িয়ে ধরেন। এ আত্মসমর্পণটি ছিল বিশ্বের একমাত্র প্রকাশ্য আত্মসমর্পণ, যা ঠেকাতে গিয়েও ব্যর্থ হয় পাকিস্তান।

২২ ডিসেম্বর ১৯৭১। কলকাতা থেকে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ ও তাঁর মন্ত্রিসভার সদস্যরা স্বদেশে ফেরেন। ঢাকা তখন উল্লাসমুখর নগরী। অপেক্ষমাণ হাজার হাজার মানুষ 'জয় বাংলা', 'জয় বঙ্গবন্ধু' ধ্বনিতে ফেটে পড়ে। দীর্ঘ ৯ মাস পর ঢাকা নগরী এক নির্ভয় প্রাণে উদ্দীপিত হয়ে ওঠে। হাজার হাজার মানুষ মুক্তি ও মিত্রবাহিনীকে বীরোচিত সংবর্ধনা জানায়। সর্বত্র জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু, জয় ইন্দিরা ধ্বনি ওঠে। এপ্রিলের এক রৌদ্রকরোজ্জ্বল দুপুরে মেহেরপুরের আম্রকুঞ্জে স্বাধীনতার যে তামস তপস্যা শুরু হয়েছিল, ডিসেম্বরের সূর্যোকরোজ্জ্বল অপরাহ্নে বুড়িগঙ্গার তীরে সে মুক্তিযজ্ঞের শেষ আহুতি পড়ে। স্থায়ী হয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ। এরপর দ্রুত আসতে থাকে বিশ্বস্বীকৃতি। প্রথমে পূর্ব জার্মানি, এরপর পোল্যান্ড, বুলগেরিয়া, বার্মা, নেপাল, বার্বাডোস, যুগোস্লাভিয়া, সোভিয়েত ইউনিয়ন, চেকোস্লোভাকিয়া, অস্ট্রেলিয়াসহ অনেক দেশ।

কিন্তু বিজয়ের সেই মহা-আনন্দের মধ্যে গভীর বেদনা হয়ে ফিরে আসে ১৬ ডিসেম্বরের আগের কয়েকটি দিনের ঘটনা ও স্মৃতি। পরাজয় নিশ্চিত জেনে পাকিস্তানি সেনানায়কদের সঙ্গে পরামর্শ করে ভয়ংকর এক হত্যাযজ্ঞের নীলনকশা তৈরি করেছিল আলবদর, আলশামস ও রাজাকার বাহিনীর শীর্ষ নেতারা। জাতির মেধা ও মননকে ধ্বংস করার সে নীলনকশার বলি হয়েছিলেন সেদিন আমাদের শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিজীবীরা–দার্শনিক, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, সাংবাদিক, কবি, প্রাবন্ধিক, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ারসহ বুদ্ধিবৃত্তির শীর্ষ বাঙালিরা।

ভয়াবহ এ হত্যাযজ্ঞের হৃদয়বিদারক বর্ণনা জানা যায় কেবল ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণের পর। দুমড়ানো, মোচড়ানো, ক্ষতবিক্ষত শত শত লাশ পাওয়া যায় রায়েরবাজার, শিয়ালবাড়ী, মিরপুরসহ ঢাকার নানা বধ্যভূমিতে। দেশিবিদেশি নানা

অনুসন্ধানে জানা যায়, একমাত্র ঢাকা শহরেই ১৪ ডিসেম্বর প্রায় ২০০ শীর্ষ বুদ্ধিজীবীকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে নির্মম পন্থায় হত্যা করা হয়েছে।

মুক্তিযুদ্ধের ৯ মাসে বাংলাদেশকে পরিণত করা হয়েছিল বিরাট এক বধ্যভূমিতে, যার বিবরণ আছে প্রায় সারা বিশ্বেই। গবেষক রবার্ট পাইন তাঁর 'ম্যাসাকার' গ্রন্থে লিখেছেন, ফেব্রুয়ারির এক সেনাবৈঠকে স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করেন প্রেসিডেন্ট জে. ইয়াহিয়া খান, 'ওদের তিন মিলিয়নকে খতম করে দাও, দেখবে বাদবাকিরা আমাদের হাত থেকেই খাবার নিয়ে বেঁচে থাকার চেষ্টা করবে।'

রবার্ট পাইন লেখেন, 'কিন্তু এটা ছিল কেবলই শুরু। এক সপ্তাহের মধ্যেই ঢাকার অর্ধেক মানুষ শহর ছেড়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয় এবং কেবল ঢাকায়ই কমপক্ষে ৩০ হাজার মানুষকে হত্যা করা হয়। চট্টগ্রামেরও বেশির ভাগ মানুষ পালিয়ে যায়। বলতে গেলে গোটা দেশেই মানুষ পালাতে থাকে প্রাণভয়ে।'

নিরস্ত্র বাঙালি জনগোষ্ঠীর ওপর পাকিস্তানি বাহিনীর নির্দয় আগ্রাসনটি অগ্রসর হয় মূলত লিঙ্গভিত্তিক গণহত্যার রূপ নিয়ে। খ্যাতিমান সাংবাদিক অ্যান্থনি ম্যাসকারেনহাসের ভাষ্যমতে, 'এ গণহত্যার মূল টার্গেট ছিল ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের বাঙালি সেনা, ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস (ইপিআর), পুলিশ, বাঙালি প্যারামিলিটারি আনসার এবং মুজাহিদ, হিন্দু, আওয়ামী লীগের নেতাকর্মী ও সমর্থক, ছাত্র, বিশেষত যারা প্রতিরোধযুদ্ধে অংশ নিতে পারে। এরপর বাঙালি বুদ্ধিজীবী, যেমন: অধ্যাপক, শিক্ষক–তাঁরা।'

গবেষক আর জে রুমেল তাঁর 'ডেথ বাই গভর্নমেন্ট' বইয়ে লেখেন, 'পাকিস্তানি সেনারা বেছে বেছে তরুণদের তুলে নিয়ে যাওয়ার পর তাঁদের আর কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি। এসব ছেলের দেহ কখনো পাওয়া যেত মাঠে, নদীর পানিতে অথবা কোনো আর্মি ক্যাম্পের পাশে।' নাৎসিরা যেভাবে ইহুদি পুরুষদের বর্বরভাবে হত্যা করেছে, সেই রীতির পুনরাবৃত্তির কথা উল্লেখ করেছেন রুমেল।

ঢাকার চারদিক ঘিরে এক ভয়ংকর মৃত্যু উপত্যকা সৃষ্টি করা হয়েছিল। রবার্ট পাইনের ভাষায়, 'শুধু হত্যার পদ্ধতি নয়, মৃত্যুর পর এসব হতভাগ্য মানুষের লাশ গুম করা হতো, ফেলে দেওয়া হতো নদীতে, জলাভূমিতে।' বিদেশি সাংবাদিক ও প্রত্যক্ষদর্শীদের বর্ণনামতে, এসব মানুষের বেশির ভাগকেই একসঙ্গে দড়িতে বেঁধে গুলি করে বা বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে মেরে নদীতে ফেলা হতো। কারণ, এরা বাঙালি, বাংলা ভাষায় কথা বলে। ঠিক একই ধরনের গণহত্যার নারকীয় পদ্ধতি ছিল আর্মেনিয়া এবং ১৯৩৭ সালের নানজিং গণহত্যার বিবরণে।

১৯৭১ সালের নারকীয় ঘটনাবলিতে দেখা যায়, বাঙালি মেয়েদের ধর্ষণ-নির্যাতনের শিকার করা হয়েছে যত্রতত্র। শুধু ধর্ষণ নয়, তাদের বহুসংখ্যককেই হত্যা করা হয়েছে। একাত্তরের নারী নির্যাতনের ওপর বহুলালোচিত গ্রন্থ 'অ্যাগেইনস্ট আওয়ার উইল: মেন-উইমেন অ্যান্ড রেপ' গ্রন্থে আন্তর্জাতিক গবেষক সুজান ব্রাউনমিলার বাঙালি নারী নির্যাতনের সঙ্গে জাপানি সেনাদের দ্বারা নানজিং ও জার্মানদের হাতে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় রাশিয়ায় সংঘটিত ঘটনাবলির তুলনা করেছেন। তাঁর ভাষ্যমতে, চার লাখের মতো নারী পাকিস্তানিদের হাতে ধর্ষণের শিকার হয়েছেন ৯ মাসে। রুয়ান্ডার গণহত্যায় আট লাখ মানুষ মারা গেছে, ইন্দোনেশিয়ায় মারা গেছে প্রায় ১৫ লাখ। কিন্তু বাংলাদেশে এর চেয়ে বেশি।

লেখক: বীর মুক্তিযোদ্ধা, লেখক ও মুক্তিযুদ্ধ গবেষক

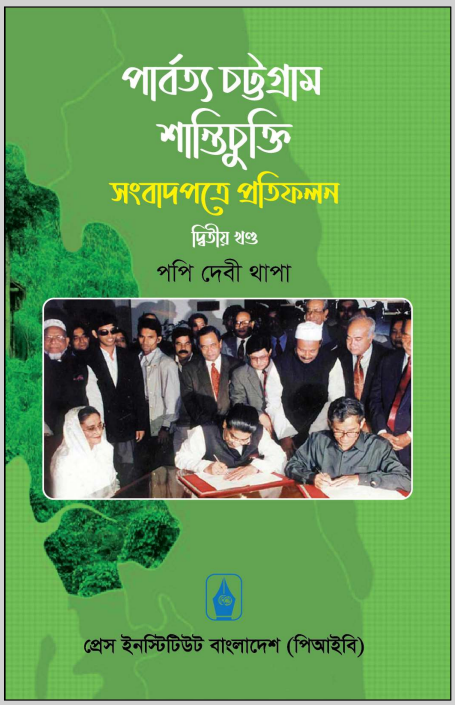

পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

প্রবন্ধ

বড়ো বড়ো প্রকল্প আমাদের দেশের চিত্রই বদলে দিচ্ছে

■ ড. আরএম দেবনাথ

কার্তিক শেষে এখন আমরা অগ্রহায়ণ মাসে; যা এককালে বাংলার প্রথম মাস ছিল। কেউ টের পেয়েছেন কি, একটা বাংলা মাস আমরা পার করে অগ্রহায়ণে এসে নতুন ফসল তুলছি, 'নবান্ন' করছি। না, কেউ টের পাইনি। কার্তিক মাসটি একসময় বাংলার অভিশপ্ত মাস ছিল। এ মাসের নাম ছিল 'মঙ্গার' মাস, অর্থাৎ অভাবের মাস। কীসের অভাব? ভাতের অভাব, ভিক্ষার চালের অভাব। বলা যায়, ভাতের ফেনের অভাবের মাস। সেটা এখন স্মৃতি, ইতিহাসের পাতায়। 'মঙ্গা' বলে কোনো শব্দ এখন আর কেউ জানে না। অথচ প্রাক-স্বাধীনতাকালে আমাদের এই দেশ ছিল একটা 'মঙ্গার' দেশ, যদিও আমরা পরিচিত সুজলা-সুফলা, শস্য-শ্যামলার দেশ বলে। সেই অভিশপ্ত জীবন থেকে আমরা আজ মুক্ত। ভাতের অভাব আজ নেই। চালের দাম স্থিতিশীল। না খেয়ে কেউ এখন মরে না। মানুষের খাওয়ার ব্যবস্থা আছে। পরণে কাপড় আছে, পায়ে জুতা আছে। এই যে পরিবর্তন, বিশাল পরিবর্তন–কতদিনের? না, বেশি দিনের নয়। এটা স্বাধীনতার পরের ঘটনা, বিশেষ করে বিগত ১৫-২০ বছরের ঘটনা। কী করে তা সম্ভব হলো? বর্ধিত উৎপাদন এবং জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ দ্বারা। স্বাধীনতার আগে এ অঞ্চলে এক কোটি টনের মতো খাদ্যশস্য উৎপাদন হতো। এখন এর পরিমাণ চার কোটি টনের মতো। সঙ্গে সঙ্গে কমেছে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার, যা এখন দেড় শতাংশের মতো। ফলে মানুষের খাদ্যাভ্যাসের পরিবর্তন হয়েছে। এটা সম্ভব হয়েছে খাদ্যশস্যের পাশাপাশি শাকসবজি, ফলমূল, দুধ-ডিম, মাছ-মাংসের অভাবনীয় উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে। এসবের অনেকগুলোর উৎপাদনে আমরা বিশ্বে আজ ঈর্ষণীয় স্থানে অবস্থান করছি। এ সংক্রান্ত পরিসংখ্যান দিয়ে আমি পাঠককে ভারাক্রান্ত করতে চাই না। কৃষির এ অভাবনীয় পরিবর্তন, বিবর্তনের পেছনের শক্তি কী? পেছনের শক্তি সরকারি পদক্ষেপ। বর্তমান সরকারের ভরতুকি নীতি এ পরিবর্তনে ভূমিকা রেখেছে। সার, পানি, বীজ, কীটনাশক, কৃষি যন্ত্রপাতি, বিদ্যুৎ–সব ক্ষেত্রে কৃষিতে বর্তমান সরকার

নজিরবিহীনভাবে ভরতুকি এবং কম সুদে ঋণ দিয়ে এক বিপ্লবাত্মক অবস্থার সৃষ্টি করেছে। কৃষির পুনর্জীবনে সহায়তা করেছে প্রবাসীদের বিনিয়োজিত ডলার-টাকা। এটি ঘটিয়েছে অর্থনৈতিক রূপান্তর, বিরাট রূপান্তর। অর্থনৈতিক কাঠামোতে ঘটেছে পরিবর্তন। অভাবনীয় পরিবর্তন, অর্জন, অগ্রগতি সত্ত্বেও কৃষির অবদান ২০ শতাংশের নিচে মোট জাতীয় উৎপাদনে (জিডিপি)। আজকের দিনে অর্থনীত/জিডিপির অর্ধেকের বেশি আসে সেবা খাত (সার্ভিস সেক্টর) থেকে। তারপরই শিল্প খাত–ছোটো, মাঝারি, বড়ো শিল্প খাত। এক পরিসংখ্যানে দেখা যায়, স্বাধীনতার আগে দেশে কারখানার সংখ্যা ছিল মাত্র তিন শতাধিক। ২০১৯ সালে তা উন্নীত হয় প্রায় ৫০ হাজারে। কয়েক লাখ হচ্ছেন এখন ছোটো ছোটো উদ্যোক্তা, কারখানা মালিক, দোকান মালিক। স্বাধীনতার প্রাক্কালে দেশে কোম্পানি, প্রাইভেট কোম্পানি, পার্টনার শিল্পের সংখ্যা ছিল সীমিত। সেখানে বাঙালির মালিকানা ছিল নগণ্য। আর আজ বাঙালির মালিকানায় কয়েক লাখ কোম্পানি, প্রাইভেট কোম্পানি এবং পার্টনারশিপ দেশে কাজ করছে। লাখ লাখ বাঙালি শ্রমিক সেখানে নিয়োজিত। একমাত্র তৈরি পোশাক কারখানাতেই কর্মরত ৪০ লাখ নারী-পুরুষ শ্রমিক।

অর্থনীতি-জিডিপির কাঠামোগত (স্ট্রাকচারাল) পরিবর্তন, কৃষির রূপান্তর, আধুনিকায়ন, যান্ত্রিকীকরণের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তন ঘটেছে জীবনধারণের মানে (স্ট্যান্ডার্ড অব লিভিং)। মানুষের মাথাপিছু আয়ে ঘটেছে এক বিরাট উল্লম্ফন। ১৯৭২-৭৩ সালে আমাদের মাথাপিছু আয় ছিল শত ডলারের নিচে। ২০২০-২১ অর্থবছরেই তা আড়াই হাজার ডলার অতিক্রম করে। আর রাজস্ব বৃদ্ধির কথা বললে তো চমকে উঠতে হয়। পত্রিকান্তরে প্রকাশিত এক পরিসংখ্যানে দেখা যায়, ১৯৭২-৭৩ অর্থবছরে মোট রাজস্বের পরিমাণ ছিল পৌনে দুই শ কোটি টাকার মতো। আর ২০২০-২১ অর্থবছরে এ রাজস্বের পরিমাণ উন্নীত হয়েছে ২ লাখ ৬০ হাজার কোটিতে। রাজস্ব প্রবৃদ্ধি তো আর এমনিতেই হয়নি। এটি সম্ভব হয়েছে 'জিডিপি' প্রবৃদ্ধির হার আশানুরূপ হারে বৃদ্ধির ফলে। ১৯৭২ সালে আমরা শুরু করেছিলাম মাত্র আড়াই শতাংশ প্রবৃদ্ধির হার দিয়ে। তা এখন সাড়ে ছয়-সাত শতাংশ। কী ছিল তখন আমাদের? রপ্তানির পণ্য ছিল মাত্র কয়েকটি–পাট, পাটজাত দ্রব্য, চামড়া, চামড়াজাত দ্রব্য, চা ও হস্তশিল্পজাত দ্রব্য। বছরে ৩০-৩৫ কোটি ডলারও ছিল না আমাদের রপ্তানি আয়। আর আজ এসব পণ্য তো আছেই, এর সঙ্গে যোগ হয়েছে তৈরি পোশাক (গার্মেন্ট পণ্য)। খুবই গুরুত্বপূর্ণ খবর আরেকটি। তখন মানবসম্পদ রপ্তানি বলতে কিছু ছিল না। আজ মানবসম্পদ রপ্তানি হয় বিশ্বের সব দেশে। এখন শুধু পণ্য রপ্তানিই ৫০ বিলিয়ন (এক বিলিয়ন সমান শতকোটি) ডলারের ওপরে। আর মানবসম্পদ রপ্তানি থেকে আয়, যাকে আমরা 'প্রবাসী আয়' বলি (রেমিট্যান্স), তা আসে বছরে ২২-২৪ বিলিয়ন ডলারের মতো। বেসরকারিভাবে আসা ডলারের কোনো হিসাব করা মুশকিল।

বাজেট প্রণয়নের কাজ এখন নিজের হাতে। স্বাধীনতার পরও আমাদেরকে প্রতিবছর বাজেট প্রণয়নের আগে যেতে হতো প্যারিসে। সেখানে সাহায্যদাতাদের মিটিং বসত। সাহায্যনির্ভর বাজেট তৈরি করতে লাগত তাদের সহায়তার আশ্বাস। তারপর বাজেট। বর্তমান সরকারের আমলে এ 'প্র্যাকটিস' সমূলে উৎপাটিত হয়েছে। অর্থনীতির কাঠামোগত শক্তির কারণে এখন আর বাজেটের আগে সাহায্যদাতাদের পেছনে দৌড়াতে হয় না। এখন বাজেট পুরোপুরি সাহায্যনির্ভর নয়। যতটুকু দরকার, ততটুকুই। তবে সেটা সাহায্য নয়, প্রকৃত অর্থে ঋণ। এখন আমরা ঋণ করার এবং তা পরিশোধ করার ক্ষমতা রাখি। ফলে জাতীয় বাজেট, বিশেষ করে উন্নয়ন বাজেটের (বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি-এডিপি) মাত্র ২০-২৫ শতাংশ বিদেশি ঋণনির্ভরশীল। এমনকি অনেক কাজ, বড়ো বড়ো কাজ, প্রকল্প আমরা নিজের টাকায় এখন করছি। যেমন: পদ্মা সেতু। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দৃঢ়সংকল্পে 'পদ্মা সেতুটি' গড়ে উঠেছে আমাদের নিজস্ব অর্থায়নে। সেতুটি চালু হয়েছে। এতে উপকৃত খুলনা, যশোর, বরিশাল অঞ্চলের লোকেরা। জাতীয় উৎপাদনে এক শতাংশ অবদান আসবে এ পদ্মা সেতু থেকে। স্বাধীনতার আগে, এমনকি ২০ বছর আগেও কেউ কি কল্পনা করেছে যে ঢাকা শহরে 'মেট্রোরেল' হবে? কেউ কি ভেবেছে আগের রাতে ট্রেনে রওয়ানা দিয়ে সারা দিন কক্সবাজারে থেকে পরের রাতেই ঢাকায় ফিরতে পারবে? এক্সপ্রেসওয়ে হয়েছে ঢাকায়। চট্টগ্রামে হয়েছে 'বঙ্গবন্ধু টানেল'। বড়ো বড়ো প্রকল্প আমাদের দেশের চিত্রই বদল করে দিচ্ছে। জীবন করে তুলছে স্বাচ্ছন্দ্যময়, গতিময়, স্বল্পব্যয়ী। এসব দূরদর্শী পরিকল্পনার ফল। সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফল।

অভাবনীয় অর্থনৈতিক কাঠামোগত পরিবর্তন, জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার বৃদ্ধি, অবকাঠামোগত উন্নয়ন, প্রবাসী আয়, তৈরি পোশাক কারখানা, বড়ো বড়ো প্রকল্প, বিদ্যুৎ উৎপাদন, কৃষির আধুনিকায়ন, শিল্পের সম্প্রসারণ, আমদানি-রপ্তানি ব্যাবসার অভূতপূর্ব উল্লম্ফন, কর্মের সুযোগ সৃষ্টি প্রভৃতি কারণে দারিদ্র্য হ্রাস পেয়েছে উল্লেখযোগ্য হারে। স্বাধীনতার আগে, এমনকি স্বাধীনতার অনেক পরেও দেশে ৬০-৭০ শতাংশ লোক ছিল দারিদ্র্যসীমার নিচে। দুই বেলা ভাত পেত না তারা। আজ এর ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে। দারিদ্র্যসীমার নিচে হবে মাত্র ২০ শতাংশ লোক। অতিদরিদ্র হবে ১০ শতাংশের নিচে। অথচ ১৯৭৩ সালেও দারিদ্র্যসীমার নিচের লোকের সংখ্যা ৯০ শতাংশ হিসাবে গণনা করা হতো। আগেই উল্লেখ করেছি, ১৯৭২-৭৩ অর্থবছরে আমাদের বাজেটের পরিমাণ ছিল নগণ্য–মাত্র ৭০০-৮০০ কোটি টাকার। এই বাজেট এখন ৬ লাখ কোটি টাকার ওপরে। 'দারিদ্র্য' দূরীকরণে তৈরি করা বাজেটের ফলে দারিদ্র্য হ্রাস পেয়েছে আশানুরূপভাবে; যদিও কোভিড-১৯ এবং রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ আমাদেরকে সাময়িকভাবে একটু অসুবিধায় ফেলেছে।

যে লক্ষ্য দিয়ে শুরু করেছিলাম, তা হচ্ছে কৃষি। কৃষি, প্রবাসী আয়, পোশাকশিল্প আমাদের আয়ের তিনটি স্তম্ভ। এখানে কথা যখন উঠলই, তখন কৃষি ও অন্যান্য সাফল্যের কথা একটু না বললেই নয়। যেমন:

সবজি উৎপাদনে–বিশ্বে তৃতীয়,
পাট উৎপাদনে–বিশ্বে দ্বিতীয়,
পোশাক রপ্তানিতে–বিশ্বে তৃতীয়,
রেমিট্যান্সে–বিশ্বে ৭ম।

ডালজাতীয় শস্যের উৎপাদন ১৯৭১-৭২ সালে ছিল ২ লাখ ৯১ হাজার টন। একটি তথ্যে দেখা যাচ্ছে, ২০১৯-২০ সালে এর পরিমাণ ছিল ৩ লাখ ৪৩ হাজার টন। আলুর উৎপাদন ১৯৭১-৭২ সালে ছিল সাড়ে ৭ লাখ টন। আর এখন ১ কোটি টন। সবজির উৎপাদন প্রায় ৫০ লাখ টন এখন। আম, কাঁঠাল, জাম, মাছ, মুরগি, ডিম ও দুধ উৎপাদনেও আমরা এখন যথেষ্ট অগ্রগামী। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আমরা এখন মাছ রপ্তানি করি। ২০২৩ সালের বিজয় দিবসের এই মুহূর্তে মনে পড়ছে আমাদের বিশাল একটি আর্থিক খাতের কথা। ১৯৭২ সালে মাত্র ছয়টি দেশি বাণিজ্যিক ব্যাংক নিয়ে আমাদের যাত্রা শুরু হয়েছিল। এখন ষাটের অধিক বাণিজ্যিক ব্যাংক, শতাধিক বিমা কোম্পানি, ডজনের ওপরে নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান। স্বাধীনতার আগে আমাদের মোট ব্যাংক আমানত ছিল ৪০০ কোটি টাকার মতো, আর ব্যাংকের শাখা ছিল সহস্রাধিক। এখন মোট ব্যাংক আমানতের পরিমাণ ২৬ লাখ কোটি টাকার ওপরে। শাখা সংখ্যা (উপশাখা বাদে) হবে ১২ হাজারের ওপর। নন-ব্যাংক ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস এখন প্রধান ভূমিকা পালন করছে। পোশাকশিল্পসহ অন্যান্য শিল্প এবং এই বিশাল আর্থিক খাতে এখন কাজ করছে লাখ লাখ নির্বাহী, জুনিয়র নির্বাহী অফিসার। এর মধ্যে ৫-১০ শতাংশ হচ্ছেন নারী। সবাই মিলে গড়ে উঠেছে একটা নতুন মধ্যবিত্ত। এদের গড় আয়ু অর্থাৎ দেশের মানুষের গড় আয়ু এখন ৭৩ বছর, যা স্বাধীনতার আগে ছিল মাত্র ৪৫-৪৬ বছর। এ এক নতুন বাংলাদেশ, আলোকিত বাংলাদেশ। ২০২৩ সালের বিজয় দিবস হচ্ছে আলোকিত বাংলাদেশ। সত্যি তাই। বাংলাদেশের কোথাও আজ আর অন্ধকার নেই। গ্রাম-শহর সর্বত্রই রাতে আলোকময়। কুপি, হারিকেন, হ্যাজাক লাইট, টেবিল ল্যাম্প আজ ইতিহাস। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পাকা বাড়ি, পয়ঃব্যবস্থা, বিশুদ্ধ পানীয় জল–সব মিলে এ এক নতুন বাংলাদেশ, আলোকিত বাংলাদেশ। বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলাদেশ, যার গন্তব্য অনেক দূর।

লেখক: শিক্ষাবিদ ও কলামিস্ট

প্রবন্ধ

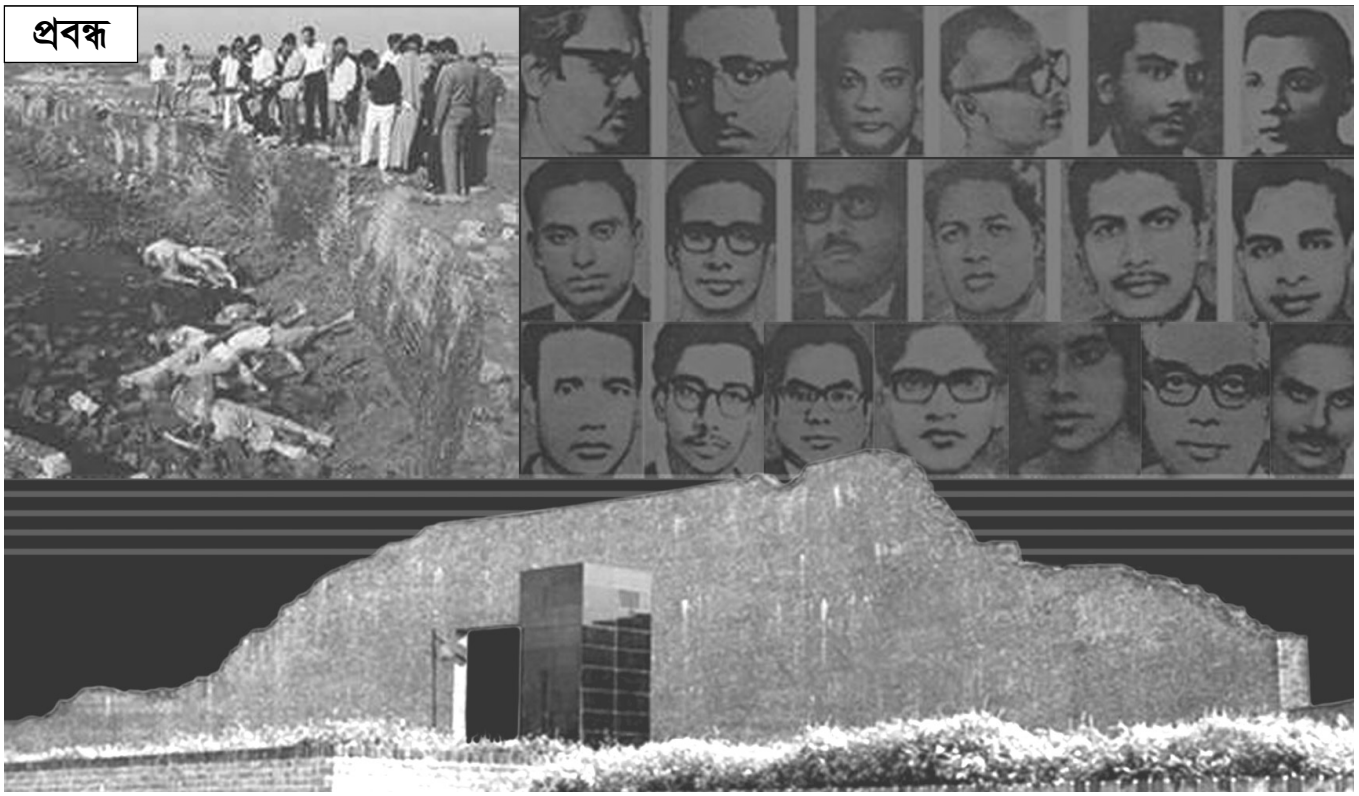

সে বড়ো কঠিন সময়

■ জাহীদ রেজা নূর

১৯৭১ সালের ১০ ডিসেম্বর যখন পিলখানার ভেতরে কাদালেপা মাইক্রোবাসগুলো সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে ছিল, তখন কিন্তু পরিষ্কার হয়ে গেছে–যুদ্ধ এগোচ্ছে পরিণতির দিকে। একদিকে ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়ন জানাচ্ছে বাংলাদেশকে স্বীকার করে নেওয়া ছাড়া বিশ্বের গতি নেই, অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্র আর চীন তখনও পাকিস্তানকে আশ্বাস দিয়ে যাচ্ছে সপ্তম নৌবহর এলো বলে! 'বিচ্ছিন্নতাবাদী' বাংলাদেশকে শায়েস্তা করে আবার পাকিস্তান বানাবে তারা।

কাদালেপা মাইক্রোবাসগুলো কেন এখানে দাঁড়িয়ে আছে–সেটা জানতেন রাও ফরমান আলী। কারা এ মাইক্রোবাসের যাত্রী হবেন, সেটা পাকিস্তানি সেনা অফিসারদের মতো জানত আলবদর বাহিনীর নেতারাও। তাদের হাতে তালিকা ছিল। সেটা তৈরি করেছে রাও ফরমান আলীর সঙ্গে মিলে আলবদরের মাথাগুলো। পাকিস্তানিরা তো সেই মানুষদের চিনবে না, যাঁরা অবরুদ্ধ বাংলায় বসে বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখছেন। তাঁদের ধরিয়ে দিতে হলে আলবদরের সহযোগিতা প্রয়োজন।

পাকিস্তানি জান্তার কেউ কেউ বুঝতে পারছিল, তাদের খেলা শেষ হয়ে আসছে। তাই দিতে হবে মরণকামড়। সেটাই ছিল বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ড ঘটানোর মূল কারণ। এ দেশের সেই মানুষদের হত্যা করতে হবে, যাঁরা তাঁদের বুদ্ধি, মেধা কাজে লাগিয়ে দেশকে সমৃদ্ধ করতে পারতেন।

১০ ডিসেম্বর রাত থেকেই কাদালেপা মাইক্রোবাসগুলো বের হতে থাকে পিলখানা থেকে। তারা ঢাকা শহরে থাকা বুদ্ধিজীবীদের বাড়ি বাড়ি হানা দিতে শুরু করে। সশস্ত্র পাকিস্তানি সেনাদের সঙ্গে থাকে বদরবাহিনীর লোকেরা। এই দালাল বাঙালিরা বুদ্ধিজীবীদের শনাক্ত করে।

পরিবারের সবাইকে আতঙ্কের মধ্যে রেখে তাঁদের ধরে নিয়ে যায়। কখনো কখনো বলে, শুধু জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নিয়ে যাচ্ছি। কখনো বলে, তিনি ভালোই থাকবেন।

কিন্তু ১০ থেকে ১৬ ডিসেম্বর ঢাকা শহরের যেখানেই গেছে এ মাইক্রোবাস, সেখান থেকেই অপহৃত হয়েছেন বুদ্ধিজীবীরা এবং তাঁদের কেউই জীবিত ফিরে আসেননি। কারও লাশ পাওয়া গেছে, কারও লাশ পাওয়া যায়নি। যাঁদের লাশ পাওয়া যায়নি, তাঁদের সন্তানেরা বহুদিন পর্যন্ত ভেবেছে, ফিরে আসবেন তাঁদের প্রিয়জন।

কিন্তু দিনের পর দিন গড়িয়েছে, কেটে গেছে বছরের পর বছর। তাঁরা আর ফিরে আসেননি।

এই অপেক্ষারতদের একজন আমি।

দুই.

দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে ইয়াহিয়া খান ফিরে যাবেন সেনাছাউনিতে–এ কথা অনেকেই বিশ্বাস করেছিলেন। আইয়ুব খানের দশকব্যাপী শাসন-শোষণের শেষপ্রান্তে যে বিশাল গণ-অভ্যুত্থান ঘটে গেল, তাতেই পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল, বাঙালি জাতি একাট্টা হয়েছে শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে। গণ-অভ্যুত্থানই দিল শেখ মুজিবকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধি। এই ভূখণ্ডের মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনের তীব্রতায় বঙ্গবন্ধু আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা থেকে পেলেন নিঃশর্ত মুক্তি।

বলে রাখা ভালো, শুধু বাঙালি জাতিই নয়, বাঙালি ছাড়াও এ দেশে বসবাসকারী বিভিন্ন নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীও তাঁদের নেতা হিসাবে মেনে নিয়েছিল শেখ মুজিবুর রহমানকে। বাঙালি জাতীয়তাবাদী ধারায় সিক্ত হয়ে বাঙালি সংস্কৃতির গভীরতম প্রদেশ পর্যন্ত প্রবেশ করার আবহ তৈরি করে দিয়েছিল ভাষা আন্দোলনের পথ ধরে স্বাধিকার আন্দোলন। ফলে সেসময় পাঞ্জাবি শাসকদের চালানো শোষণ-বঞ্চনার অভিঘাতে বাঙালি মননে ঠাঁই করে নিয়েছিল মুক্তির আকাঙ্ক্ষা। আর এরই পথ ধরে অবধারিতভাবেই ঘটছিল পরবর্তী ঘটনাবলি। যার শেষ প্রান্তে এসে আমরা পাই জাতীয় নির্বাচন। সেই নির্বাচনে বিশাল বড়ো জয় পায় আওয়ামী লীগ। পাকিস্তানের পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী হবেন শেখ মুজিবুর রহমান–এটাই এ নির্বাচনের স্বাভাবিক পরিণতি।

এর পরের দীর্ঘ ইতিহাস বর্ণনা করার প্রয়োজন নেই এ লেখায়। শুধু এ কথা মনে করিয়ে দিতে চাই–ইয়াহিয়া খান আর পাকিস্তান পিপলস পার্টির জুলফিকার আলী ভুট্টোর মাথায় তখন থেকেই ষড়যন্ত্র ঘুরে বেড়াচ্ছিল। বিশেষ করে ১৯৭১ সালের জানুয়ারির শেষের দিকে ভুট্টোর লারকানার বাড়িতে পাখি শিকারের জন্য যখন আতিথ্য গ্রহণ করলেন ইয়াহিয়া, তখন অনেকের মনেই প্রশ্ন জেগেছিল, এই প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াই না কিছুদিন আগে ঢাকায় গিয়েছিলেন? এ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াই না কিছুদিন আগে ঢাকায় শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে কথা বলে এসেছিলেন? তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়াল কী? বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বাড়িতে গিয়ে তো বৈঠক করেননি তিনি। সে বৈঠক হয়েছিল প্রেসিডেন্ট হাউজে। অথচ ইয়াহিয়া খান ভুট্টোর লারকানার জমিদার বাড়িতে চলে গেলেন পাখি শিকারে?

সেখানে পাখি শিকারের বদলে মানুষ শিকার করা নিয়ে কথাবার্তা হয়েছিল কি না, সেটা শুধু অনুমানের ব্যাপার। কিন্তু ওই বছরের ২২ ফেব্রুয়ারি জেনারেলদের সঙ্গে বৈঠকে বাংলায় একটা বড়ো হত্যাযজ্ঞ চালানোর পরিকল্পনা যে করা হয়েছিল, সে কথা আমরা পাকিস্তানি জেনারেলদের বই থেকেই পাই। একটা বড়ো হত্যাযজ্ঞ ঘটিয়ে বাংলাকে হতবাক করে দিতে হবে, কিংকর্তব্যবিমূঢ় করে দিতে হবে, ভয় পাইয়ে দিতে হবে। সেটা যদি করা যায়, তাহলে বছরের পর বছর বাঙালি আর মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না, নিজেদের হিস্যা বুঝে নেওয়ার জন্য আর আন্দোলন করবে না। পাখির মতো শেখানো বুলি আওড়াবে।

হ্যাঁ, ১৯৭১ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি ছিল সেরকম একটি দিন, যে দিনটিতে মূলত 'অপারেশন সার্চলাইট' ঘটানোর পরিকল্পনা হয়েছিল। আর এ শব্দ দুটি জানিয়ে দিয়েছিল–সাধারণ হত্যাযজ্ঞ নয়, বাংলার মাটিতে ঘটানো হবে জেনোসাইড।

তিন.

ডিসেম্বরের বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ডের বিষয়ে আলোচনা করার আগে আরও কয়েকটি বিষয়ে কথা বলে নিলে সময়টি পরিষ্কারভাবে বোঝা যাবে।

বাঙালিদের হাতে ক্ষমতা দেওয়া হবে না–এটিই যখন ছিল পশ্চিম পাকিস্তানি সেনা ও প্রশাসনিক এলিট শ্রেণির সিদ্ধান্ত, তখন তাদের সেই ভাবনাকে লুকিয়ে রাখাটাও ছিল ষড়যন্ত্রের অংশ। ইয়াহিয়াকে বলা হয়েছিল বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে যেতে। আর ভেতরে ভেতরে প্রস্তুতি চলছিল বাঙালি নিধনের। এ বড়ো নৃশংস ভাবনা। একটি জাতিকে প্রচণ্ড ঘৃণা না করলে জেনোসাইডের মতো নিকৃষ্ট ঘটনা ঘটানোর কোনো যুক্তিগ্রাহ্য কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না।

পাকিস্তানি জেনারেল ও রাজনীতিবিদদের একাংশের ভাবনায় বাঙালি মুসলমানরা অভিজাত শ্রেণির ছিল না। এরা নীচু জাতের মুসলমান। এ ভূখণ্ডের মানুষ যেহেতু আশরাফ নয়, তাই তাদের আচরণে, চলনে-বলনে রয়েছে হিন্দুপ্রভাব। সাংস্কৃতিকভাবে এরা হিন্দুয়ানির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। এখানকার শিক্ষকদের বড়ো অংশই হিন্দু, তাই হিন্দু-আবহে ঘেরা রয়েছে বাঙালি মুসলমান।

ফলে বাঙালি মুসলমান ধর্মপরিচয়ে মুসলমান হলেও এদের মস্তিষ্ক হলো হিন্দু-মস্তিষ্ক। তাই এদের নিধন করলে তাতে ইসলামের কোনো ক্ষতি হবে না।

এতটাই সরল ছিল তাদের ভাবনা। ধর্মের নামে ঘৃণা ও বিদ্বেষ ছড়িয়ে পাকিস্তানি বাহিনী একাত্তরজুড়ে যা করেছে, এর তুলনা কেবল ইহুদিদের ওপর নাৎসিদের চালানো বর্বরতার সঙ্গেই তুলনা করা চলে। এত অল্প সময়ে এত ব্যাপক হত্যাযজ্ঞের তুলনা পাওয়া ভার। মুক্তিযুদ্ধের দলিলপত্রের অষ্টম খণ্ড পাঠ করলে সেই নৃশংসতার আংশিক বিবরণ হয়তো পাওয়া যাবে; কিন্তু যে ঘটনাগুলো উঠে আসেনি, সেগুলো কেমন ছিল–সে প্রশ্নও তো মনে আলোড়ন তুলবে! খুবই দুঃখের বিষয়, এখন পর্যন্ত এ ভয়াবহ নৃশংসতা নিয়ে প্রতিনিধিত্বশীল কোনো প্রামাণ্যচিত্র কিংবা ফিচার ফিল্মের দেখা পাইনি আমরা।

যারা অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করতে এসেছিল, তারা ধরেই নিয়েছিল হিন্দু-নিধনে এসেছি এ বাংলায়। যাঁর দিকেই তাকিয়েছে, তাঁকেই মনে করেছে হিন্দু কিংবা হিন্দুদের মদতদাতা। এরা যে মুসলমান, তা নিশ্চিত হওয়ার জন্য লুঙ্গি সরিয়ে দেখেছে মুসলমানি হয়েছে কি না। এ তো গেল পুরুষদের ক্ষেত্রে। আর নারীদের বেলায়? নারীদের ব্যাপারে তাদের ভাবনায় নৃশংসতা আর যৌনতা ছাড়া কিছুই ছিল না। সেসময় ধর্মপরিচয়টিকে আর বড়ো করে দেখা হয়নি।

এই যে কথাগুলো বলা হলো, এর আলোকেই আসলে আমরা জেনোসাইডের বিশাল এক রক্তাক্ত মানচিত্রের মধ্যে বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ড দেখতে পাব।

বলে রাখি, আমরা এ ধ্বংসযজ্ঞকে নিছক গণহত্যা বলে ছেড়ে দিচ্ছি না কেন। গণহত্যা বা ম্যাস কিলিং-এর সঙ্গে জেনোসাইডের মাত্রাগত পার্থক্য রয়েছে। সংক্ষেপে বললে বলতে হয়, হঠাৎ কোনো উন্মাদ কোনো স্কুলে ঢুকে স্টেনগানের গুলিতে ৫০ জন মানুষকে হত্যা করে ফেললে সেটাকে জেনোসাইড বলা হচ্ছে না। যুক্তরাষ্ট্রে এ রকম

> ১০ থেকে ১৬ ডিসেম্বর ঢাকা শহরের যেখানেই গেছে এ মাইক্রোবাস, সেখান থেকেই অপহৃত হয়েছেন বুদ্ধিজীবীরা এবং তাঁদের কেউই জীবিত ফিরে আসেননি। কারও লাশ পাওয়া গেছে, কারও লাশ পাওয়া যায়নি। যাঁদের লাশ পাওয়া যায়নি, তাঁদের সন্তানেরা বহুদিন পর্যন্ত ভেবেছে, ফিরে আসবেন তাঁদের প্রিয়জন

ঘটনা মাঝেমধ্যেই ঘটে। এটাও খুব মর্মান্তিক ঘটনা, কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু জেনোসাইডের ভেতরে থাকে জাতিগতভাবে কাউকে নিধন করার অভিপ্রায়। একটি জাতিকে সমূলে নিকাশ করে দেওয়ার চেষ্টা থাকে তাতে। জাতিগত পরিচয় বদলে ফেলার বর্বরতা থাকে তার মধ্যে।

চার.

জেনোসাইড নিয়ে কয়েকটি কথা বলা দরকার।

একটি জাতি, নৃতাত্ত্বিক, বর্ণগত কিংবা ধর্মীয় গোষ্ঠীকে আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করার উদ্দেশ্য নিয়ে নিম্নবর্ণিত যে কোনো কর্মসাধনকে বোঝাবে:

১. গোষ্ঠীর সদস্যদের হত্যা;
২. গোষ্ঠীর সদস্যদের গুরুতর শারীরিক ও মানসিক ক্ষতিসাধন;
৩. উদ্দেশ্যমূলকভাবে গোষ্ঠীর জীবনযাত্রায় এমন কিছু আরোপ, যা আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে এর কাঠামোগত ধ্বংস বয়ে আনবে;
৪. গোষ্ঠীর মধ্যে জন্মধারা রোধ করার লক্ষ্যে ব্যবস্থা আরোপ;
৫. গোষ্ঠীর শিশুদের বলপূর্বক অন্য গোষ্ঠীতে চালান দেওয়া।

এগুলো রয়েছে জেনোসাইড কনভেনশনের দ্বিতীয় বিধানে।

(মফিদুল হক: জেনোসাইড কনভেনশনের ষাট বছর ও বাংলাদেশ, জেনোসাইড নিছক গণহত্যা নয়, পৃ. ২৫, বিদ্যাপ্রকাশ, ২০০৯)

গ্রিক শব্দ জেনস (গোষ্ঠী বা জাতি অর্থে) ও লাতিন শব্দ সাইড (হত্যা অর্থে) মিলে তৈরি হয়েছে জেনোসাইড শব্দবন্ধ। শব্দটি প্রথম বলেছিলেন পোলিশ আইনবিশারদ রাফায়েল লেমকিন।

আরেকটু পরিষ্কার করি। ১৯৪৮ সালের ৯ ডিসেম্বর জাতিসংঘ জেনোসাইড কনভেনশন গ্রহণ করেছিল। আমরা সেই কনভেনশনের দিকে তাকালে দেখতে পাব, কনভেনশন অনুযায়ী জেনোসাইড একটি সমন্বিত অপরাধ, যা কোনো জাতিকে নিধন করার উদ্দেশ্যে সংঘটিত হয়। জাতিগোষ্ঠী বদলে ফেলার যে কথাটা বলা হচ্ছে, তাতে স্পষ্ট হয়, নির্বিচার ধর্ষণ করার অভিপ্রায়ও ওই জেনোসাইডের আওতায় পড়ে। জেনোসাইডের স্বীকৃতি পেলে ধর্ষণকে আর আলাদাভাবে স্বীকৃতি দেওয়ার প্রয়োজন পড়ে না।

১৯৭১ সালে পাকিস্তানি বর্বর বাহিনী উল্লেখ করা প্রতিটি অপরাধই সংঘটিত করেছে।

পাঁচ.

নির্বিচারে মানুষ হত্যার পাশাপাশি পরিকল্পিতভাবে বুদ্ধিজীবী হত্যার পরিকল্পনাও ছিল পাকিস্তানি সামরিক জান্তার। ২৫ মার্চ কালরাত্রিতেই আমরা দেখতে পাই, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশ কয়েকজন শিক্ষক হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন।

পাকিস্তানি-মনস্তত্ত্ব আরেকটু পরিষ্কার করে নিলে আলোচনার সুবিধা হবে। অপারেশন সার্চলাইটের সময় এবং পরবর্তীকালে কাদের হত্যা করার কথা ভেবেছিল ওরা, সেটা বোঝা দরকার:

ক. আওয়ামী লীগের যে কোনো স্তরের নেতাকর্মী।
খ. হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতিটি মানুষ।
গ. আওয়ামী লীগের প্রতি দুর্বল প্রতিটি মানুষ।

এর মানে কী?

এর অর্থ আর কিছুই নয়–যাকে সামনে পাওয়া যাবে, তাকেই হত্যা করা হবে। সহজ হিসাব। এ সহজ হিসাব ধরেই এগিয়েছে পাকিস্তানি সেনারা। সঙ্গী হিসাবে পেয়েছে এ দেশেরই কিছুসংখ্যক মানুষকে, যারা নিজ জাতির মানুষকেই ঘৃণা করেছে, হত্যা করতে সাহায্য করেছে, নিজ সন্তানের মতো নারীদের তুলে দিয়েছে পাকিস্তানি সেনাদের হাতে।

ছয়.

শুরুতেই বলেছি, পরাজয়ের ঘণ্টা যখন বাজছে, তখন কুটিল কিছু মানুষ বাংলার বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করার পরিকল্পনা করেছিল। রাও ফরমান আলীর ডায়ারিতে, নিয়াজির লেখায় কিংবা হামুদুর রহমানের রিপোর্ট থেকেও জানা যায়, ৯ ও ১০ ডিসেম্বর পিলখানায় ইস্টার্ন কমান্ডের উচ্চপর্যায়ের সভায় বুদ্ধিজীবী হত্যার বিষয়টি আলোচিত হয়েছিল।

মেজর জেনারেল নিয়াজি, মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী, মেজর জেনারেল জামশেদ গোয়েন্দা সংস্থার সরবরাহকৃত নামের তালিকার ব্যক্তিদের সম্পর্কে যথাবিহিত ব্যবস্থা গ্রহণ নিয়ে আলোচনা করেন। তবে আলোচনায় কে কী বলেন, তা নিয়ে তারা প্রত্যেকেই নিজের চামড়া বাঁচানোর মতো বর্ণনা দিয়েছেন। 'আমি নই, অন্য কেউ দায়ী', সেটাই বলার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু অন্যকে দোষারোপ করতে গিয়েও তারা থলের বিড়াল বের করে দিয়েছেন। বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ড যে তাদেরই মস্তিষ্কপ্রসূত ভাবনার প্রতিফলন, সেটা আর ঢাকা থাকেনি।

সে রাতেই যে কাদালেপা মাইক্রোবাসটি বেরিয়ে এসেছিল পিলখানা থেকে, সেটাই ক্রমাগত এগিয়ে যাচ্ছিল ৫ চামেলীবাগের

দিকে। শান্তিনগরের কাছে চামেলীবাগপাড়ায় থাকতেন দৈনিক ইত্তেফাকের নির্বাহী সম্পাদক সিরাজুদ্দীন হোসেন। তাঁর বাড়ির সামনে এসে থেমেছিল তারা। এরপর নেমে এসেছিল। রাত ৩টার দিকে দরজায় কড়া নেড়েছিল। সিরাজুদ্দীন হোসেনের পরিচয় জিজ্ঞাসা করেছিল। স্ত্রী নূরজাহান সিরাজী স্বামীর হাতে তুলে দিতে চেয়েছিলেন তাঁর পাঞ্জাবি, সিগারেটের প্যাকেট। কিন্তু এই পাকিস্তানি সেনা আর আলবদরেরা বলেছিল, 'ওসবের দরকার নেই। যেখানে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, সেখানে সবকিছুই আছে।'

এরপর গামছা চেয়ে নিয়ে সিরাজুদ্দীন হোসেনের চোখ বেঁধে ওঠানো হয়েছিল সেই মাইক্রোবাসে। মাইক্রোবাসের ইঞ্জিন চালু হয়েছিল এবং তা হারিয়ে গিয়েছিল ভোরের কুয়াশায়।

সিরাজুদ্দীন হোসেন ছিলেন আমার বাবা।

সাত.

হ্যাঁ, সিরাজুদ্দীন হোসেন আর ফিরে আসেননি। ফিরে আসেননি আরও অনেক বুদ্ধিজীবী। দেশ স্বাধীন হয়েছে। উল্লাসে ভেসেছে জাতি। আর তার পাশাপাশি বেদনার সন্তান হয়ে স্বজন হারানো মানুষ খুঁজেছে প্রিয়জনের লাশ।

১০ থেকে ১৬ ডিসেম্বর বুদ্ধিজীবীদের অপহরণ করা হয়। ১০ থেকে ১৩ ডিসেম্বর যাঁরা অপহৃত হয়েছেন, তাদের সবাই সাংবাদিক। সৈয়দ নাজমুল হক, আ ন ম গোলাম মোস্তফা, নিজামুদ্দীন আহমদ, সেলিনা পারভীন। ১৪ ডিসেম্বর ধরে নিয়ে যাওয়া হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের। তাঁদের মধ্যে ছিলেন মুনীর চৌধুরী, মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, গিয়াসউদ্দিন আহমদ, ন আ ম ফয়জুল মাহী, রাশেদুল হাসান। এদিন সাংবাদিক ও সাহিত্যিক শহীদুল্লা কায়সারকেও ধরে নিয়ে যায় হত্যাকারীরা। ধরে নিয়ে যায় ডা. মোহাম্মদ মোর্তজাকে। ১৫ ডিসেম্বর অপহৃত হন দুজন স্বনামধন্য চিকিৎসক ফজলে রাব্বি এবং আলীম চৌধুরী। ১৬ ডিসেম্বর অপহৃত হন শিক্ষক আবুল কালাম আজাদ।

তাঁদের কেউ ফিরে আসেননি।

আট.

যে বুদ্ধিজীবীদের কথা বলা হলো, তাঁদের সবার জন্ম ব্রিটিশ আমলে। পাকিস্তান আমলের রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক আন্দোলনগুলোর মধ্য দিয়ে তাঁরা গেছেন। তাঁরা নিজ নিজ পরিমণ্ডলে ছিলেন অভিজ্ঞ। মুক্তির স্বপ্ন দেখেছেন প্রত্যেকে। নানা আন্দোলনের সঙ্গে তাঁদের ছিল সম্পৃক্ততা।

পাকিস্তানিরা তাঁদের চিনতে ভুল করেনি।

মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিল যে স্বপ্ন চোখে নিয়ে, এর সবটা হয়তো বাস্তবে পরিণত হয়নি; কিন্তু বাঙালি প্রথমবারের মতো নিজেদের জন্য একটি জাতিরাষ্ট্রের জন্ম দিয়েছে। এ অর্জন মোটেই ফেলনা নয়। এখন কী করে এই রাষ্ট্রকে একটি সুখী রাষ্ট্রে পরিণত করা সম্ভব, তা নিয়েই চলতে পারে আলোচনা। যে যার অবস্থান থেকে দেশের জন্য কাজ করলে কাঙ্ক্ষিত সাফল্য আসতেও পারে। কিন্তু এ কথাটি খুবই অর্থপূর্ণ যে, জাতির যে মেধাবী সন্তানরা ১৯৭১ সালে হারিয়ে গেলেন, তাঁদের ক্ষমতা ছিল জাতিকে দিকনির্দেশনা দেওয়ার। তাঁরা যদি সেসময় হত্যাযজ্ঞের শিকার না হতেন, তাহলে দীর্ঘ রাজনীতি ও ইতিহাসের পরিক্রমায় হয়তো তাঁরা একটি সুখী-সমৃদ্ধ রাষ্ট্র গড়ার চেষ্টা করতেন। তাতে আমাদের অনেক ব্যর্থতাই দূর হয়ে যেতে পারত। বুদ্ধিজীবী দিবসে তাঁদের স্মরণ করার পাশাপাশি বলা দরকার, তাঁদের স্বপ্নগুলো বাস্তবায়ন করার চেষ্টা থাকতে হবে পরবর্তী প্রজন্মের। আমরা তো জানিই—স্বপ্নেরা মরে না।

লেখক: সিনিয়র সাংবাদিক

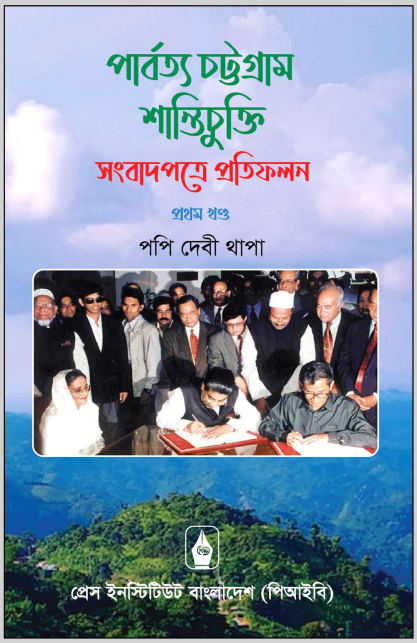

পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

যে বাংলাদেশ চেয়েছিলাম, সেই বাংলাদেশ এখনো হয়নি, পারিনি সেভাবে গড়ে তুলতে

—— নাসির উদ্দিন ইউসুফ বাচ্চু

নাসির উদ্দিন ইউসুফ বাচ্চু; বীর মুক্তিযোদ্ধা, নাট্যনির্দেশক, চলচ্চিত্র নির্মাতা, সমাজ সংস্কারক–নানা অভিধায় অভিষিক্ত তিনি। সেই ছাত্রজীবন থেকেই মনে ধারণ করতেন রাজনৈতিক আন্দোলনেই বাঙালির মুক্তি। বিশ্বাস করতেন–শুধু ভূখণ্ডই নয়, মানুষের মুক্তিই আসল মুক্তি। তাই স্বাধিকার থেকে মুক্তির সংগ্রামে অগ্রভাগে থেকে লড়েছেন প্রাণপণ। মুক্তিযুদ্ধের সময় ছিলেন ক্র্যাক প্লাটুনের গেরিলা। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে বীরদর্পে যুদ্ধ করে স্বাধীন করেছেন দেশ। স্বাধীনের পর দেশের সাংস্কৃতিক মানোন্নয়নে নিজেকে যুক্ত করেন। দীর্ঘদিন সংস্কৃতির মাধ্যমে সমাজ পরিবর্তনের অঙ্গীকারে কাজ করে আসছেন এই বীর মুক্তিযোদ্ধা। সম্প্রতি মুক্তিযুদ্ধ ও প্রাসঙ্গিক বিষয় নিয়ে নিরীক্ষা'র জন্য তাঁর এই দীর্ঘ সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করেন–**বনশ্রী ডলি**

বনশ্রী ডলি: মুক্তিযুদ্ধ বা গেরিলাযুদ্ধে যাওয়ার প্রেক্ষাপট–কবে, কীভাবে গেলেন?

নাসির উদ্দিন ইউসুফ বাচ্চু: মুক্তিযুদ্ধে গেরিলাযুদ্ধ বা প্রতিরোধযুদ্ধ যেটাকে আমরা বলি, ২৫ মার্চ রাত ১১টার পর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ঢাকা শহর আক্রমণ করে। তারা সাধারণ মানুষের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। সন্ধ্যার দিকে আমরা মানে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের কয়েকজন ধানমন্ডির ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধুর বাড়ির সামনে গিয়েছিলাম নির্দেশ নিতে। সেখানে তখন হাজার হাজার মানুষ; কিন্তু কেউ কিছু বলতে পারছিল না। তখন আমরা শেখ কামালের খোঁজ করলাম। শেখ কামাল এসে হ্যান্ড মাইক ব্যবহার করে বলা শুরু করে যে–তোমরা যার যার এলাকায় চলে যাও। বঙ্গবন্ধু

বলেছেন, যার যার এলাকায় গিয়ে পাকিস্তান সেনা আক্রমণ করলে প্রতিরোধ করতে হবে। আর প্রতিরোধ করতে হলে রাস্তাঘাট সব বন্ধ করে দিতে হবে। প্রতিরোধব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। যেভাবেই হোক রাস্তাঘাট বন্ধ করে দিতে হবে।

আমরা সবাই যার যার এলাকায় ফিরে যাই। আমরা তো তখন ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সদস্য। তাদের মধ্যে ঢাকায় যাঁরা স্থায়ী বাসিন্দা, তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয় ও যার যার বাড়ি থেকেই আসা-যাওয়া করেছি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৬৯ সাল থেকেই আমরা আন্দোলন-সংগ্রাম করছি। আমার বাসা ছিল তখন পল্টনে, সেখান থেকেই আমি যেতাম বিশ্ববিদ্যালয়ে। তবে হাজী মুহসীন হলে অ্যাটাচড ছিলাম। আন্দোলন করে এমন অনেকেই হলে থাকত। এর আগে থেকেই দিনের বেলায় মিছিল-মিটিং, দেওয়ালে চিকা মারা–এসব করার পর এলাকায় এসে বিভিন্ন শ্রমিক ভাইদের সঙ্গে কথা বলতাম। আউটার সার্কুলার রোডের কনস্ট্রাকশন বা নির্মাণ শ্রমিক যাঁরা ছিলেন, জোনাকির রাস্তাটা তখন প্রশস্ত করা হচ্ছিল। জোনাকির সামনে বিজয়নগর, ফকিরাপুল, রমনা পার্ক এলাকার রাস্তাটা বড়ো করা হচ্ছিল। এছাড়া চায়ের দোকানের কর্মচারীরা আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন এবং তাঁরা ব্যাপক ভূমিকা পালন করেছেন। এ নিম্নবিত্তের মানুষগুলো, তাঁদের আমরা সংগঠিত করতাম। এটা আমাদের দায়িত্ব ছিল। এসব নির্দেশ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নেতারা আমাদের যা বলতেন বা নির্দেশ দিতেন, তাই পালন করেছি। তাঁদের নিয়ে মিছিল করে পল্টন থেকে নওয়াবপুর সদরঘাট হয়ে ফার্মগেটের দিকে গিয়ে ফিরে আসতাম। কখনো আবার বাংলাদেশ ব্যাংক; আগে পাকিস্তান সেন্ট্রাল ব্যাংকের একটা ইউনিট ছিল এটি, ওইসব জায়গা হয়ে ঘুরে আসতাম পল্টনে, রাতে মশাল মিছিল করতাম।

বনশ্রী ডলি: এই আন্দোলন কবে থেকে শুরু করেন?

নাসির উদ্দিন ইউসুফ বাচ্চু: ১৯৭১ সালের ১ মার্চের আগে থেকেই ঢাকা শহরে এসব কর্মসূচি পালন করছি আমরা। পার্লামেন্ট যখন বন্ধ করে দিল, এর পর থেকে আরও উত্তাল হয়ে উঠে ঢাকা। ১ মার্চ ইয়াহিয়া সংসদ বাতিল ঘোষণা করেছে শুনেছি। তখন স্টেডিয়ামে ছিলাম। সেখান থেকে বের হয়ে গেলাম পূর্বাণী হোটেলের সামনে। ঢাকার পূর্বাণী হোটেলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন। সেখানে পার্লামেন্ট বডির মিটিং চলছিল। হোটেলের সামনে ও আশপাশে সেদিন হাজার হাজার জনতা স্লোগান দিচ্ছে। বঙ্গবন্ধু বেরিয়ে এসে বললেন, আমি পল্টনে যাচ্ছি, তোমরা সেখানে আসো। বঙ্গবন্ধু ৩ মার্চ বললেন, ৭ মার্চ ভাষণ দিবেন রেসকোর্স ময়দানে (সোহরাওয়ার্দী উদ্যান)। এরই মধ্যে ১, ২, ৩ , ৪, ৫ ও ৬ মার্চ, প্রতিদিনই মিছিল ও মিটিং, মশাল মিছিল করেছি। আমাদের অভিজ্ঞতা তো উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান। এভাবে মিছিল মিটিং করে করে আমরা একটা সংগঠিত অবস্থায় এসে গেছি। এদিকে ইয়াহিয়ার সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর আলোচনা ব্যর্থ হতে যাচ্ছে, তা জনগণ বুঝে গিয়েছিল। তবুও রাজনীতির কৌশল আছে, বঙ্গবন্ধু তখন অবিসংবাদিত নেতা। তাঁর প্রতি মানুষের দাবি ছিল আর মানুষের প্রতি ছিল তাঁর অধিকার। সেই জায়গা থেকে তিনি ৭ মার্চে ঐতিহাসিক ভাষণ দেন। এ ভাষণের পরে বাংলাদেশের মানুষ আরও বেশি সংগঠিত হয়। সাধারণ মানুষ আন্দোলনকে বেগবান করে। যার জন্য ২৫ মার্চ পাকিস্তানি বাহিনী যখন আক্রমণ করল, সঙ্গে সঙ্গে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে চেষ্টা করি আমরা। মূলত সেদিন থেকেই যুদ্ধটা শুরু আমাদের, আমার। বড়ো বড়ো গাছ কেটে রাস্তাঘাটে বাধা তৈরি করেছিলাম। ২৫ মার্চ রাতে সেগুলোর আড়ালে থেকে পাকিস্তানি বাহিনীকে আমরা গেরিলা কায়দায় প্রতিরোধ

করার চেষ্টা করেছি। আমরা প্রায় তিন-চার শ লোক। আমাদের হাতে মাত্র ১০-১২টি হাতবোমা। আর তো কোনো অস্ত্র ছিল না তখন। সেগুলোও বেশিদূর পর্যন্ত যাচ্ছে না। পাকিস্তান সেনাবাহিনী ট্যাংক, বিভিন্ন মারণাস্ত্র নিয়ে ঢাকা শহরে আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে। সেদিন আমরা ওদের আক্রমণের মুখে টিকতে পারিনি। তারা আক্রমণ করে কাকরাইল মসজিদের কাছ থেকে। এখন যেখানে প্রধান বিচারপতির বাসভবন। কিছু দূরেই খ্রিষ্টানদের সেন্ট্রাল চার্চ রয়েছে। আমাদের মাথার উপরে আগুনের গোলা ছুটছে, পরে শুনেছি এগুলো কামানের গোলা ছিল, স্টেনগানের গোলা। ২৫ মার্চ থেকে এভাবে আমরা আন্দোলনকে যুদ্ধে রূপান্তরিত করেছি। কিন্তু আমরা ১৫ মিনিটের বেশি স্থায়ী হতে পারিনি ওদের আক্রমণের মুখে।

আমরা অবস্থান ছেড়ে দিতে বাধ্য হই। আমার সঙ্গে থাকা কয়েকজন বন্ধুসহ আমরা সেদিন সেখান থেকে চলে যাই বন্ধু হাসানের বাড়ির ছাদে। ওর বাড়িটি ছিল কাকরাইলের পাশে, হক স্পেস তখন ছিল বাঁশের দোকান। এর পরেই ছিল জোনাকির রাস্তাটা। ওই ছাদ থেকে বড়ো রাস্তায় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর গাড়ি দেখা যাচ্ছে। দেখছি পাকিস্তানি বাহিনীর ট্যাংক, কামানের গাড়ি। এর আড়ালে পদাতিক বাহিনীর গাড়ি কাকরাইলে প্রধান বিচারপতির বাসা এখন, সেই মোড় থেকে আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছে। তারা রাস্তার দুপাশের বাড়িঘর-দোকান সব আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিচ্ছে, গুলি করে উড়িয়ে দিচ্ছিল। অনেকে চিৎকার করছে, আছে। তা দিয়েই যতটুকু পেরেছে লড়াই করেছে। ঘণ্টা দুই বা তিনেক পরে দেখি রাজারবাগের দিকে আগুন জ্বলছে। কিছুক্ষণ পরে মনে হলো পুরান ঢাকার দিকে আগুন জ্বলছে। এরপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, নিউমার্কেটের দিকে আগুন, ফার্মগেটের দিকে জ্বলছে। মালিবাগ, মগবাজারের দিকে আগুন জ্বলছে। পুরো ঢাকা শহর আগুনে লাল হয়ে উঠেছে ততক্ষণে। আকাশ লাল দেখাচ্ছে।

ভোর হবে, তিনটা কি চারটা। দেখছি কিছু মানুষ মূল রাস্তা থেকে হাসানের বাড়ির গলির দিকে দৌড়ে আসছে। ছাদ থেকে তাড়াতাড়ি নামলাম। নেমে ওদের আটকালাম। জিজ্ঞাসা করি তোমরা কারা, কোথায় যাচ্ছ? ওদের মধ্যে কয়েকজন নগ্ন, অর্ধনগ্ন। কারও হাতে, কারও পায়ে গুলি লেগেছে। একজন আরেকজনকে সাহায্য করে পালানোর চেষ্টা করছিল। বাবা আমরা তো রাজারবাগ থেকে পালিয়ে এসেছি, ওরা তো জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে সব ছারখার করে দিয়েছে, মেরে ফেলছে। আমরা চেষ্টা করেও পেরে উঠিনি। তোমরা আমাদের লুঙ্গি-টুঙ্গি দাও, কাপড় দাও। আমরা তাড়াতাড়ি হাসানের বাড়ি ও বেবীর বাড়ি থেকে কিছু কাপড় এনে দিই তাদের। পানি, মুড়ি আরও কিছু খাবার দিই। আমার আর আসাদের বাড়িটা একটু দূরে। আশপাশের বাঙালি বাড়ির সবাই খাবার ও ওষুধ দিয়ে সহায়তা করেছে।

দেখলাম ওদের হাতে অস্ত্র আছে। তাদের বললাম, এই অস্ত্র নিয়ে কোথাও গেলে আপনারা ধরা পড়ে যাবেন। এগুলো আমাদের কাছে

দেখলাম ওদের হাতে অস্ত্র আছে। তাদের বললাম, এই অস্ত্র নিয়ে কোথাও গেলে আপনারা ধরা পড়ে যাবেন। এগুলো আমাদের কাছে রেখে যান। ফিরে এসে আমাদের কাছ থেকে নিয়ে যাবেন। তখন ওরা আমাদের সাতটা রাইফেল দিল, বেশকিছু গুলিও

পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। এমন 'ইনডিসক্রিমিনেট কিলিং' পরিস্থিতিতে মৃত্যু স্বাভাবিক ঘটনা। ওভাবেই এরা জেনোসাইড চালিয়েছে, যেটাকে তারা বলেছে 'অপারেশন সার্চলাইট'।

বনশ্রী ডলি : তারপর...

নাসির উদ্দিন ইউসুফ বাচ্চু: একটু পরে আমরা নেমে আসি। আমরা তখনও লুকিয়ে লুকিয়ে দেখছি। ৩০ বা ৪০ গজ দূরে হবে, ট্যাংকগুলো সামনে দিয়ে যাচ্ছে। আলো নেই, নিভিয়ে দিয়েছে। একটু একটু আবছা আলোয় দেখা যাচ্ছে। ট্যাংকের গড়গড় শব্দ শুনতে পাচ্ছি। ট্যাংকের চাকার ধাতব যন্ত্রের ওপর আলো-আঁধারির একটু আলো পড়ে চিকচিক করে উঠছে। গুলি ছোড়ার সময় এলএমজির নলের মুখ থেকে আগুনের গোলাটা বেরোচ্ছে দেখতে পাচ্ছি। এগোচ্ছে আর গুলি ছুড়ছে। তখন ভাবছি, এরা কোথায় যাচ্ছে? তাদের উদ্দেশ্য ফকিরাপুলের দিকে ছিল। একটু পরে শুনতে পেলাম রাজারবাগ থেকে গুলির আওয়াজ। আমাদের ওখান থেকে ৫-৭ মিনিটের হাঁটার রাস্তা। মাঝখানে শান্তিনগর পার হয়েই রাজারবাগ। বুঝতে পারি রাজারবাগ পুলিশ ফাঁড়ির পুলিশরা পাকিস্তানি বাহিনীকে রেসিস্ট করার চেষ্টা করছে। পুলিশের কাছে কিছু থ্রি নট থ্রি অস্ত্র রেখে যান। ফিরে এসে আমাদের কাছ থেকে নিয়ে যাবেন। তখন ওরা আমাদের সাতটা রাইফেল দিল, বেশকিছু গুলিও। গুনিনি, ছোটো ছোটো পোঁটলায় বাঁধা ছিল। সেগুলো আমরা রেখে দিলাম। ওরা চলে যায়। সেই অস্ত্র, গুলি হাতে পাওয়ার পর প্রথম যুদ্ধের পরিকল্পনা করি। ২৫ গিয়ে ২৬ মার্চ। ভোরে মসজিদে আজান হলো না, শুনিনি। সাধারণত ভোরে আজান শুনে ঘুম ভাঙে। সেদিন আজান শুনতে পাইনি। ২৬ মার্চ আমরা বসে আছি। শ্রমিক লীগের মান্নান ভাই ও ঢাকা জেলা উত্তরের ছাত্রলীগ সভাপতি ইব্রাহীম দেওয়ান বেবীদের বাসায় ভাড়া থাকতেন। তারা তখনও ব্যাচেলর। তাদের ঘরে অস্ত্র ও গুলি লুকিয়ে রেখে দিলাম। তারপর রাস্তার অবস্থা দেখতে উঁকি দিলাম বাইরের দিকে। দেখি দুই পাকিস্তানি সেনা পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের দিয়ে রাস্তায় পড়ে থাকা মৃতদেহগুলো ট্রাকে উঠাচ্ছে, তুলে নিয়ে চলে যাচ্ছে। হঠাৎ মনে হলো, দুই পাশে সেনাবাহিনীর লোক দেখছি না। দৌড়ে রাস্তা ক্রস করে শান্তিনগর পার হয়ে রাজারবাগের দিকে গেলাম। রাজারবাগের দিকে মুস্তাফা মনোয়ার, কবি গোলাম মোস্তফার বাড়ি। ওদিকটায় একটা শহিদমিনার আছে। আড়াল থেকে দেখছি, ওখানের রাজারবাগের পুলিশ ফাঁড়ির সীমানার ওখানে তারকাঁটার বেড়ার পাশে বড়ো বড়ো ড্রেন ছিল।

ময়লা পানি, এখন ড্রেনগুলো পাকা হয়েছে। ড্রেনের পানিতে কয়েকটা দেহ পড়ে থাকতে দেখলাম। সেগুলো অক্ষত নয়, ছিন্নবিচ্ছিন্ন–কারও হাত নেই, কারও পা নেই, মাথা থ্যাঁতলে গেছে। আমাদের এত খারাপ লাগছিল! ভবেছি, যেভাবেই হোক এর প্রতিশোধ নিতে হবে। ফিরে এসে বাসায় মায়ের সঙ্গে দেখা করলাম। আবার ফিরে গেলাম মান্নান ভাইয়ের ঘরে। আমাদের গলিতে পাকিস্তানি বাহিনী ঢোকেনি। দৌড়ে কোনোরকম রাস্তা পার হয়ে মান্নান ভাইকে গিয়ে বললাম, আমাদের আরও অস্ত্র লাগবে। এ কয়টা দিয়ে তো আর যুদ্ধ করা যাবে না। কোথায় কী হচ্ছে, কিছু তো খবর পাচ্ছি না। আপনার কাছে কি কোনো খবর আছে?

২৬ মার্চ দুপুরের পরে মান্নান ভাই রেডিয়ো শোনার চেষ্টা করছেন। হঠাৎ শুনি চট্টগ্রাম স্টেশন থেকে একজন বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণাটি পাঠ করছেন। পরে শুনেছি উনি আব্দুল হান্নান। তখন তো তিনি নাম বলেননি। একটা প্রবন্ধের মতো, উনি কিছু কথা বললেন, পরে বঙ্গবন্ধুকে কোট-আনকোট করেছেন। এ ঘোষণাটি আমাদের খুব সাহস জোগাল। ২৬ মার্চ দিন, রাত গেল গোলাগুলি, আগুন–এসব চলেছে। গোলাগুলি কিছুটা স্তিমিত হয়ে আসে।

রাতে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয়, ২৭ মার্চ চার ঘণ্টার জন্য কারফিউ শিথিল থাকবে। যদি ভুল না করে থাকি তবে সকাল ৯টা থেকে বেলা ২টা পর্যন্ত কারফিউ শিথিল ছিল। কারফিউ শিথিল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বেবীর গাড়ি নিয়ে আমরা বেরিয়ে পড়ি। প্রথমেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকটায় গিয়ে এখন যেটা শাহবাগ, ওখানে কয়েকটা লাশ বা মৃতদেহ পড়ে আছে, কাঁটাবনের দিকে কয়েকটা মৃতদেহ, নিউমার্কেটের দিকে কয়েকটা দোকান পুড়েছে। ইকবাল হল, এখন যেটা জহুরুল হক হল, দেখি হলটি পুড়িয়ে দিয়েছে। বেশকিছু মরদেহ, উপাচার্যের বাড়ির সামনে কয়েকটি মৃতদেহ। পুলিশ, সাধারণ মানুষ ও ছাত্রদের মৃতদেহ ছিল সেখানে। যখনই জগন্নাথ হলের দিকে যাব, আর যেতে দিচ্ছে না। ওখানে সেনাবাহিনীর গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল, তারা হাত দিয়ে ইশারা করল যেন ওদিকে না যাই। আমরা পল্টনে ফিরে আসি। তাড়াতাড়ি অস্ত্রগুলো প্যাক করে মা-বাবার সঙ্গে দেখা করতে যাই। তাঁরাও বললেন, সবাইকে নিয়ে জিঞ্জিরার দিকে গ্রামের বাড়ি চলে যাবেন। বলেছি, ভাই-বোনদের নিয়ে চলে যাও। জহির উদ্দিন মানিক (শহিদ মানিক, যুদ্ধে শহিদ হয়), হাসান, দোহা, মুক্তার, আমিসহ কজন মিলে একসঙ্গে বুড়িগঙ্গা নদী পার হয়ে জিঞ্জিরা গেলাম। সেখানে আমাদের থাকার ব্যবস্থা হলো একটা স্কুলে। যেখানে হাজার হাজার মানুষ আশ্রয় নিয়েছে। বাড়িগুলোয়ও মানুষ গেছে শহর থেকে। কেউ শুয়ে আছে, বসে আছে। খাওয়া নেই, পানি নেই, ঘুম নেই–উদ্‌ভ্রান্তের মতো। প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছে তখন, কী যে অবস্থা। এর মধ্যে আমরা বেঁচে ছিলাম।

২৭ মার্চ গেলাম আর ২৯ মার্চ আমরা ট্রেনিং শুরু করি। ইপিআর ও পুলিশের সদস্যদের সঙ্গে বসে পরামর্শ করি। ওদের কাছে অস্ত্র ছিল, ওয়্যারলেস ছিল। আমরা তাঁদের বলেছি, আমরা ট্রেনিং নিতে চাই। সেই স্কুলে আরও কয়েকজন ছিল, কয়েকটা বন্দুকও ছিল। সব মিলে ১৫-১৬টা হবে। তখন ওনারা বলেন, ঠিক আছে। সুবেদার মেজর যিনি ছিলেন, তাঁর নেতৃত্বে ট্রেনিং শুরু হলো। ২৮-২৯ মার্চ আলোচনা করেছি। আশপাশের মানুষের কাছ থেকে পরিস্থিতি, কাহিনি শোনা, যে যেখান থেকে পার হয়ে আসছে, সেখানের অবস্থা শুনেছি।

বনশ্রী ডলি: কতজন ট্রেনিং নিয়েছিলেন?

নাসির উদ্দিন ইউসুফ বাচ্চু: স্কুলের দুটি ঘরে আমরা থাকতাম। অনেকে গ্রামের বাড়িগুলোয় আশ্রয় পেল। তখন গ্রামের মানুষ আমাদের অকাতরে খাবার পানি, অন্য সহায়তা করেছে। গ্রামের সাধারণ মানুষকেও ট্রেনিংয়ে যুক্ত করেছি। প্রায় ১২৫ জনের একটা দলকে ট্রেনিং দেওয়া শুরু করেন সুবেদার। নামটা মনে নেই। ভোর থেকে পিটি শুরু করতাম। ৩০, ৩১ মার্চ ও ১ এপ্রিল তিনদিন টানা ট্রেনিং নিই। বেশ খুশি আমরা। আমাদের ট্রেনিং শত শত লোক ভিড় করে দেখে। তারাও জয় বাংলা স্লোগান দেয়।

২ এপ্রিল, ভোরে আজানের পরপর পাকিস্তান বাহিনী জিঞ্জিরায় জেনোসাইড শুরু করে। উপরে হেলিকপ্টার আর নিচে বাণিজ্যিক স্পিডবোটগুলোয় চড়ে আঁটি, ভাউয়াল ও আশপাশের এলাকায় এসে নামে, হেঁটে তারা বিভিন্ন এলাকায় ঢুকে বাড়িঘরে আগুন দেয় আর গুলি করতে থাকে। পুরো জিঞ্জিরাকে ঘিরে ফেলার চেষ্টা করে। শত শত মানুষকে হত্যা করে। আমরা কোনোরকম অস্ত্র নিয়ে সরে যাই। না, লড়াই করতে পারিনি। এত মানুষের পালানো, দৌড়ানো আর এত পাকিস্তানি বাহিনীর আক্রমণের মুখে আমরা সেদিন লড়াই করতে সমর্থ ছিলাম না। সাহস হয়নি তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরার। পিছু হটে চলে যাই অন্য জায়গায়। এটা দীর্ঘ কাহিনি। আমি নিজেও লিখছি। এরপর ঢাকায় এসে লালবাগে অস্ত্রগুলো লুকিয়ে রাখি।

৫ এপ্রিল আমি আমার বড়ো বোনের খোঁজ নিতে রওয়ানা হই চট্টগ্রামে। মায়ের কান্নাকাটি যে বড়ো বোনের কোনো খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। তখন তো কোনো যানবাহন পাইনি। দেশের পরিস্থিতি এমন যে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাওয়া মুশকিল আর বিপজ্জনক। ১০ দিন হেঁটে চট্টগ্রামে গিয়েছি। বেবী আপাকে দেখে ২৫ দিন পরে ফিরে আসি। ফিরতে হয়েছে ইন্ডিয়া হয়ে। ২৭ বা ২৮ এপ্রিল ইন্ডিয়া গিয়েছি। ইন্ডিয়ায় গিয়ে খালেদ মোশাররফের সঙ্গে দেখা করে আলাপ করেছি। তিনি ছিলেন মুক্তিযুদ্ধের সেক্টর টু-এর কমান্ডার। এরপর ক্যাপ্টেন হায়দারের সঙ্গেও কথা হয়েছে। তখনকার বিএসএফ আমাকে সহায়তা করেছে।

ত্রিপুরার কাছে মতিনগর নামে একটা জায়গা আছে। প্রথমে মতিনগর ঘাঁটি ছিল, পরে মূল ঘাঁটি হয় মেলাঘরে। আমি কাঁঠালিয়া দিয়ে ইন্ডিয়ায় ঢুকি। খালেদ মোশাররফ ছিলেন কাঁঠালিয়া বর্ডার থেকে একটু দূরে। সেখানে খালেদ মোশাররফ বললেন, তুমি ঢাকা যাও। তুমি একা এসে কী লাভ? তোমরা আসো ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করছি। ঢাকায় ফিরে আসি। ফেরার পথে কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টের বাইরে একটা ঢাকার বাস পেয়েছি। উঠে বসলাম। ওরা বলছে দাউদকান্দি হয়ে ঢাকায় যাবে। কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টে আসার পর বাস চেক করতে করতে আমার কাছে আসে। আমিসহ আরও তিনজনকে আটকে দিল। অন্যদের জিজ্ঞাসাবাদ করে ছেড়ে দেয়। আমাকে বলল তুমি ইপিআর। হয়তো গায়ের রংটং ও হাইট দেখে মনে করেছে। আমার কনুই, হাঁটু দেখল যে ক্রলিং-এর কোনো দাগ আছে কি না, নেই। এসব ছিল না তো। বাসে ওঠার পর আমার পাশেই বসেছিলেন এক বয়স্ক লোক, পাশে বোরকা পরা তাঁর স্ত্রী। তারাও যাবেন ঢাকা। আমার সঙ্গে অনেক কথাবার্তা হলো। তাদেরও ডেকে নেয়। তাদের ছেড়ে দেয়। আমাকে ছাড়ছে না–এমন সময় সেই বয়স্ক লোক বললেন, ও আমার ভাইয়ের ছেলে, আমাদের সঙ্গেই এসেছিল, আমাদের সঙ্গেই ঢাকা ফিরে যাচ্ছে। ওনার কথা শুনে কী মনে করে আমাকে তখন ছেড়ে দিল। ওই ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার আর জীবনে দেখা হয়নি! আমি অনেকের কাছ থেকে এমন অনেক সাহায্য পেয়েছি। ১৯৭১ সালে সাধারণ মানুষের ভূমিকা ছিল অন্যরকম।

বনশ্রী ডলি: তারপর আবার কবে গেলেন?

নাসির উদ্দিন ইউসুফ বাচ্চু: ২২ মে মানিক, আসাদ, বেবী ও আমি ট্রেনিং নিতে রওয়ানা হই। ঢাকা থেকে নৌকায়, ভ্যানে-রিকশায়, হেঁটে আগরতলা দিয়ে গেলাম হাতিমারা। জায়গাটা মতিনগরে। এরপর মেলাঘরে। ১০ দিন পর রিপোর্ট করার জন্য বলেছে। আগরতলা শহরে যাওয়ার পর আশপাশে পরিচিত খুঁজছি। কাউকে পাই না। আমাদের

ফারুক ভাই বললেন, এখানে কী করছ। কলকাতা চল। আজ আমরা সন্ধ্যায় সেনাবাহিনীর প্লেনে করে কলকাতা যাচ্ছি। ওখানে আসো। বললাম, আচ্ছা। তারপর কলকাতা গেলাম

বাসার উলটোদিকে আওয়ামী লীগের এমপি আশরাফ আলী সাহেব থাকতেন, পুরানা পল্টনে। তিনি সেখানে আছেন কি না, গেলাম; কিন্তু পেলাম না। অ্যাডভোকেট ফকির শাহাবুদ্দিন সাহেব, আওয়ামী লীগের নামকরা নেতা। তাঁরা আগরতলা গেছেন। শুনেছি পরে তাঁরা কলকাতায় চলে গেছেন। হঠাৎ দেখতে পাই স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের ফারুক ভাইকে। এর আগে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠানে ফারুক ভাই ও আবুল কাশেম সন্দ্বীপের গলা শুনেছি। ফারুক ভাইকে আগে থেকে চিনতাম। ফারুক ভাই, আবুল কাশেম সন্দ্বীপ ও বেলাল ভাই–এই তিনজন মিলে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র করেছেন। ফারুক ভাই, আবুল কাশেম সন্দ্বীপ, বেলাল ভাই, হাসান ইমাম ও কামাল লোহানী আগরতলায় ত্রিমোহিনী নামে একটা জায়গায় আছেন। ১৯৭১ সালে আমি পূর্বদেশ পত্রিকায় লেখালেখি করতাম। ফারুক ভাই বললেন, এখানে কী করছ। কলকাতা চল। আজ আমরা সন্ধ্যায় সেনাবাহিনীর প্লেনে করে কলকাতা যাচ্ছি। ওখানে আসো। বললাম, আচ্ছা। তারপর কলকাতা গেলাম। দুদিন থাকলাম; কিন্তু সেখানে ভালো লাগল না। তখন কলকাতায় ছিলেন আওয়ামী লীগ নেতা আব্দুল জলিল। যিনি পরে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক হন। তিনি মানিকের খুব ঘনিষ্ঠজন। তাঁর সঙ্গে দেখা হয়। মানিক পরিচয় করিয়ে দিলেন। আব্দুল জলিল তখন প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছিলেন। জলিল সাহেব জিজ্ঞাসা করেন, তোমরা যুদ্ধে যেতে চাও? বললাম, হ্যাঁ, আমরা যেতে চাই। বললেন, চল আমার সঙ্গে। জুনে তাঁর সঙ্গে প্রথম গেলাম পশ্চিম দিনাজপুর, বালুরঘাট বলে একটা জায়গা আছে। সেখানে ট্রেনিং নিলাম–এক্সপ্লোসিভ, এসএলআর, এলএমজি, থ্রি নট থ্রি রাইফেল চালানো। ইপিআর সদস্য এবং ইন্ডিয়ান আর্মির একটি অংশ আমাদের ট্রেনিং দেয়। জুলাইয়ে একদিন জানাল, তোমাদের এই ফ্রন্টে রাখা যাবে না। তোমরা ঢাকার ছেলে। যেখানকার ছেলে, সেখানেই যুদ্ধ করতে হবে। তাহলে রাস্তাঘাট সব চিনবে, অন্য জায়গায় সে সুবিধা পাবে না। তাই তোমাদের যোগ দিতে হবে সেক্টর টুতে, মানে দুই নম্বর সেক্টরে। তখন আগস্টে সেক্টর টুতে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। আবার ১৩/১৪ শ কিলোমিটার ট্রেনে করে জার্নি। সে এক ভয়াবহ যাত্রা। হাজার হাজার শরণার্থী ট্রেনে যাচ্ছে। আমাদের গোসল, খাওয়া, ঘুম নেই। আগরতলা বিএসএফ ক্যাম্পে আসি। সেখান থেকে মেলাঘর ট্রেনিং ক্যাম্পে। সেখানে আবার একটা ট্রেনিং হলো, সেখান থেকে বাগডোরা ব্রাসাস আপ বলে, ওই ট্রেনিংটা ইন্ডিয়ান আর্মি, পাঞ্জাব শিখ রেজিমেন্টের আন্ডারে করেছি। দিনাজপুরে আমাদের একটা-দুইটা ফ্রন্ট ওয়ারে নিয়ে গিয়েছিল। সেপ্টেম্বরে ঢাকায় আসি। দলপ্রধান মানে কমান্ডার তখন মানিক, আর আমি সেকেন্ড ইন কমান্ড, টুআইসি বলে যাকে। নৌকা করে তিতাস নদী, মেঘনা, ধলেশ্বরী হয়ে বুড়িগঙ্গা দিয়ে সাভারের ধামরাই চলে আসি। মেলাঘর থেকে বলে দিয়েছিল, সেখানে আমাদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়। তখন সার্জন বজলুল করিম যিনি কিছুদিন আগে মারা গেছেন, তিনি আমাদের সব ব্যবস্থা করেন। সেখানে থেকে ঢাকা ও আশপাশে অপারেশন শুরু করি।

বনশ্রী ডলি: আপনি তো ঢাকায় অপারেশন করেছেন বেশি। ঢাকায় সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অপারেশন কোনটি ছিল?

নাসির উদ্দিন ইউসুফ বাচ্চু: ঢাকা শহর এবং ঢাকার বাইরে আমাদের অপারেশন করতে হয়েছে। ঢাকার বাইরে সাভার, ধামরাই, মানিকগঞ্জের একটি অংশে করেছি। আর ঢাকায় বায়তুল মোকাররম, ডিআইটি বিল্ডিং, কাকরাইল পেট্রোল পাম্প অপারেশন।

বনশ্রী ডলি: ঢাকায় অপারেশন করার সবচেয়ে বড়ো চ্যালেঞ্জ কী ছিল?

নাসির উদ্দিন ইউসুফ বাচ্চু: ঢাকায় অপারেশন করার সবচেয়ে বড়ো চ্যালেঞ্জ–একটা জায়গায় লুকিয়ে থাকা কঠিন ছিল সেসময়। সাধারণ মানুষ নিশ্চয়ই আমাদের সাহায্য করেছে; কিন্তু আমরা তো তখন তাদের বিপদে ফেলতে চাই না। যেমন: আমাকে ধরার জন্য তারা অনেক চেষ্টা করেছে। আমার পাঁচ ভাইকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল। ভাগ্য ভালো যে কিছুদিন পর তারা আমার ভাইদের ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছে। নানারকম চাপের কারণে ছেড়ে দেয়। কারণ, আমার বাবা বড়ো চাকরি করতেন। ১৯৫৯ সালে পাকিস্তান সরকারের কর্মকর্তা হিসাবে অবসর নেন। আমার মামা মাহফুজুল হক চৌধুরী যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রী ছিলেন। তারা আর্মির সঙ্গে যোগাযোগ করে চাপ তৈরি করার পর ছেড়ে দেয়। আর্মি তখন তাদের বলেছে, আপনারা এত ভালো মানুষ। কমান্ডার বাচ্চুর মামা আপনি, মন্ত্রী ছিলেন; কমান্ডার বাচ্চুর বাবা একজন সরকারি কর্মকর্তা ছিলেন। আপনাদের ছেলে কী করে ইন্ডিয়ান হয়ে গেল? আপনার পাঁচ ছেলেকে ছেড়ে দেব বাচ্চুকে এনে দেন। তখন বাবা বলেছেন, আমি তো জানি না সে কোথায় আছে। আর্মি বলে, বাচ্চু তো এখানেই আছে, ওই যে ডিআইটি বা টেলিভিশন অপারেশন করেছে। এছাড়া আরও অপারেশনের কথা বলেছে যে আমি করেছি।

বনশ্রী ডলি: ডিআইটি টেলিভিশন সেন্টার অপারেশনের সঙ্গে আপনার নাম জড়িয়ে আছে। সেদিন তো সেখানে পাকিস্তানি আর্মি ছিল, কী করে সফল করলেন? সেদিনের ঘটনা বলবেন?

নাসির উদ্দিন ইউসুফ বাচ্চু: ১৯৭১ সালে যাঁরা বিভিন্ন জায়গায় চাকরি করতেন, তাঁরা বেশির ভাগ বাঙালি ছিলেন। আমাদেরই লোক ছিল বেশির ভাগ, তাঁরা অংশ নিয়েছে। হ্যাঁ, এটা একটা প্লাস পয়েন্ট ছিল। নাহলে তো আমরা বাঁচতামই না ঢাকা শহরে। এ নিয়ে মাও সেতুং-এর একটা কথা আছে, 'গেরিলারা হচ্ছে মাছ আর জনগণ হচ্ছে জল। মাছ জল ছাড়া বাঁচতে পারে না।' আমরাও ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ করেছি, জনগণ ছাড়া লড়াই করতে পারতাম না। বিভিন্ন জায়গায় যাঁরা চাকরি করতেন, আমরা তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ গড়ে তুলি। খুঁজে নিই চাকরিজীবীদের মধ্য থেকে যাঁরা কাজ করতে পারবেন সাহস করে। তাঁদের মধ্যে বেলাল বেগ এখন আছেন নিউইয়র্কে। শফিকুর রহমান, তিনিও আমেরিকার একটি স্টেটে বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি করেন। এ দুজনের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ হয় তখন। তাদের আমরা বলেছি, আমরা টেলিভিশন অপারেশনে যাব। অক্টোবরে অপারেশন করেছি। এর আগে থেকেই আমাদের প্ল্যান ছিল যে এটা আমরা উড়িয়ে দেব।

ডিআইটিতে তখন মাহবুব নামে একজন চাকরি করত। সে নাটক করত। তাকে আমরা চিনতাম। তাকে বললাম, তোমার মাধ্যমে আমরা এক্সপ্লোসিভটা পাঠাব ভেতরে। ভেতরে নিয়ে আমাদের সাহায্য করবে? টেলিভিশন সেন্টারের নিচের বাইরের জায়গাটা আর টাওয়ারের ওপরটা আমরা উড়িয়ে দেব। সাহস ছিল ছেলেটার। বলে, আচ্ছা পারব। আমার সমবয়সি। সে জুতার সুকতলার নিচে এক্সপ্লোসিভের প্যাকেট রেখে আবার সব ঠিকঠাক করে জুতা পরে নেয়। এক্সপ্লোসিভ খুব নরম হয়, আটা বা ময়দার কাইয়ের মতো, রুটি তৈরি করতে যা করা হয়। হলুদ রঙের থাকে, এটাকে পি কে টু বলে। আড়াই আউন্স করে দুটি প্যাকেট চ্যাপটা করে নিয়ে মাহবুব ঢুকে গেল ভেতরে। তাকে চেক করেছে, ধরা পরেনি। পাঁচতলায় গিয়ে জুতা খুলে বের করে রুমে এসে আলমারির ফাইলের মাঝখান রেখে দিয়েছে পি কে। ওই আলমারি অন্যজনের, যা সাধারণত নাড়াচাড়া করা হয় না।

আবার পরের দিন টিফিন ক্যারিয়ার নিয়ে এসেছে–ভাত, তরকারি, সবজির নিচে প্লাস্টিক দিয়ে নিয়ে গেছে। এভাবে কয়েকদিন নিয়ে জমা করেছে। এরই মধ্যে হাসান নেওয়াজ আর জন গিয়ে টাওয়ারের ড্রয়িংটা নিয়ে আসে।

কতটা লাগবে? বেশি না। টাওয়ার উড়িয়ে দিতে এক পাউন্ড লাগবে। তবে আমরা তো টাওয়ার আর নিচে ভিসিআর, স্টুডিয়োর পাশে ট্রান্সমিশনটা উড়িয়ে দেব। আমরা খুব খুশি। তাহলে পারা গেল। পরদিনই যাব, বেলাল বেগের আমাদের নিয়ে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু এরই মধ্যে ওরা কিছু একটা টের পেয়ে যায়। হঠাৎ করে চেক করা শুরু করে।

এর আগের দিন আমি ধামরাই গিয়ে একটা অপারেশন করে চলে আসি রাতে। চেক করতে যাই এই অপারেশনের কী অবস্থা। কবে করতে পারব। আমাদের টার্গেট ছিল ১ নভেম্বর অপারেশন করব। কিন্তু ২২ অক্টোবর আমি ঘুমাচ্ছি গণসংগীত করতেন হায়দার মাহবুবের পল্টনের বাসায়। ডিআইটির মাহবুব এসে বলছে, কমান্ডার আর্মিরা তো ডিআইটিতে ঢুকে গেছে। একতলায় আছে ওরা। উপরতলায় উঠে সব চেক করলে তো ধরা পড়ে যাব। ধরা পড়লে আমাদের সবাইকে মেরে ফেলবে। এখন কী করা যায়? আমি তখন বললাম, তোমার পক্ষে এটা উড়িয়ে দেওয়া সম্ভব? একা পারবে তুমি? সে বলে, আমাকে শিখিয়ে দিলে পারব। বললাম, আমরা যেতে পারব? বলে, না, তোমরা এখন যেতে পারবে না সেখানে। আমাদের প্ল্যান ছিল অন্যরকম–ভেতরে এক্সপ্লোসিভ বসিয়ে উড়িয়ে দেব আর আউটার স্টেডিয়ামের বাইরের দেওয়াল থেকে এনার্গা দিয়ে ডিআইটির বাইরের চত্বরে ট্রান্সমিটারটা উড়িয়ে দেব। এনার্গা কলার থোরের মতো একটা গোলা, যা উড়ে গিয়ে বিল্ডিংয়ের দেওয়াল ও জিনিসপত্র ভেঙে ছিন্নভিন্ন করে দেয়, গাড়িও ভেঙে যাবে।

ভেবেছিলাম এমনটাই করব। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছুই ওয়ার্ক আউট হচ্ছে না। তো মাহবুব বলে আমাকে শিখিয়ে দাও। আমি এক্সপ্লোসিভ, ডেটোনেটর আর ফিউজ বের করে বিছানার ওপর রেখে ম্যাচের কাঠি দিয়ে দেখালাম। এক্সপ্লোসিভ ডেটোনেটরে ঢুকাতে হবে। ডেটোনেটরের এক মাথা বন্ধ, এক মাথা খোলা, সেখানে ফিউজ ঢুকিয়ে নিতে হবে। এটা ব্লাস্ট হতে দেড় ফুটে ৩০ সেকেন্ডের মতো সময় লাগবে। তোমার হিসাব করতে হবে জিনিসটা সেট করে কতটা সময়ে তুমি নিরাপদ জায়গায় আসতে পারবে, তা নির্ভর করছে তোমার ওপর। সেটা মেপে তুমি সেট করবে। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলে, ৩০ সেকেন্ড লাগবে। বললাম, তুমি তো ৩০ সেকেন্ডে বের হতে পারবে না। মাহবুব বলে, না, আমি ভেতরে একটা জায়গা আছে, সেখানে গিয়ে বসে থাকব। যুদ্ধের সময় তো এক আউন্স এক্সপ্লোসিভ, ১০টি গুলি ধরা পড়লে এর চেয়ে বড়ো ক্ষতি আর কিছু হতে পারে না। এমনটাই আমাদের আইডিয়া দেওয়া হয়েছে। ট্রেনিংয়ের সময় বলা হয়েছে, জীবন যাবে; কিন্তু তোমার অস্ত্র সারেন্ডার হবে না। তুমি মরে যাও; কিন্তু পাকিস্তান আর্মি যেন তোমার অস্ত্র ব্যবহার না করতে পারে। তিনবার দেখালাম, পরে মাহবুব নিজেই দুবার করে দেখাল যে সে পারছে। তাকে বললাম তোমাকে দুটি ফিউজ দিচ্ছি, একটা দেড় ফুটের আরেকটা তিন ফুটের। এখন তোমার ওপর নির্ভর করছে; তুমি ফিউজের মাথাটা কেটে ম্যাচের কাঠি দিয়ে কাটারের জায়গাটায় ঘষা দিয়ে আগুনটা জ্বালিয়ে দ্রুত সরে আসবে। সব বুঝে নিয়ে ও চলে গেল। আমরা তো অপেক্ষা করছি। আমার অস্থির লাগছে। ছেলেটার জন্য কিছুটা খারাপও লাগছে। সে ধরা পড়লে বা সরে আসতে না পারলে কী যে হবে। ফিরে আসতে পারবে কি না, কোনো নিশ্চয়তা নেই। আমরা ভাবলাম, হাফ এন আওয়ার লাগবে কাজটা সারতে। তখন বেলা ১২টা-সাড়ে ১২টা। আমি হাঁটতে হাঁটতে বেরিয়ে আউটার স্টেডিয়ামে যাই। তখন সেখানে ইসলামিয়া ও প্রভিন্সিয়াল নামে দুটি রেস্টুরেন্ট ছিল। সেখানে বসে আছি। সেখান থেকে ডিআইটি দেখা যায়। দেখব যে ব্লাস্টটা হয়েছে। কিছু সময় গেছে। মাহবুব সাকসেস হবে, না হয় ধরা পড়বে; কাজটা করতে পারবে, না পারবে না–দুইটার একটা হবে। খারাপও লাগছিল। কিছু সময় গেল। ভাবছি ধরা পড়ে গেল কি না! কিছুক্ষণ পর বিকট শব্দ হলো। আমরা যেটা করতে পারিনি–টাওয়ারের নিচের চারটি পায়ে এক্সপ্লোসিভটা লাগানোর কথা ছিল, তা তো করতে পারিনি আমরা। তখন তো এক্সপ্লোসিভ রুম থেকে বের করে এনে তা লাগানো সম্ভব ছিল না। আর্মি ততক্ষণে তিনতলায় চলে এসেছে। লিফটের পাঁচ মানে ছয়তলা।

মাহবুব যেটা করেছে তা হলো, পাঁচতলায় আলমারির ফাইলের ভেতর রেখেছিল, আমরা বলেছিলাম ওখানেই শেষ করে দিতে, আমরা তো বেলাল ভাইকেও পাঠাতে পারিনি।

চিন্তা করে দেখুন, ৩০ গজের মধ্যে বর্তমান বঙ্গভবন, তৎকালীন গভর্নর হাউজ; যেখানে রাও ফরমান আলীরা বসে মিটিং করে। হয়তো তখনও করছে, আমরা তো জানি না। বিকট শব্দ হওয়ার পর দেখলাম টাওয়ারটা একবার এদিক আবার ওদিক দুলছে। আমরা যেখানে বসে, সেখানেও টেবিল থেকে চায়ের কাপ-প্লেট ছিটকে পড়েছে। তারপর দেখছি জানালার কাচগুলো ভেঙে গেছে। ভেতরের কাগজগুলো আকাশে উড়ছে। এই একটা শট বা ছবি বিবিসি তাদের টেলিভিশনে দুদিন পরে দেখিয়েছে। আর্মিরা তখন কেউ দৌড়ে নিরাপদ জায়গায় গেছে, কেউ শুয়ে পড়েছে। মাহবুবকে বলেছিলাম আমাকে তুমি ইসলামিয়াতে পাবে। ঘণ্টাখানেক পরে মাহবুব এলো। আমরা তখন সেখানেই বসে। ততক্ষণে রাস্তাঘাট খালি হয়ে গেছে। রেস্টুরেন্টে আরও কয়েকজন ওয়েটার আছে। আমার সঙ্গে সেদিন আর কেউ ছিল না। মাহবুব আসা মাত্রই ওকে নিয়ে হাঁটা শুরু করি। যেন কেউ কিছু বুঝতে না পারে। আমরা

গেরিলা পত্রিকা বিদেশি দূতাবাসগুলোয় পাঠাতাম; ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেল, শাহবাগ হোটেল (এখন যেটা পিজি হাসপাতাল)। সেখানে বিদেশিরা থাকত; ভোরবেলায় স্টুয়ার্টদের মাধ্যমে পত্রিকার ভেতরে দিয়ে পাঠাতাম; যেন মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত খবর তারা জানতে পারে

তখনকার দৈনিক পাকিস্তান, পরের দৈনিক বাংলা পত্রিকার সামনে দিয়ে পল্টনে না গিয়ে গেলাম ফকিরাপুল। আমাদের আরেক পরিচিত দিলুর বাসায়। সে আমার সিনিয়র ছিল। ডাকতাম দিলু চাচা। সেখানে রিকশা গ্যারেজ ছিল। আমি রিকশাওয়ালাদের সঙ্গে শুয়ে-বসে থাকতাম। সেখানে গিয়ে জানতে চাইলাম মাহবুব তুমি কী করে করলে! মাহবুব বলেছে, তাকে যে চেক করেছে ও ঢাকাইয়া, উর্দু জানে, সে বলে উপরে চলে গেছে। তিনতলায় আর্মিরা অনেককে লাথি মারছে, থাপ্পড় মারছে, চেক করছে। মাহবুব আলমারিতে ফাইল খোঁজার নাম করে এক্সপ্লোসিভ মিশিয়ে সেট করে। আর অন্যদের বলছে, তোমরা রুমে থেকো না, ফাইল টাইল নিয়ে অন্যখানে যাও। কিছু বললে সোজা জবাব দিবে, ফাইল নিয়ে যাচ্ছ। সবাইকে রুম থেকে এভাবে বের করে দিয়ে সে জ্বালিয়ে দিয়ে তিনতলায় নেমে আসে চেয়ারম্যানের রুমে। চেয়ারম্যানও উর্দু বলতে পারেন। চেয়ারম্যানের পিএসের সঙ্গে মাহবুবের ভালো সম্পর্ক ছিল, তার সঙ্গে এসে বসে আছে। ওদিকে ব্লাস্ট হওয়ার পর যে যার মতো দৌড়ে এদিক-সেদিক গেছে, সবাই ভয় পেয়েছে। মিনিট পাঁচেক পরে আর্মিরা রি-অর্গানাইজড হয়। এবার একে একে সবাইকে চেক করছে আর জিজ্ঞাসাবাদ করছে। মাহবুবের সামনে এসে জানতে চায়, তখন চেয়ারম্যানের পিএস বলে, ও তো এতক্ষণ আমার সঙ্গেই এখানে বসে ছিল। মাহবুবের তাৎক্ষণিক বুদ্ধিটা খুব ভালো ছিল। সব ঘটনা সে অভিনয় করে দেখায় আমাকে। আমাদের মতো সে এত মনে রাখার মতো এক বা দুই মাস ট্রেনিং নেয়নি। মাত্র এক ঘণ্টার ট্রেনিং মনে রেখে, প্রচণ্ড সাহস নিয়ে এ কাজে সাকসেস হয়েছে। এক্সপ্লোসানের পরও তো ধরা পড়তে পারত। অনেককেই তো আর্মিরা ধরে নিয়ে গেছে। এখানে মাহবুব কেন জানি খুব ভাগ্যবান, আমরা সাকসেস।

ততদিনে মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া, গোলাম দস্তগীর, ওদিকে সাদেক হোসেন খোকা তাদের কয়েকটি দল ঢাকায় ঢুকে পড়েছে। অপারেশন করছে এদিক-সেদিক। একদিকে আমরা অপারেশন করছি, অন্যদিকে ধরাও পড়ছে। যেমন: আলতাফ মাহমুদরা ধরা পড়ে যায়। আমরা থেমে থাকিনি। আর্মিদের কাছে আমাদের আটকানোর কোনো উপায় ছিল না। এত সহজ নয় আমাদের এই দেশ এত সহজে দখল করে ফেলবে।

দিলুর ওখানে আমরা এক ঘণ্টা থেকে খেয়ে যে যার মতো চলে যাই। মাহবুবকে বলেছি, কয়েকদিন ছুটি নিয়ে নাও, প্রয়োজনে আর যেন না যায়, সিদ্ধান্ত তার। চুপচাপ সাবধানে থাকতে বলেছি। ও চলে গেল। কারণ, ও যে ফ্লোরে ছিল, সেই ফ্লোরে ব্লাস্ট হয়েছে। হিট করে আর সেখানে থাকা যাবে না, এমনটাই নিয়ম ছিল।

আমি চলে গেলাম জোনাকি সিনেমার পাশের মুসলিম হোটেলে, ছাপড়ার মতো। আমি লুঙ্গি পরে খালি গায়ে স্টুয়ার্ট সেজে ঘোরাঘুরি করতাম। একটা ছাত্রাবাস ছিল সেখানে, মাঝেমধ্যে থাকতাম। সেখানে ২৩, ২৪, ২৫ অক্টোবর গেল, এরই মধ্যে রাইসুল ইসলাম আসাদসহ দুটি মিটিং করলাম, পরবর্তী অপারেশন কী হতে পারে। কিছু এক্সপ্লোসিভ রেখেছি মুক্তিযোদ্ধা ফেরদৌসের বাসায়। তখন আমরা গেরিলা নামে ইংরেজি পত্রিকা বের করতাম মুক্তিযোদ্ধাদের খবরসহ, যুদ্ধের খবর দিয়ে। এটি বের করার ব্যাপারে ফেরদৌসের বাবা সাহায্য করতেন। তখন তিনি ইউএসএইডে চাকরি করেন। তিনি তাঁর অফিস থেকে স্টেনসিল কেটে তা ফেরদৌসের মাধ্যমে আমাদের কাছে পাঠাতেন। পত্রিকাটা সাইক্লোস্টাইল করার জন্য আমরা সেগুনবাগিচা স্কুল থেকে একটা সাইক্লোস্টাইল মেশিন নিয়ে আসি। আমরা ফেরদৌস ও জনের কাছে রেখে কাজ করতাম; ফিরোজ, জলি ওরাও ছিল। গেরিলা পত্রিকা বিদেশি দূতাবাসগুলোয় পাঠাতাম; ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেল, শাহবাগ হোটেল (এখন যেটা পিজি হাসপাতাল)। সেখানে বিদেশিরা থাকত; ভোরবেলায় স্টুয়ার্টদের মাধ্যমে পত্রিকার ভেতরে দিয়ে পাঠাতাম; যেন মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত খবর তারা জানতে পারে। আমার তৈরি ছবিতেও এমন একটা শট আছে। আমার ছবির নামটা দিয়েছি 'গেরিলা'। সাইক্লোস্টাইল মেশিনের একটা শটও আছে গেরিলা ছবিতে।

একটা অপারেশন করব ভেবে ফেরদৌসের বাসায় কিছু এক্সপ্লোসিভ রাখতে গেলাম। ওগুলো আবার আনা হয়েছে আরেক যোদ্ধা শাহারের বাসা থেকে। যে শাহার ১৪ ডিসেম্বর শহিদ হয়। তাদের চার ভাইকে রাজাকাররা একসঙ্গে ধরে নিয়ে মেরে ফেলেছে। চার ভাইয়ের কবর আছে ফার্মগেটে। শাহার, রতন, নেহালসহ পাঁচটি কবর আছে সেখানে। শাহার আমাদের আন্ডারেই যোদ্ধা ছিল।

ফিরে এসে মুসলিম হোটেলে বসে আড্ডা দিয়ে ঘুমিয়েছি। এমন সময় রাইসুল ইসলাম আসাদের ছোটো ভাই মাহমুদ, সে মারা গেছে। মাহমুদ সবজির ব্যাগ নিয়ে দৌড়ে আসে, বলছে, আপনার ভাইদের অ্যারেস্ট করে নিয়ে গেছে। ভীষণ চিন্তিত হলাম। কী করি! কিছুক্ষণের মধ্যেই মাহমুদকে ফলো করে আমার মামাতো ভাই মানিক আসে। কাঁদতে কাঁদতে বলে, কী করলি, তোর জন্য পুরো ফ্যামিলি আজ শেষ। আরও চিন্তিত হলাম। আস্তে করে সবার সামনে দিয়ে বেরিয়ে গেলাম। কারণ, ওরা জেনে গেছে যে আমি এখানে আছি, যদি অন্যদের বলে দেয়। এলাকা ছেড়ে ধানমন্ডিতে মুক্তিযোদ্ধা বন্ধু সোহেলের বাসায় চলে গেলাম। পরদিন পত্রিকায় একটা ছোট্ট বিজ্ঞাপন নজরে আসে 'বাচ্চু কাম ব্যাক, ইয়োর ফ্যামিলি ডায়িং ফর ইউ।' বুঝলাম এ তো মহাবিপদ আমার জন্য,

আর থাকা যাবে না। কারণ, ঢাকা শহর খুব ছোটো, আমাকে তো অনেকেই চেনে। মিছিল করেছি, সমাবেশ করেছি। আমাকে চিনে ফেলবে সহজেই। ঢাকা ছাড়ি মন খারাপ করে।

ধামরাইয়ে গাজীর বাড়িতে চলে গেলাম। সেখানেই থাকছি। এরই মধ্যে তুহিন নামে একজন বন্ধু আসে, খবর পাই যে আমার ভাইদের ছেড়ে দিয়েছে। তাদের ছেড়ে দেওয়ার পেছনে আমার বাবা ও মামার সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অবস্থান, হায়ার স্ট্যাটাস কাজ করেছে। রাও ফরমান আলীর সঙ্গে তাদের আলাপ ছিল। এভাবে একটা নেগোসিয়েশন করে। পাকিস্তান আর্মিরা অনেকবার বলেছে, দুই সন্তানকে নিয়ে যান, বাচ্চুকে এনে দিলে আরও তিনজনকে ছাড়ব। কিন্তু ওদের এত মেরেছিল যে, বড়ো ভাই, যিনি মারা গেছেন, স্বাভাবিক মৃত্য হয়েছে তার, আজীবন ব্যথায় কষ্ট পেয়ে গেছেন তিনি। মার খেয়ে অনেক জায়গা ভেঙে গিয়েছিল তার। এখন আমরা চার ভাই বেঁচে আছি। এক ভাই এখনো অমাবস্যা ও পূর্ণিমাতে হাঁটুসহ অন্য জায়গায় ব্যথায় কষ্ট পান। আমার যুদ্ধটা এমনই ছিল। আমি একা নই, পুরো পরিবার যুদ্ধ করেছি।

বনশ্রী ডলি: এর পরের অপারেশন?

নাসির উদ্দিন ইউসুফ বাচ্চু: এরপর চলে গেলাম সাভার। কয়েকদিন পর বায়তুল মোকাররমে অপারেশন করলাম। সেই অপারেশনে রাইসুল ইসলাম আসাদ, জন, ফিরোজও ছিল। তখন রোজার মাস। আমরা সাইক্লোস্টাইল করে লিফলেট ছড়িয়েছি; সাধারণ মানুষকে জানিয়েছিলাম, আপনারা ঈদের নামাজ পড়েন; কিন্তু ঈদ উদ্‌যাপন করবেন না, উৎসব পালন করবেন না, ঈদ উপলক্ষ্যে কেনাকাটা করবেন না; যুদ্ধ চলছে। কিন্তু মানুষ তারপরও কেনাকাটা বন্ধ করেনি। বায়তুল মোকাররমের পুরো মার্কেটসহ অনেকটা জায়গাজুড়ে পাকিস্তান আর্মি গাড়ি নিয়ে ঘেরাও করে রেখেছে। আমরা সেখানে অপারেশন চালানোর সিদ্ধান্ত নিই। তাতে হয়তো কিছু সাধারণ মানুষও হতাহত হতে পারে, কিন্তু এছাড়া উপায় ছিল না।

আসাদকে বলেছি, তোমার ছেলেদের ডাকো। ওরা রেকি করে, আমিও রেকি করতে যাই। রেকি করতে গিয়ে দেখা হয় শাহাজাহান ভাইয়ের সঙ্গে, তিনি আমাদের পরিচিত। তিনি পাড়ায় এসে গল্প করেন যে, বাচ্চু ইন্ডিয়া থেকে এসে এখানে যুদ্ধ করছে, আমার সঙ্গে পল্টনে দেখা হয়েছে। সে খবর আমার বাসা পর্যন্ত শুনেছে। মাহমুদ এসে ফকিরাপুলে আমাকে একথা জানায়। শাহাজাহান ভাইকে একটা চিঠি লিখে থ্রেট দিই, খবরদার, আমার সঙ্গে দেখা হয়েছে তা কাউকে বলবেন না। পরে তিনি এসে আমার কাছে ক্ষমা চেয়ে কান্নাকাটি করেছেন, বুঝতে পারেননি। আনন্দে বলে দিয়েছেন। মুক্তিযোদ্ধার সঙ্গে পরিচয় আছে, সেটা গর্বের মনে করেছেন। ভয় পেয়েছেন, হয়তো তাকে মেরে ফেলতে পারি। এসব পরিস্থিতিতেও পড়েছি।

বায়তুল মোকাররমে একটা গাড়িতে আমরা এক্সপ্লোসিভ রেখে অপারেশন সাকসেস করেছি। সেবার আসাদের বিশেষ ভূমিকা ছিল। সেই অপারেশনে ১৯ জন পাকিস্তান আর্মি নিহত হয় আর আটজন সাধারণ মানুষ নিহত হয়। এরপর আমি মালিবাগ রেললাইন অপারেশন করেছি।

সেদিন ফেরদৌসের বাসায় গিয়ে এক পাউন্ডের এক্সপ্লোসিভ দিয়ে একটা স্লাব বানিয়ে ফিউজে সেট করি। ফেরদৌসের দুই বোন কুসুম ও আনজু সাহায্য করেছে। রাত হয়েছে তখন, এক্সপ্লোসিভ আর একটা পিস্তল নিয়ে বের হই। হাঁটতে হাঁটতে চলে যাই মালিবাগে, একটা কালভার্ট ছিল, এর ওপর দিয়ে রেললাইন। দেখছি রেললাইন চেক করার রেল ট্রলি যাচ্ছে। ট্রলি চলে যাওয়ার পর আমি কাছ দিয়ে হাঁটছি। কাছাকাছি বস্তিবাসী কয়েকজন, যারা '৬৯/৭০-এর আন্দোলনের সময় আমাদের সঙ্গে মিছিল করেছে, স্লোগান দিয়েছে। আমাকে দেখে বলে, বাবা এত রাতে এখানে আসছেন কেন? রাত তখন সাড়ে ১১টা। বলি একটা কাজ আছে তাই এসেছি। এটা-সেটা আলাপের পর দেখি তাদের দুজন পিছু ছাড়ছে না। কী করি, কিছুটা যাওয়ার পর ওদেরকে পাশেই একটা ঝোপের আড়ালে নিয়ে পিস্তলটা বের করে দেখাই, এটা কী? বলে, পিস্তল। বললাম, আমি মুক্তিযোদ্ধা। আপনারা কি আমার সঙ্গে থাকবেন? বলে, থাকব কিন্তু পরে পাকিস্তান আর্মিরা এসে আমাদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেবে, এর আগেও করেছে। বললাম, আমার এছাড়া উপায় নেই, অপারেশন তো করতেই হবে। তারা বলে আমরা কী করব? আপনারা আমাকে সাহায্য করবেন। আপনারা কেবল রেললাইনের ওপরে দড়িটার পিনটা বেঁধে দিবেন, আমি কালভার্টের ভেতরে রেললাইনের নিচের জায়গাটায় এক্সপ্লোসিভ ফিট করব। আবর্জনা, নোংরায় ভর্তি পানি যাচ্ছে। এত ময়লা পানিতে নামবে? তারা জিজ্ঞেস করছে। বলেছি, আমাকে নামতে হবে। ওদের একজনকে বলেছি, হালকা করে একটু আলো দেখান। ওরা একটা চেরাগ বাতি এনে ধরেছে, আমি পানিতে নেমে চিত হয়ে শুয়ে এক্সপ্লোসিভ বাঁধলাম। ওপরে একজন, আমার সঙ্গে একজন। বেঁধে নিয়ে ওদেরকে বললাম, বাড়ি যেতে পারবেন না, আমার সঙ্গে চলেন। ৪৫ সেকেন্ড সময় নিয়েছিলাম সেদিন। কালভার্ট থেকে কিছুটা গিয়ে একটা মোড় আছে, মোড় পার হয়ে তিনটা রাস্তা তিন দিকে চলে গেছে। মোড়ে যাওয়ার পর ওদের বললাম এবার আপনারা যেতে পারেন, তবে বাড়ি যাবেন না, গেলেও পরে যাবেন, দরকার হলে একদিন পর যান। ওরা যাওয়ার পর আমি ডান রাস্তা ধরে ১০ কদম এগিয়েছি, বিকট শব্দে ব্লাস্ট হলো। চিৎকার, লোকজন ছুটছে, শুনতে পাচ্ছি। এটা ছিল ২৪ নভেম্বর, বায়তুল মোকাররমের অপারেশনটা করেছি ১০ নভেম্বর।

এ ঘটনার পর বেশ কয়েক ঘণ্টা রেল চলাচল বন্ধ ছিল। জানান দিতে চেয়েছি আমরা আছি, ঢাকা শহর ছাড়িনি। পাকিস্তান আর্মিকে অস্থির করে তোলার জন্য গেরিলা বাহিনীরা আছে।

বনশ্রী ডলি: তারপর...

নাসির উদ্দিন ইউসুফ বাচ্চু: এরপর চলে গেলাম গ্রামে। সেখানেও প্রচুর কাজ আমার। এর আগে ১৪ নভেম্বর সাভারে একটা ব্রিজ অপারেশন করি। সেই অপারেশন আমরা ফেল করি। সেই যুদ্ধে জহির উদ্দিন মানিক শহিদ হয়। ঢাকা-আরিচা সড়কে বিশাল জায়গায় ব্রিজটি। পাকিস্তান আর্মিরা চলে এসেছিল। পাকিস্তান আর্মিরা গুলি করতে করতে চলে আসে ব্রিজের ওপর। মানিকগঞ্জের দিক থেকে তা ঠেকাতে চেষ্টা করেছে ব্রিজের নিচে থাকা আমাদের বাহিনীর সদস্যরা, পারেনি।

আমরা সেদিন ৬৪ জন ছিলাম। ব্রিজ অপারেশনে যেটা করতে হয়, ফ্লাংক ভাগ করে পজিশন নিতে হয়। একদিকে মানিকগঞ্জ, অন্যদিকে ঢাকা। ১০০ মিটারের মধ্যে ১৫ জন করে দুই দিকে পজিশন নিয়েছে, আর ব্রিজের কাছে আমরা ৩৪ জন; আমরা এক্সপ্লোসিভ দিয়ে সিরিজ বোমা বানিয়ে তার ওপর বালির বস্তা দিয়ে সেট করছি, এসব অ্যারেঞ্জমেন্ট যখন হচ্ছে–দুই দিকের ফ্লাংকের একদিকে মানিকের নেতৃত্বে, অন্যদিকে আশরাফ ও তৌহিদ ছিল। তৌহিদ মেট্রিকের ছাত্র তখন, সেদিন আরও কজন ছিল। এদিকে ৩৪ জনের মাঝখানে আমি সিরিজ বোমার কানেকশন দিচ্ছি। হঠাৎ মানিকগঞ্জ থেকে পাকিস্তান আর্মির গাড়ি আসতে থাকে। কাছাকাছি আসার পর সামনের ফ্লাংকের বাহিনী তৌহিদ, আশরাফ, মাজেদরা ফায়ার করেছে; কিন্তু গাড়ি থামাতে পারেনি, পাকবাহিনী ব্রিজে উঠে আমাদের ফায়ার করতে থাকে। তখন কেরানীগঞ্জের বাবু ও করিম দুইটা বাচ্চা ছেলে আমাকে টান দিয়ে বলে স্যার মারা যাবেন, এখান থেকে চলেন। আমি ক্রলিং করে ঢাকার দিকের ফ্লাংকে গিয়ে দেখি মানিক নেই, সাবু একা, সাবু গুলি করছে, আমিও গুলি করছি। ওদিকে পাকিস্তানি

আমরা তিনভাগে বসেছি। প্রথম ফ্লাংক ওয়ান, ফ্লাংক টু, মাঝখানে মেইন বডি। জায়গাটা তিন থেকে চারশ গজজুড়ে। নিয়ম হচ্ছে, পাকবাহিনী ফ্লাংক ওয়ান ক্রস করবে, মেইন বডি পার হবে ফ্লাংক টু-এর দিকে যাওয়ার সময় মেইন বডি প্রথম একটা গুলি করবে, পরে ফ্লাংক টু গুলি করবে

বাহিনীর গাড়ির কাচ ভেঙে গেছে, টায়ার ফেটে গেছে; কিন্তু ওরা ফায়ার করতে করতে ব্রিজ দিয়ে গাড়ি টেনে নিয়ে বেরিয়ে গেল। একটু পরে তাকিয়ে দেখি এখানে তো মানিক ছিল গেল কোথায়? খুঁজে পাই না। ও সাঁতার জানে না, মানিকের মা আমাকে বলে দিয়েছিলেন। কয়েকজনকে বললাম, পানিতে ঝাঁপ দাও। ওরা পানিতে নেমে খুঁজে পায়, মানিকের মৃতদেহ ওপরে তোলে! ওর মৃতদেহ বাসে করে ঢাকায় আনা হয়, সে আরেক কাহিনি। একটি ছেলে সাভারে মামাবাড়িতে বেড়াতে গিয়ে মারা গেছে বলে সেনাবাহিনীর চোখ ফাঁকি দিয়ে ঢাকায় আনা হয়, তার মা-বাবার কাছে, পরে আজিমপুর কবরস্থানে দাফন করা হয় মানিককে। সেটা আরেক স্ট্রাগল ছিল। এমন কত যে কাহিনি আছে!

১৪ নভেম্বরের অপারেশন ফেল করি। ১৮ নভেম্বর আবার একটা অপারেশন করেছি। এর মধ্যে ঈদের দিন ঢাকায় এসে বোনদের সঙ্গে দেখা করেছি, বাসায় যেতে পারিনি, ওদের বন্ধুদের বাসায়। আবার ফিরে গেলাম। তখন একের পর এক অপারেশন চলছিল আমাদের; থানাগুলো আক্রমণ করছিলাম। সাভার থানা ও ধামরাই থানা।

মানিক মারা যাওয়ার পর আমরা ক্যাম্প বদল করে ঢাকার দিকে আরও এগিয়ে আসি। তখন ঢাকার কাছাকাছি আমাদের অবস্থানটা জরুরি ছিল। সাভার ডেইরি ফার্মের পেছনে জিরাবো স্কুলে ও আশুলিয়ায়ও ক্যাম্প করেছি। আশুলিয়ায় পাকিস্তান আর্মির সঙ্গে একটা বড়ো যুদ্ধ হয় ১৪ ডিসেম্বর সকালবেলায়।

সেদিন মিত্রবাহিনী টাঙ্গাইল থেকে এগিয়ে আসছে জেনারেল নাগরার নেতৃত্বে, আর আমাদের অবস্থান তখন সাভার ডেইরি ফার্মের পেছনে। এর আগে রেডিয়ো পাকিস্তান আক্রমণ করেছিলাম। সাভারে এখনো বেতারের একটা অফিস রয়েছে। আমরা সেটা দখল করতে গিয়েছিলাম, পাকিস্তানি আর্মিরা এর আগেই পালিয়ে যায়। কিন্তু কিছু যন্ত্র এমনভাবে নষ্ট করে রেখে যায় যে, আমরা আর সেগুলো ব্যবহার করতে পারিনি। তখনকার ট্রান্সমিটার টাওয়ার আমরা আর ভাঙিনি, কারণ এটা আমাদের দেশের সম্পদ।

১৩ ডিসেম্বর একটা অপারেশন করে আমরা ক্যাম্পে ঘুমিয়েছিলাম। ১৪ ডিসেম্বর ভোরে আমাদের ডেকে তোলে আমাদের একজন ওয়াচম্যান। ওখানে কাশিমপুর জায়গাটাতে এখন যেখানে জেলখানা, সেখানে কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের একটি বড়ো কেন্দ্র ছিল। ওখানে আমাদের ওয়াচম্যান গ্রামের ছেলে সাইকেলে করে এসে জানায়, স্যার এদিকে পাকিস্তান আর্মি আসছে। কত হবে? বলে অনেক, অনেক। ক্যাম্পে তখন তিনশ সোলজার, ডেকে উঠালাম। তাড়াতাড়ি তৈরি হও পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী আসছে। যে যার অস্ত্র নিয়ে আমরা কাঁচা রাস্তার ওপর পজিশন নিলাম। ঘণ্টাখানেক পরে দেখছি অনেক অস্ত্র নিয়ে হেঁটে হেঁটে হানাদার বাহিনী আসছে। একদিকে আখগাছ, কাঁঠালগাছ, সাভারের লাল মাটি উঁচু-নিচু। আমরা একদিকে গর্তের ভেতরে। আমরা তিনভাগে বসেছি। প্রথম ফ্লাংক ওয়ান, ফ্লাংক টু, মাঝখানে মেইন বডি। জায়গাটা তিন থেকে চারশ গজজুড়ে। নিয়ম হচ্ছে, পাকবাহিনী ফ্লাংক ওয়ান ক্রস করবে, মেইন বডি পার হবে ফ্লাংক টু-এর দিকে যাওয়ার সময় মেইন বডি প্রথম একটা গুলি করবে, পরে ফ্লাংক টু গুলি করবে। পাকিস্তানি বাহিনীর পুরো দল আমাদের ট্র্যাপে পড়ে যাবে তখন, এটাকে অ্যাম্বুশ বলে। আনফরচুনেটলি পাকিস্তানি সেনাদের দল ফ্লাংক টু-এর দিকে যাওয়ার আগেই আমার পাশের দুজনের পরে ইপিআরের সুবেদার মেজর রহমত আলী ছিলেন, তিনি নিজেকে সামলাতে পারেননি, গুলি ছুড়ে দেন। সঙ্গে সঙ্গে ওরাও ফায়ার শুরু করে, পেছনে থাকা পাকিস্তানি সেনাদের দলটি সুবিধাজনক জায়গায় চলে যায়। তখন ওরা বাইনোকুলার দিয়ে দেখে দেখে গুলি করছে। এমনভাবে গুলি করছে যে আমরা মাথা তুলতে পারছি না। ঠিক করি, আমার পজিশন চেঞ্জ করা দরকার। আমি তখন মেইন বডি থেকে পিছু হটে ১০০ গজ পেছনে গিয়ে ফ্লাংক ওয়ানের পেছনে যাই, পাকিস্তানি আর্মিদের আরও উত্তর-পশ্চিমে গিয়ে বড়ো বড়ো কাঁঠাল গাছের আড়ালে পজিশন নিই। আমার পাশেই ছিল আরিফ নামে একটা অল্পবয়সের যোদ্ধা। বায়তুল মোকাররম অপারেশনে আমাদের সঙ্গে ছিল। সে নটর ডেম কলেজের ছাত্র ছিল। আরিফকে বলেছি, ফ্লাংক টু-এর নুরুকে গিয়ে বলো, হানাদার বাহিনীর এলএমজিটা যেভাবেই হোক সাইলেন্ট করে দিতে। আরিফের পাশে ছিল টিটো। আরিফ টিটোকে যেতে বলেছে। টিটো আমাদের রন্ধন কমান্ডার; খাওয়ার দায়িত্বে ছিল, আমার দেখাশোনাও করত। মেলাঘরে যেদিন পৌঁছলাম, সেদিন খালেদ মোশাররফ ছেলেটিকে আমার দায়িত্বে দেন। মেলাঘরে যাওয়ার আগের দিন মনতলি যুদ্ধ করেছি, সেখানে আমরা ঢুকতে পারিনি। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ফরিদপুর কোম্পানিকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়। মনতলি গ্রামে থাকার সময়ই খালেদ মোশাররফ আমাদের দেখতে আসেন। মনতলি গ্রামেই টিটোকে আমরা পাই। ওকে খাওয়াদাওয়ার কাজে লাগিয়েছিলাম। সে ভালোই খাওয়াত।

টিটো তো যুদ্ধের নিয়ম জানে না, সে আমাদের মতো ট্রেনিং পায়নি। টিটো সোজা দৌড় দিয়েছে। তখনই ওকে ফায়ার করছে হানাদার পাকিস্তানি বাহিনী, সে এলএমজিটাকে সাইলেন্ট করার কথা বলতে যাচ্ছিল, ওটার একটা ব্লাস্ট তার গয়ে লাগে, হঠাৎ দেখলাম টিটোর বাঁ হাতটা ঝুলে পড়ে, ওর শরীরটা উপরে উঠে আবার ধাম করে নিচে পড়েছে। এরপর চিৎকার, কান্না; কিন্তু কিছুই করতে পারছি না!

পাকিস্তান আর্মিদের এই অবস্থানের কারণে। এটা নুরু দেখেছে। সে ত্বরিতগতিতে তার পজিশন কিছুটা বদলে নিয়ে দক্ষিণ-পশ্চিমে গিয়ে একটি টিলার ওপরে উঠে এলএমজিটা সাইলেন্ট করে। আমরা ক্রলিং করে টিটোকে এনে ক্যাম্পে পাঠিয়ে দিই। এর মধ্যে পাকিস্তান আর্মিকে আমি নানারকম ভুলভ্রান্তিতে ফেলার জন্য একবার ডান দিকে, একবার বামদিকে গুলি করে ভুল পথ দেখাচ্ছি। আমি চাইছি, ওরা ঢাকার দিকে এগিয়ে যাক। এভাবে বিভ্রান্তিতে ফেললাম। একটা সময় মনে হলো, ওদেরকে জিরাবো নদীতে নিয়ে ফেলি। আমাদের তিন-চার শ গজ দূরেই জিরাবো নদী। আমরাও গুলি করতে করতে দুভাগে ভাগ হয়ে ওদের গুলি করছি। ওরাও গুলি করতে করতে জিরাবো নদীতে নামার অবস্থা তখন, তাকিয়ে দেখে নদীর পাড়ে আমরা, পেছনে মিরপুরের মিল্কভিটা কারখানা। বিশাল এলাকা, এখন যেটা মাটি দিয়ে ভরাট করছে। খুব সুন্দর ছিল জায়গাটা। ওরা আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে, পানিতে নামতে পারছে না, কারণ ওরা পানি ভয় পায়। মুক্তিযোদ্ধারা একে একে ওদের মারছে। আর গ্রামের লোকজন লাঠি, বল্লম, কোচ নিয়ে আঘাত করছে, ওদেরকে মারার জন্য। এরই মধ্যে আমাদের মধ্যে ইপিআর সদস্য যারা উর্দু জানে, তারা চোঙা দিয়ে ওদের মেজর কমান্ডারকে সারেন্ডার করার আহ্বান জানাচ্ছে। আমরা তোমাদের সঙ্গে আগে সৈন্য ছিলাম, তোমাদের চিনি, মারব না। তোমরা আসো। পরে কয়েকজন এসে সারেন্ডার করেছে। সেই যুদ্ধে দুই শ পাকিস্তানি সেনা নিহত হয়। সেটাই ছিল আমার শেষ যুদ্ধ।

বনশ্রী ডলি: একজন কমান্ডার হিসাবে বুঝতে পেরেছিলেন কি মুক্তিযুদ্ধ শেষ হতে চলেছে বা আপনারা জয়ী হবেন কিংবা দেশ স্বাধীন হতে আর দেরি নেই?

নাসির উদ্দিন ইউসুফ বাচ্চু: না, ঠিক তেমনটা বুঝিনি, তবে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র, কলকাতা ও বিবিসির খবর আর অনুষ্ঠান শুনে আমরা বুঝতে পারছিলাম যে আমরা অনেক জায়গায় সফল হচ্ছি। তখন ইন্ডিয়ান আর্মি চলে এসেছে বাংলাদেশের ভেতরে।

বনশ্রী ডলি: আপনি যুদ্ধকালীন মূল অর্ডার কার কাছ থেকে পেয়েছেন, আর যোগাযোগ কীভাবে রক্ষা করতেন।

নাসির উদ্দিন ইউসুফ বাচ্চু: মেলাঘরের সঙ্গে যোগাযোগ করেছি সব সময়। আমাদের কুরিয়ার ম্যান বা মেসেঞ্জার ছিল। আসা-যাওয়া করেছে। আর যুদ্ধ মূল পরিকল্পনা আসার আগেই বলে দিয়েছে। এছাড়া বলেছিল, রাস্তাঘাট ভেঙে ব্রিজ ভেঙে হানাদার বাহিনীর চলাচলের পথ বন্ধ করে দিতে হবে। তাছাড়া পরিবেশ-পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে নিজেরাই পরিকল্পনা ডেভেলপ করে নিয়ে যুদ্ধ কৌশল নির্ধারণ করেছি। যেমন: ১৪ ডিসেম্বর যে পরিস্থিতিতে যুদ্ধ করতে হয়েছে।

বনশ্রী ডলি: ১৪ ডিসেম্বরের ঘটনা, বুদ্ধিজীবী ধরপাকড় ও হত্যার কোনো খবর পেয়েছিলেন কি?

নাসির উদ্দিন ইউসুফ বাচ্চু: না, তখনও জানি না ঢাকায় কী হচ্ছে। আমাদের শিক্ষকদের এভাবে ধরে নিয়ে যাচ্ছে আর মেরে ফেলছে। পাকিস্তান আর্মি এত খারাপ কাজ করতে পারে তা ভাবিনি। এটা যুদ্ধের নিয়ম নয়। কোনো নিরীহ মানুষকে মারতে পারে না। নিরস্ত্র যোদ্ধাকে মারবে না প্রতিপক্ষ, এটা জেনেভা কনভেনশনের নিয়ম। মুক্তিযোদ্ধারাও কোনো পাকিস্তান নিরস্ত্র আর্মিকে বা নিরীহ নাগরিককে মারতে পারবে না। এটা ভারতীয় বাহিনী আমাদের শিখিয়েছিল। ইউ আর নট অ্যালাউড কিল আ সিঙ্গেল সিটিজেন। যদি এমনটা কর, কোনো নিরীহ মানুষকে মার ও নিরস্ত্র যোদ্ধাকে হত্যা কর, তোমরা তাহলে যুদ্ধের নিয়ম ভঙ্গ করছ, একই সঙ্গে তোমরা কাপুরুষ হয়ে যাবে। এমনটা হইয়ো না। আমরা বেশির ভাগ মুক্তিযোদ্ধা মেনে চলেছি। এক্ষেত্রে সাধারণ মানুষ, যাদের বোনকে, স্ত্রীকে রাজাকার, পাকিস্তানি আর্মি ধর্ষণ করেছে, যাদের বাড়িঘর পুড়িয়ে দিয়েছে, লুটপাট করেছে সেই রাজাকার, আর্মিদের তারা ছাড়বে কেন। অনেকে সেই রাজকারদের হত্যা করেছে। তাই ১৪ ডিসেম্বর, ১৬ ডিসেম্বর এমন ঘটনা ঘটেছে। ওরা সারেন্ডার করার পরই জেনারেল নায়েগ্রা আমাকে ফোন করে বলেছেন, পাকিস্তান সোলজারদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা কর। নিহতদের দাফনের ব্যবস্থা কর।

সারেন্ডার করার পর ওদেরকে আমরা ক্যাম্পের একটা জায়গায় এনে রেখেছি। বাঁশের খোঁয়াড়ের মতো করে রেখেছি, খাওয়ার ব্যবস্থা করেছি। ওদেরকে অ্যারেস্ট করে রাখার নিয়ম নির্দিষ্ট ছিল, কতটা টর্চার করতে পারব কথা বের করার জন্য, কেমন আচরণ করতে হবে ইত্যাদি। এর আগেও আমাদের ক্যাম্পে ধরে এনে রেখেছি। ওরা অস্ত্র ছাড়া বসে আছে। গ্রামের লোকজন আসছে, দেখার জন্য ভিড় করছে। যেন অ্যানিমেল দেখার মতো। সে এক অন্যরকম দৃশ্য। গ্রামের উত্তেজিত জনতাকে তখন থামানো মুশকিল।

জেনারেল নায়েগ্রা আমাকে ফোন করেছেন যে, আমরা আসছি, আমার সোলজারদের থাকার ব্যবস্থা কর। জেনারেল নায়েগ্রার দল আসার পর বলেছি, এখানে একটা রেডিয়ো স্টেশন আছে, সেখানে তোমরা থাকতে পার। জেনারেল নায়েগ্রার সঙ্গে বাঙালি ক্যাপ্টেন মুখার্জি ছিলেন। তিনি বাংলায় আমার সঙ্গে কথা বলছেন–তোমরা কতটা মুক্ত করতে পেরেছ? বললাম, মিরপুর পর্যন্ত। তারা বলছেন, হ্যাঁ, সেজন্য টাঙ্গাইল থেকে আসার পথে কোথাও বাধা পাইনি। কিছু অন্যরকম দেখতে পাইনি।

তাদেরকে জায়গাটা ঘুরে দেখালাম। এরপর ম্যাপ নিয়ে আলোচনা করলেন। জানতে চাইলেন ঢাকার দিকে কতটা যেতে পারব। বলেছি, সাভার পার হয়ে মিরপুর ব্রিজের আগ পর্যন্ত যেতে পারব। ব্রিজের আগে এক কিলোমিটার দূরে আমাদের অবস্থান হওয়া উচিত।

বনশ্রী ডলি: ১৪ ডিসেম্বর, বুদ্ধিজীবীদের ধরা এবং হত্যা করার খবর কখন পেয়েছেন? হানাদার পাকিস্তানি বাহিনীর সারেন্ডার করার সময় ছিলেন? মানসিক অবস্থা কেমন ছিল, সেদিনের কথা মনে পড়ে?

নাসির উদ্দিন ইউসুফ বাচ্চু: আগে পাইনি। ১৫ ডিসেম্বর সকাল বেলায় জেনারেল নায়েগ্রাকে নিয়ে মিরপুর ব্রিজের দিকে গেলাম, এক কিলোমিটার দূরে। সঙ্গে নিলাম অনেক মুক্তিযোদ্ধা। যাওয়ার পর বলেছি, এর বেশি যাওয়া সম্ভব নয় কারণ ঢাকার দিকে ওরা ব্রিজের ওপরের দিকটায় কংক্রিটের ইমপোজড দেওয়াল দিয়ে বাংকার করেছে, যা ভেদ করা সম্ভব নয়। গেলে ওরা আমাদের মেরে ফেলবে। নায়েগ্রা বললেন, ভালো বলেছ, তোমার সোলাজারদের বল, কেউ যেন নদী ক্রস করে ঢাকায় না যায়। কারণ, মনে হয় ওরা সারেন্ডার করতে পারে। না করলে তো পরবর্তী নির্দেশ পাবে।

একপর্যায়ে সরাসরিই জেনালেন নায়েগ্রা বলেছেন, দে আর গোয়িং টু সারেন্ডার, দেন আই উইল গিভ ইনস্ট্রাকশন, ইউ আর নট ডু এনিথিং...। তুমি তোমার সোলজারদের রেস্টে যেতে বল, পেছনে থাকতে বল। এ পরিস্থিতিতে ওরা মিত্রবাহিনী সামনে থাকবে, এটাই স্বাভাবিক। আমাদের সোলজাররা মনে করে আমরা সামনে থাকব। এটা নিয়ে একটা টেনশন ছিল তখন। কিন্তু আমি তো জানি, আমার হায়ার কমান্ডার হলেন তিনি। এটা আগেই মেলাঘর ছাড়ার সময়ই বলে দিয়েছিল।

১৬ ডিসেম্বর সকালে জেনারেল নায়েগ্রা বলছেন, আমরা ঢাকায় যাচ্ছি। বললাম, আমিও যাই? বললেন না, তুমি যাচ্ছ না, তোমার কোম্পানির একটা ছোটো সেকশন আমাদের সঙ্গে দাও, যারা আমাদের সঙ্গে জিপে যাবে।

ততক্ষণে সবাই জেনে গেছে পাকিস্তান হানাদার বাহিনী সারেন্ডার করবে আজ। সবাই 'জয় বাংলা' স্লোগান দিচ্ছে। হাজার হাজার লোক। খাওয়াদাওয়া চলছে। বেঙ্গল রেজিমেন্টের লোকদের গ্রামের লোকেরা খাবার দিচ্ছে। এসব তো হ্যান্ডেল করতে হয়। গ্রামের মানুষ মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে

আমাকে না নেওয়ার কারণটা হচ্ছে, ওই এলাকার পুরো দায়িত্ব তখন আমার। কোম্পানি বলে। এই এলাকার শৃঙ্খলার জন্যই আমাকে থাকতে হবে। সাধারণ মানুষ উচ্ছৃঙ্খল হয়ে যাচ্ছে। ওরা যখন চলে গেল ঢাকায়, আমার মন তখন খুব খারাপ হয়েছে। তবে ডেইরি ফার্মে ফিরে এসে সব ব্যবস্থা করছি। যারা রেস্টে যাবে, তাদের ব্যবস্থা করেছি। আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের সামলানো কঠিন ছিল সেই সময়টাতে। বিশেষ করে ইপিআর সদস্যদের। আমাদের গেরিলা বাহিনীরা যেমন-তেমন, ইপিআর সদস্যরা তো মারাত্মক ছিল।

হ্যাঁ, ততক্ষণে সবাই জেনে গেছে পাকিস্তান হানাদার বাহিনী সারেন্ডার করবে আজ। সবাই 'জয় বাংলা' স্লোগান দিচ্ছে। হাজার হাজার লোক। খাওয়াদাওয়া চলছে। বেঙ্গল রেজিমেন্টের লোকদের গ্রামের লোকেরা খাবার দিচ্ছে। এসব তো হ্যান্ডেল করতে হয়। গ্রামের মানুষ মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। সোলজারদের সঙ্গে দেখা করার জন্য ঘরে ঢুকে যাচ্ছে। বাধা দিলে বলছে, ওরা তো আমাদেরই লোক। মিত্রবাহিনীর ওরা তখন উর্দুতে ও হিন্দিতে কথা বলছে, তোমরা সামনে যেও না, আমাদের কিছু যোদ্ধা দোভাষীর কাজ করে বলছে, ওরা তোমাদের লোক হলেও ঘরে যেতে পারবে না। ডেকে দিচ্ছি। বাইরে কথা বল তোমরা, এসব চলেছে তখন।

বেলা ৩টার পর ভাবলাম, না, এবার আমার ঢাকা যাওয়া উচিত। এর আগে মুক্তিযোদ্ধা জামালসহ ১০ জনের একটা সেকশন জেনারেল নায়েগ্রার সঙ্গে পাঠিয়েছি। ১০-১২ জন সেকশন, ৩০-৫০ জন হলে এক প্লাটুন আর ১৫০ জন হলে কোম্পানি বলা হয়। আমার ওখানে তখন তিন কোম্পানি। এর মধ্যে একটা সেকশন ছেড়ে দিলাম। সাড়ে ৩টা পর্যন্ত অপেক্ষা করি, আর ভালো লাগছে না। জিরাবো ক্যাম্পে ফিরে গিয়ে সাবু ও পনিরকে কোম্পানিগুলোর দায়িত্ব ভাগ করে দিলাম। সবাইকে ডেকে বলেছি, আমি ঢাকা যাব, তোমরা থাক। কেউ বাড়াবাড়ি করবে না, বাইরে বের হবে না। সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিশবে না।

এসব বলার কারণ, এখানে কে রাজাকার, কে দেশপ্রেমিক–কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। কে কোথায় কীসের জন্য নিয়ে যাবে। কার বাড়ি লুট করতে এই অস্ত্র বা যোদ্ধাদের ব্যবহার করবে কে জানে? এমনটা ঘটেছে পরবর্তী সময়ে। এসব দুর্ঘটনা ঘটেছে, কম হলেও তো ঘটেছে! আমাদের কোম্পানির এমন বদনাম যেন না হয়।

শীতকাল, বেলা চলে যাচ্ছে, চারটা বাজে, রেডিয়োতে শুনলাম সারেন্ডার হয়ে যাচ্ছে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে। আমরা যখন মিরপুরের কাছাকাছি, গাবতলী পার হয়েছি, পাশ থেকে বিকট শব্দ। এর কাছেই বিহারিদের আবাসস্থল। আমরা দ্রুত গাড়ি চালিয়ে সোহরাওয়ার্দীতে চলে আসি। তখন অন্ধকার হয়ে এসেছে। সারেন্ডার হয়ে গেছে। তখন সেখানে কর্নেল শফিউল্লাহ আছেন, মেজর হায়দার ভাইও আছেন, যিনি খালেদ মোশাররফ আহত হওয়ার পর সেক্টর কমান্ডারের দায়িত্ব নিয়েছিলেন। আমি স্যালুট দিয়ে দাঁড়ালাম। সবাই অনেক কনগ্রাচুলেট করলেন। ইন্ডিয়ান আর্মির ক্যাপ্টেন মুখার্জি সেখানে আছেন। মুখার্জি তখন কমান্ডার বাচ্চু বলে আমাকে পরিচয় করিয়ে দিলেন। বললাম, আমাকে একটু সময় ছুটি দিতে হবে। বলছেন, কত সময়। বললাম, মায়ের সঙ্গে দেখা করব। আমি আসার খবর ততক্ষণে আসাদ বাড়িতে বলেছে। ছোটো ছোটো লরিতে করে আসাদসহ আরও কজন, আরেকটাতে আমি বাসায় গেলাম। বাবা ও মা জিঞ্জিরা থেকে এপ্রিলেই ফিরে আসেন পল্টনের বাসায়। রাত হয়ে গেছে। যাওয়ার সময় পল্টনে দেখলাম, লোকারণ্য হয়ে গেছে। মা-বাবা আমাদের বৈঠকখানার বাইরে এসে দাঁড়িয়েছেন। পৌঁছানোর পর আমার ছোটোখাটো মা আমাকে জড়িয়ে ধরেছেন। বেঁচে আছি, দেশ স্বাধীন করে ফিরেছি মা। বোন ও ভাইয়েরা ছিল। বোনেরা আমার খুব প্রিয়।

বনশ্রী ডলি: আপনার পুরো পরিবার যুদ্ধ করেছে বলা যায়।

নাসির উদ্দিন ইউসুফ বাচ্চু: হ্যাঁ, একদম তেমনটাই। আমার ভাইয়েরা, আমার জন্য সবাইকে কষ্ট পেতে হয়েছে। সাফার করতে হয়েছে। সেদিন কিছুক্ষণ থাকার পর ফিরে যাই ক্যাম্পে। আবার গেলাম সাভারে। আমার সোলজারদের কাছে। আবার রাতে আমি ও সাবু ঢাকায় ফিরে আসি। সাবু জিঞ্জিরার ছেলে। শফিকুল ইসলাম স্বপন ওরা আসে, ঢাকায় ওরা রেডিয়ো দখল করেছিল। এভাবে ১৬ ডিসেম্বর শেষ হলো।

বনশ্রী ডলি : ১৭ ডিসেম্বর কী করলেন?

নাসির উদ্দিন ইউসুফ বাচ্চু: ১৭ ডিসেম্বর যখন বাসা থেকে বের হব, তখন কয়েকজন ভদ্রমহিলা ও ভদ্রলোক এসে কান্নাকাটি, চিৎকার করছে যে আমার স্বামী, আমার ভাই, আমার বাবাকে ধরে নিয়ে গেছে। আরও শুনছি, মুনীর চৌধুরীকে ধরে নিয়ে গেছে। এই শুনতে শুরু করি আরও অনেককে ধরে নিয়ে গেছে। এরপর মিরপুরে তাঁদের মৃতদেহ খুঁজে পেলাম। আবার জিরাবো ক্যাম্পে ফিরে গেলাম। আমার বাহিনীসহ ঢাকায় ফিরেছি। পরে ঢাকায় বিভিন্ন জায়গায় দায়িত্ব পালন শুরু করি। মুজিবনগর সরকারের নির্দেশমতো ঢাকা এয়ারপোর্ট, শাহবাগের রেডিয়ো পাকিস্তান, পরে রেডিয়ো বাংলাদেশ হয়েছে–এসব জায়গায় কিছুটা দায়িত্ব পালন করেছি। না, সরকারি কোনো কাজের দায়িত্ব পরে আর নিইনি, তখনও আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, বয়স ২১ বছর। ক্লাসে ফিরে যাই। আমার শিক্ষকরা আমাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

বনশ্রী ডলি: বঙ্গবন্ধুর খবর কিছু পেয়েছিলেন তখন? যুদ্ধ শুরুর আগে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছে কবে?

নাসির উদ্দিন ইউসুফ বাচ্চু: না, তখনও কোনো খবর পাইনি। বঙ্গবন্ধুকে দেখেছি ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে ভাষণ দিতে। এরপর ২৩ মার্চ ভোরবেলায় দেখেছি ধানমন্ডির ৩২ নম্বরের বাড়ির বারান্দায়। আমরা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের কয়েকজন জয় বাংলা পতাকা উড়ানোর জন্য গিয়েছিলাম ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধুর বাড়ির সামনের জায়গাটাতে। তিনি দোতলায় বসে ছিলেন। আমরা সোনার বাংলা গানটি গাইতে গাইতে জয় বাংলা পতাকা উড়িয়ে দিলাম।

বনশ্রী ডলি: ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু আসার আগে পরিস্থিতি এবং সেদিনের স্মৃতি...

নাসির উদ্দিন ইউসুফ বাচ্চু: ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু আসছেন, খবরটি পাই ৮ জানুয়ারি, লন্ডন থেকে বিবিসির মাধ্যমে জেনেছি। এর আগে শুনছিলাম যে আলোচনা চলছে, সম্ভাবনা আছে। কিন্তু ওনাকে যে তখন ছেড়ে দেবে, এটা বুঝতে পারিনি। ১০ জানুয়ারি আমার ডিউটি ছিল তেজগাঁওয়ের মণিপুরী পাড়ায়। যে রাস্তা দিয়ে বঙ্গবন্ধু যাবেন, আমার বাহিনীসহ সেই রাস্তার শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব দেওয়া হয় আমাকে।

যতদিন না তিনি এসেছেন, ততদিন আমরা ইন্ডিয়ান আর্মিদের বলেছি, তোমরা আমাদের নিয়ে যাও, লাহোর সেক্টর দিয়ে পাকিস্তান যাব। পারলে পাকিস্তান আক্রমণ করার কথা ভাবতাম আমরা। যুদ্ধ করে বঙ্গবন্ধুকে মুক্ত করে নিয়ে আসব। এখন মনে হলে হাসি পায়, ছেলেমানুষি ভাবনা ছিল। অবুঝ চিন্তা ছিল তখন আমাদের। উত্তেজনা আর অস্থিরতা এমনই ছিল। এছাড়া বঙ্গবন্ধুর মুক্তির জন্য মা ও বোন, কত মানুষ যে নামাজ পড়ে দোয়া চাইতেন, কাঁদতেন, রোজা রেখেছে, পূজা দিয়েছে, প্রার্থনা করেছে উপাসনালয়ে ও ঘরে!

আমাদের পাড়ায় হিন্দু পরিবারগুলো আস্তে আস্তে ফিরে আসে। যেসব বাসায় লুট হয়েছে, আগুন দিয়েছিল, তাদের বাড়িঘর পরিষ্কার করা, সংস্কার করার ব্যাপারে মুক্তিযোদ্ধারা সহায়তা করেছে। তখন বিশেষ রেশন চালু করা হয়েছিল। সরকারি গোডাউনে থাকা চাল নিয়ে এসে সঠিকভাবে বিতরণের ব্যবস্থা করেছে মুক্তিযোদ্ধারা। বাংলাদেশ ব্যাংকের টেক ওভারের সময় আমরা ছিলাম। এখানে আরেকটা কথা মনে পড়ছে, মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে ষোড়শ বাহিনী বলে একটা গ্রুপ ছিল, যারা ১৬ ডিসেম্বর সারেন্ডারের আগে অস্ত্রগুলো রাস্তায় ফেলে দিয়েছিল। কোথাও কোথাও অস্ত্রগুলো রাজাকারের হাতে তুলে দেয়। সেসব অস্ত্র নিয়ে তারা মুক্তিযোদ্ধা সেজে যায়। তারা ২২ বা ২৩ ডিসেম্বর থেকে বিভিন্ন জায়গায় লুটপাট শুরু করে। আর সেই লুট করার দায় গিয়ে পড়ে আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগ ও প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধাদের ওপর। এমন অনেককে আমরা ধরেছি, শাস্তি দিয়েছি। যেখানেই শুনেছি, সেখান থেকে তাদের ধরে শাস্তি দিয়েছি। তারপরও সেই বদনামটা মুক্তিযোদ্ধাদের নিতে হয়েছে। আমি মনে করি, এত বড়ো একটা যুদ্ধের পর কার হাতে অস্ত্র গেছে, সে মানুষটা কেমন, তা কেমন করে বুঝব? তবে বলতে পারি, শতকরা ৯৯ শতাংশ মুক্তিযোদ্ধা সৎ ছিলেন। মুক্তিযোদ্ধাদের বদনাম কম। কিন্তু মুক্তিযোদ্ধাদের নাম নিয়ে যেসব দেশদ্রোহী অস্ত্র হাতে নিয়ে মুক্তিযোদ্ধা সেজেছিল, তাদের সেই ঘৃণ্য কাজের দায় আমাদের ওপর পড়েছিল। এটা আমাদের একটা মনঃকষ্ট!

বনশ্রী ডলি: আপনি অস্ত্র জমা দিয়েছেন কবে?

নাসির উদ্দিন ইউসুফ বাচ্চু: মনে আছে দিনটির কথা, ১৯৭২ সালের ৩১ জানুয়ারি, পুরাতন বঙ্গভবনে বঙ্গবন্ধুর হাতে আমি অনেককে নিয়ে অস্ত্র জমা দিয়েছি। অস্ত্র জমা দেওয়ার পর বঙ্গবন্ধু আদর করেছেন। অস্ত্র সমর্পণের পর তিনি আমাকে দেখে বললেন, তোরা এত হ্যাংলা-পাতলা যে দেখলে মনে হচ্ছে না খেয়ে আছিস, আর তোরা কীভাবে ছয় ফুট লম্বা তাগড়া-তাগড়া পাকিস্তান আর্মিদের হারিয়ে দিলি! তখন বলেছিলাম, আপনার হুকুম, আপনার নির্দেশ আর সাধারণ জনগণের অংশগ্রহণ। তাই পেরেছি। আমরা মনে করেছি এটা আমাদের দায়িত্ব। স্যার বলে সম্বোধন করেছি ওনাকে; বললেন, স্যার ডাকলি কেন আমাকে? আপনি তো রাষ্ট্রপতি। সেদিন সেখানে শেখ কামাল ছিলেন, তোফায়েল আহমেদ ছিলেন। বললাম, যেদেশে আপনার মতো একজন নেতা আছে, যার হুকুম আমরা সাত কোটি মানুষের বেশির ভাগ শুনতে বাধ্য ছিলাম, অনেকে করেনি। এক কোটি শোনেনি। ছয় কোটি মানুষ আপনার কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে চেষ্টা করেছি। এদেশে মানুষ হয়েছি, ছোটোবেলা থেকে দেশটাকে ভালোবেসেছি। সব মিলিয়ে মানুষ যখন দেশের জন্য অকাতরে প্রাণ দিয়েছে, সেখানে আমার নিজের জীবনটা তুচ্ছ। তখন মনে হয়েছে আমার জীবনটা কিছুই না। এই জীবনের বিনিময়ে যদি দেশ স্বাধীন হয়, তাহলে মানুষ মুক্ত হবে। আর আপনার, আমার, সবার স্বপ্ন সত্যি হবে। সফল হবে। তখন তিনি আমার থুতনিতে ধরে আদর করে দিলেন। আমার কাঁধে হাত রেখেছেন। কিছু কথা শুনেছেন আরও শুনব বলেছেন। তোফায়েল ভাইকে বললেন, ওদেরকে চা বিস্কুট খাওয়াও। সবুজ চত্বরে তিনি কতক্ষণ হাঁটলেন। এরপর চা বিস্কুট খেয়ে আমরা চলে আসি। অস্ত্র জমা দেওয়ার পর আর কোনো সরকারি দায়িত্ব পালন করিনি। এরপর আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে আসি। আমার স্যাররা আমাকে বরণ করে নেন গর্বের সঙ্গে।

বনশ্রী ডলি: এই যে ৯৯ ভাগ মুক্তিযোদ্ধা সৎ ছিলেন, দেশ স্বাধীন হওয়ার সময়টাতে যে দেশপ্রেম, চেতনা, উদ্যম, দেশ স্বাধীন করার প্রত্যয়, অঙ্গীকার নিয়ে যুদ্ধ করেছেন, দেশ স্বাধীন হওয়ার পর সেই বিষয়গুলো কতটা রক্ষা করা গেছে, বর্তমানে কতটা দেখতে পান?

নাসির উদ্দিন ইউসুফ বাচ্চু: তেমনটা থাকতে পারেনি। কারণ যদি বলি, হয়তো এ কথাগুলো আমার বলা উচিত নয় তবুও বলতে হয়। আওয়ামী লীগ বিপ্লবী পার্টি নয়, এটি জনগণের দল। পরবর্তী সময় কিছু সুবিধাবাদী নেতার কারণে মুক্তিযুদ্ধটা আওয়ামী লীগের যুদ্ধ ও গৌরবের বিষয় হয়ে গেল। এখানেই মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে তাদের একটা ক্ল্যাশ দাঁড়াল। এর কারণ, বঙ্গবন্ধু আসার পর চারদিক থেকে কথা শুনেছেন। আমার সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর যে কথা হয়েছিল। আমার কাঁধে হাত রেখে শুনছিলেন, আমি তখন বঙ্গবন্ধুকে বলেছিলাম, স্যার আপনি তাজউদ্দীন স্যারের কাছে শুনবেন। শুনবেন যুদ্ধটা কীভাবে হয়েছে। সবকিছু জানবেন তাঁর কাছ থেকে। তখন তিনি বলেছিলেন, আমি শুনব, শুনব; তোদের কাছ থেকেও শুনব। আজ তোরা যা, আমার একজন বিদেশি গেস্ট আছে তাকে সময় দিতে হবে।

বনশ্রী ডলি: বঙ্গবন্ধু এবং বাংলাদেশ–আপনাদের মুক্তিযোদ্ধারা যেমন দেশ চেয়েছেন এর কতটা হয়েছে? বঙ্গবন্ধুকে আপনি কোন অভিধায় শ্রদ্ধা করবেন, কেন মনে রাখতে বলবেন ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে?

নাসির উদ্দিন ইউসুফ বাচ্চু: ১৯৫৬ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশ নাম উচ্চারণ করেছেন। পাকিস্তান পার্লামেন্টে, গণপরিষদেও। পাকিস্তান সংসদে যখন বিল আসে যে পূর্ববাংলার নাম হবে পূর্ব পাকিস্তান, তখন বঙ্গবন্ধু দাঁড়িয়ে বলেছেন যে আমরা আজ একটা মহা-অন্যায় করতে যাচ্ছি। এটা ঐতিহাসিকভাবে বেঙ্গল। কারণ, একটি প্রদেশের মতো হয়েছে তখন। পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম বাংলা। তিনি আরও বলেছেন, যদি পরিবর্তন করতে চাও, তাহলে এর নাম বাংলাদেশ হবে। অনেকে মনে করেন, তিনি হঠাৎ করে বাংলাদেশ চেয়েছেন। তা নয়। যুদ্ধের সময়

মিরপুরে বুদ্ধিজীবীদের গলিত, মথিত মৃতদেহগুলো আজও চোখ থেকে সরাতে পারি না! যে কারণে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে আমি মাঝেমধ্যে মৌলবাদী আচরণ করে ফেলি। এটা হয়তো ঠিক নয়। বিষয়টা যখন মুক্তিযুদ্ধ, তখন আমার নিজের ওপর অনেক সময় নিয়ন্ত্রণ থাকে না, রাখতে পারি না

আমরাও মেরেছি, পাকিস্তানিরাও আমাদের সাধারণ মানুষ মেরেছে। কারণ, মুক্তিযুদ্ধ সাধারণ মানুষের কাছে চলে গিয়েছিল, জনযুদ্ধে রূপান্তরিত হয়েছিল। কিছু মানুষ ছাড়া বাঙালি সবাই কোনো না কোনোভাবে যুদ্ধে অংশ নিয়েছে। জনগণ বা মুক্তিযোদ্ধারা যা শুনতে চেয়েছে, ৭ মার্চ তিনি তা বলে দিয়েছেন এবং ২৬ মার্চ আবার তিনি অন্যের মাধ্যমে ঘোষণা শুনিয়ে দিয়েছেন, যা রেডিয়োতে পাঠ করেছেন আব্দুল হান্নান। তাই মনে করি, ওনার মতো দৃঢ়ব্যক্তিত্ব ছাড়া স্বাধীনতাযুদ্ধ হতো না। এছাড়াও ওনার সম্পর্কের আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলি, ন মাস যে মুক্তিযুদ্ধ চলেছে, প্রতিটি দিন শেখ মুজিবের নাম উচ্চারিত হয়েছে, রেডিয়োতে এবং মুখে মুখে। কারণ, আমাদের স্লোগান ছিল জয় বাংলা, তোমার নেতা আমার নেতা, শেখ মুজিব, শেখ মুজিব। আর জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু স্লোগান এসেছে ১০ জানুয়ারি ১৯৭২ থেকে তিনি এয়ারপোর্টে নামার পর। এর আগ পর্যন্ত উচ্চারিত হয়েছে তোমার নেতা আমার নেতা, শেখ মুজিব, শেখ মুজিব। একটা জাতির রাষ্ট্র গড়ে ওঠার জন্য এবং দেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ চলাকালীন যখন একটা মানুষের ডাকে হয়, তাঁর মতো নেতার নামে হয়, প্রতিদিন তাঁর নাম উচ্চারিত হয় তখন বলার অপেক্ষা রাখে না তিনিই একমাত্র নেতা, মহান নেতা। আমি মনে করি, বঙ্গবন্ধু ছাড়া মুক্তিযুদ্ধ সম্ভব ছিল না। এমন আনকম্প্রোমাইজড লিডার ছাড়া মুক্তিযুদ্ধ হতো না। তাঁর আহ্বানেই মুক্তিযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে।

বনশ্রী ডলি: এর পরের বাংলাদেশ এবং বঙ্গবন্ধু হত্যা...

নাসির উদ্দিন ইউসুফ বাচ্চু: এরপর অনেক কাহিনি–জাসদ সৃষ্টি, রক্ষীবাহিনী, বঙ্গবন্ধুকে হত্যা, পরবর্তী বিষয় নিয়ে বলতে চাই না। তবে হ্যাঁ, জাসদের তখনকার কর্মকাণ্ড, সৃষ্ট পরিস্থিতির সুযোগ নিয়েছে হত্যাকারীরা। সবাই তো মুক্তিযুদ্ধ বিশ্বাস করত না। অনেকে কল্পনা করেনি বাংলাদেশ হবে, অনেকে বাংলাদেশ চায়নি। খন্দকার মোশতাকও কি কল্পনা করতে পেরেছে? যদি সে বাংলাদেশ চাইত, তাহলে কেন সেপ্টেম্বরে যুদ্ধকালীন পাকিস্তান ও আমেরিকার সঙ্গে যোগাযোগ করে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন চাইবে? বাংলাদেশ যিনি চেয়েছেন, সেই লোকটা ছিলেন তাজউদ্দীন আহমদ ও শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী।

বনশ্রী ডলি: এই ত্যাগ কি মনে রেখেছে মানুষ? এই চেতনা কি ধারণ করে? কতটা?

নাসির উদ্দিন ইউসুফ বাচ্চু: মনে রাখা বা চেতনাশূন্য হওয়া, বিরোধী মনোভাব তৈরি হওয়া–এটা নানা সরকারের ব্যর্থতা, জনগণের ব্যর্থতা নয় বলে আমি মনে করি। ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে রেখে কাজ করে চলেছি; ১৯৭২ সালে বিটিভিতে জাকারিয়া ভাইয়ের প্রযোজনায়, আমার পরিচালনায় 'আমি কি ভুলিতে পারি' মুক্তিযুদ্ধের অনুষ্ঠান শুরু করি। অনুষ্ঠানটি ছিল মুক্তিযুদ্ধের ঘটনা নিয়ে। মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে আমি সব সময় ভোকাল, সবচেয়ে বেশি অনুষ্ঠান করেছি। ২০০৭ সালে প্রথম বীরাঙ্গনাদেরকে সবার সামনে এনে অনুষ্ঠান করে সম্মানিত করেছি। তবে মিডিয়ার কল্যাণে হোক, বাংলাদেশের যে জায়গায় গ্রামে বা শহরে যেখানেই কথা বলতে ও অনুষ্ঠান করতে যাই, মানুষ অনেক সম্মান করে, এ অনুভূতি অন্যরকম।

বনশ্রী ডলি: মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে বিশেষ স্মৃতি যা ভুলতে পারেন না?

নাসির উদ্দিন ইউসুফ বাচ্চু: হ্যাঁ, মনে পড়ে, অনেক স্মৃতি আছে। তবে মিরপুরে বুদ্ধিজীবীদের গলিত, মথিত মৃতদেহগুলো আজও চোখ থেকে সরাতে পারি না! যে কারণে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে আমি মাঝেমধ্যে মৌলবাদী আচরণ করে ফেলি। এটা হয়তো ঠিক নয়। বিষয়টা যখন মুক্তিযুদ্ধ, তখন আমার নিজের ওপর অনেক সময় নিয়ন্ত্রণ থাকে না, রাখতে পারি না। কারণ, ওই দৃশ্যগুলো আমার সামনে চলে আসে। আমি প্রথম বীরাঙ্গনাদের জনসম্মুখে আনি, যখন ২০০৭ সালে সিরাজগঞ্জ থেকে ১৭ জন বীরাঙ্গনা নিয়ে অনুষ্ঠান করি। তারা যে ওখানে কী অবস্থায় ছিলেন, তা কেউ জানত না। প্রয়াত নাট্যকার সেলিম আল দীন তখন স্বর্ণ বোয়ালীতে থাকেন; সে আমাকে বলেছেন, তুই এখানে আয়। আপনার মনে আছে বোধহয়, কেন্দ্রীয় শহিদমিনারে বিজয় উৎসব উদ্‌বোধন করিয়েছিলাম সেই বছর। আমি যখন প্রথম তাদের ইন্টারভিউ নিচ্ছিলাম, তখন আমার হাত-পা কাঁপছিল অত্যাচারের কথা শুনে। চ্যানেল আইয়ে যখন ধর্ষণ হওয়ার কাহিনি প্রচার হলো, সিরাজগঞ্জে যাওয়ার পর অনেকে আমাকে বলেছে, এসব আপনি কেন করছেন। এসব তো লজ্জার কাহিনি। আমার তখন এত রাগ হলো যে, সেই ব্যক্তিকে আমি মঞ্চে উঠতে দিইনি। সিরাজগঞ্জে বিজয় উৎসব করেছি, সেই নারীদের অংশগ্রহণ করিয়েছি। সাফিনা লোহানী নামের ভদ্রমহিলা ওই বীরাঙ্গনাদের বাঁচিয়ে রেখেছিলেন। আমি তার ইন্টারভিউ করেছি প্রথম। উনি তখন সাহস করে কথাগুলো বলেছিলেন। এরপর বরিশাল, নওগাঁ এমনি করে সারা দেশ ঘুরে বেড়িয়েছি মুক্তিযুদ্ধের কাহিনি তুলে আনতে, এমন নারীদের খোঁজ করতে। তাঁরা এখনো আমাকে বাবা সম্বোধন করেন, আর আমি তাঁদের মা সম্বোধন করি। তাই মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে বিরূপ মন্তব্য করলে, বিরোধী কার্যকলাপ দেখলে আমার মাথা গরম হয়।

আর যে বাংলাদেশ চেয়েছিলাম, এই বাংলাদেশ এখনো হয়নি, পারিনি সেভাবে গড়ে তুলতে। এটা স্বাধীন ভূখণ্ড হতে পারে, তবে সেই বাংলাদেশ এখনো হয়নি।

বনশ্রী ডলি: এই ব্যর্থতা কেন, কীসের এবং ঘাটতিটা কোথায় রয়ে গেছে?

নাসির উদ্দিন ইউসুফ বাচ্চু: না, এটা জনগণের যতটা নয়, প্রশাসনের ব্যর্থতা এর চেয়ে বেশি। প্রশাসন মূল দায়ী। গোড়ায় যেতে গেলে শিক্ষা। তবে সাংস্কৃতিক কর্মীরা ৯৯ ভাগ মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে। তাঁরা নাটক, যাত্রাপালা করে, গান করে। সাংস্কৃতিক কর্মী রাজাকার, এমনটা খুব কমই দেখা যায়। হ্যাঁ, তবে ইসলামিক আছে হয়তো কিছু। সেটাকে ওভাবে আমরা দোষ দিই না।

আমার কথা হচ্ছে, সংস্কৃতি যে জাতির স্বাধীনতার কথা বলে, লড়াইয়ের কথা বলে, স্বপ্নের কথা বলে, সেটি যদি প্রশাসন ও শাসকদের কানে পৌঁছাত, তাহলে বাংলাদেশ অনেক আগেই সুন্দর জায়গায় পৌঁছাত। তা হচ্ছে না; তারপরও আমি বঙ্গবন্ধুর কন্যা শেখ হাসিনাকে অনেক ধন্যবাদ জানাই, তিনি অনেক বাধা পার করছেন। ২১ বছর বা ৩০ বছর একটা বাধাগ্রস্ত অবস্ট্রাগল সমাজ, রাষ্ট্রে, শিক্ষায় তৈরি হয়ে আছে, তা পার করতে হচ্ছে। হার্ডলগুলো পার করছেন তিনি। এই যে সম্প্রতি শিক্ষা কারিকুলাম তৈরি করা হয়েছে, তা নিয়ে বিরোধিতা শুরু হয়েছে। অনেক কিছু বদলে গেছে। একবার যখন বরফটা জমে যায়, তা ভাঙতে গেলে জলের মতো অতিক্রম করা সহজ নয়। শেখ হাসিনাকে আমরা অনেক সমালোচনা করছি, বা করতে পারি; কিন্তু এটা ভাবছি না যে তাঁকে এসব বরফ ভেঙে এগোতে হচ্ছে। তিনি ওই জায়গায় পৌঁছানোর জন্য মাঝেমধ্যে কিছু কম্প্রোমাইজও করেন। কারণ, আমাদের দেশে রাজাকার আর মুক্তিযোদ্ধা দুই-ই বর্তমান। আমরা যদি ১৯৭২ সালেই মুক্তিযোদ্ধাদের সঠিক তালিকা করতে পারতাম। রাজাকারদের লিস্ট করে তাদেরকে কারাগারে নয়, বাইরে রেখে তাদের সঙ্গে আলোচনা করে, কনভিন্স করার ব্যবস্থা করা, শিক্ষাব্যবস্থাটা ওরকম করে তাদেরকে বদলে দেওয়া আর যারা মানুষ হত্যা করেছে তাদেরকে আইন মেনে শাস্তি দেওয়ার কাজটা করা দরকার ছিল।

আরেকটি বিষয় হচ্ছে–মুক্তিযোদ্ধা যারা যুদ্ধ শেষে ফিরে এসেছেন, তাঁরা তো বেশির ভাগ সাধারণ মানুষ ছিলেন। কৃষক, ছাত্র, কামার-কুমোর, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী–তাঁদের তো আগে অস্ত্রের ক্ষমতা সম্পর্কে কোনো ধারণা ছিল না। এটা দিয়ে কী করা যায়, এ সম্পর্কে কোনো ভাবনা ছিল না, ধারণাও ছিল না। সে যখন এই অস্ত্র হাতে রাজাকার মেরেছে, পাকিস্তানি বাহিনীর সঙ্গে লড়াই করে হটিয়ে দিয়ে বাংলাদেশের পতাকা উড়িয়েছে; তাঁর ক্ষমতা ও গৌরবের জায়গাটা অনেক উপরে চলে গেছে। তা সরকার ধরতে পারেনি। পরবর্তী সময়ে আমার মনে হয়েছে, দুই লাখের কাছাকাছি মুক্তিযোদ্ধারা যে সংখ্যাটা ছিল, তাদের সবাইকে যার যার সেক্টরের আন্ডারে কনফাইন্ড করে ফেলা উচিত ছিল। তাদেরকে একটি ব্রেইন স্টরমিং-এ যাওয়া বা নেওয়া দরকার ছিল। এই যে অস্ত্র থেকে তুমি যে ক্ষমতা পেয়েছিলে, সেই ক্ষমতা আর কারও ওপর ব্যবহার করতে পারবে না। তুমি পরিবর্তিত মানুষ বুঝতে পারছি। তাঁর তো আগের অবস্থায় ফিরে যেতে হবে। কিন্তু পারছে না। এটা তাঁর স্ট্রাগল। অনেক অস্ত্র তখন লুকিয়ে রাখা হয়েছিল, সেসব অস্ত্র রাজনৈতিক পার্টিকে দেওয়া হয়েছে। তাই বলি, মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা হওয়া দরকার ছিল। ভিয়েতনামের একটা সিনেমা আছে, যেখানে দেখানো হয়েছে ফিরে আসা যোদ্ধারা সবার সঙ্গে খুব খারাপ আচরণ করত। চিৎকার চ্যাঁচামেচি করত। স্ত্রী, সন্তান, মা-বাবা, ভাই-বোন, স্বজনদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করত। কারও হাত নেই, পা নেই। কারণ, তার আগে অনেক ক্ষমতা ছিল, পরে আর সেটা নেই। কেউ আর তাঁকে লাইনে জায়গা ছেড়ে দেয় না। সমীহ করে না। মানসিকভাবে পরিবর্তিত বাস্তবতা মেনে নিতে পারছে না। যদি বলি, মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা করে সেক্টর ওয়াইজ দায়িত্ব দিয়ে সমাজে তাঁদের সম্মানের জায়গাটি নিশ্চিত করা দরকার ছিল। মুক্তিযোদ্ধাদেরকে তো স্থানীয়রা সম্মান করে, চেনে ও জানে। যদিও অনেক পরে রক্ষীবাহিনী করা হয়েছে, তবে এর রাজনৈতিক পরিচয় ছিল, সবাই মেনে নেয়নি। এমন ভুলত্রুটি হয়েছে আমাদের। এরপর বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে, চার নেতাকে হত্যা করে। এরপর খালেদ মোশাররফ নেই, হায়দার নেই, মঞ্জুর নেই, এমন আরও অনেককে হত্যা করা হয়েছে। বেঁচে থাকল কারা? যারা পাকিস্তানপন্থি। তারা রাষ্ট্রক্ষমতায় আসে। জিয়াউর রহমান সে রাস্তাটা করে দিল। এরপর জিয়াউর রহমানকেও হত্যা করা হয়। কয়েক বছরে বাংলাদেশে এত ঘটনা ঘটেছে, এসব নিয়ে ৯০ ঘণ্টার সিনেমা হতে পারে।

বনশ্রী ডলি: আপনারা মুক্তিযোদ্ধারা সংগঠিত কতটা থাকতে পেরেছেন বা পারেননি কেন?

নাসির উদ্দিন ইউসুফ বাচ্চু: প্রথমদিকে আমি নাটকে মন দিয়েছি। পঁচাত্তরের পর '৭৮ সালে আমাদের একটা প্রচেষ্টা ছিল। গোলাম আযমকে যখন পাকিস্তান থেকে নিয়ে এসে নাগরিকত্ব দেওয়া হয়, তখন আমরা আন্দোলন শুরু করি। দীর্ঘ সময় সেই চেষ্টাটা ছিল। অনেক ঘটনা আছে।

না, সাংগঠনিকভাবে সংগঠিত হতে পারিনি মুক্তিযোদ্ধারা। একটা কথা বলতে পারি, জনগণ কিছুটা বিচ্ছিন্ন থাকলেও মুক্তিযুদ্ধের গৌরবকে তারা অনুভব করে। এখনো যে কোনো গ্রামে-গঞ্জে বক্তৃতা দিতে যখন যাই, তারা পছন্দ করে, বসে শুনে। অনেক সম্মান করে আমাকে। টেলিভিশন বা নাটক-সিনেমা বা পত্রিকার কারণে হোক তারা আমাকে চেনে। তাদের সঙ্গে আমার রক্তের সম্পর্ক নেই; কিন্তু তারা যে সম্মান করে, তা আর কোথাও তো পাই না। মানুষ আমাকে তখন বাঁচিয়েছে, খেতে দিয়েছে, আশ্রয় দিয়েছে। এখনো মনে করি, বাংলাদেশের সিংহভাগ মানুষ মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে রয়েছে।

বনশ্রী ডলি: এই প্রজন্ম ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে কী বলতে চান?

নাসির উদ্দিন ইউসুফ বাচ্চু: এই যে বলি মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশ, বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ–এই বাংলাদেশ সৃষ্টিতে ৩০ লাখ মানুষ শহিদ হয়েছে, দুই লাখ মা ও বোন সম্ভ্রম হারিয়েছেন, তাঁরাও যুদ্ধ করেছেন। তাঁদের ত্যাগের বিনিময়ে বাংলাদেশ জন্ম নিয়েছে। বাংলাদেশটা এদেশের জনগণের, তাঁরাই ওনার, তাঁরাই বাংলাদেশের মালিক। এসব মনে রেখে, সম্মান দিয়ে এই দেশকে রক্ষা করার দায়িত্ব পালন করতে হবে তাঁদের।

প্রজন্মকে একটি কথাই বলব, আমাদের সময়, মুক্তিযুদ্ধের সময় যে আদর্শগুলো ছিল, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, জাতীয়তাবাদ মানে সাংস্কৃতিক ও ভাষাভিত্তিক সমাজ কাঠামো। সমাজতন্ত্রের জায়গায় এখন অন্য বিষয় এসেছে। সব মানুষের সম-অধিকার এ বিষয়গুলো মাথায় নিয়ে দেশের জন্য কাজ করতে। ঠিক আছে, দিন পালটে গেছে। আমি মনে করি, বাংলাদেশটা সব মানুষের। সেটা জাতিধর্মনির্বিশেষে। আমি বিশ্বাস করি, জ্ঞানের দিক থেকে বড়ো হলে আমি তাঁকে সম্মান করব; কিন্তু অর্থবিত্ত ও পেশিশক্তি বেশি হলে তাকে সম্মান করব না, এমনটাই হওয়া দরকার। একটা জ্ঞানভিত্তিক রাষ্ট্র কাঠামো গড়ে তুলতে কাজ করবে তাঁরা।

বনশ্রী ডলি: আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।

নাসির উদ্দিন ইউসুফ বাচ্চু: আপনাকেও ধন্যবাদ।

কলঙ্কিত ৩ নভেম্বর ও অভিশপ্ত রাজনীতি

■ আলী হাবিব

বাংলাদেশের বর্ষপঞ্জিতে যেমন কিছু গৌরবের দিন রয়েছে, তেমনই আছে কিছু কলঙ্কিত বা কালো দিন। সেই কালো দিনগুলোয় আমাদের সামনে চলে আসে কিছু বেদনাময় স্মৃতি। একধরনের গ্লানিবোধ আমাদের আচ্ছন্ন করে। তেমনই একটি শোকের দিন ৩ নভেম্বর।

১৯৭৫ সালের ৩ নভেম্বর মধ্যরাতে অশুভ শক্তির চক্রান্তে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে নির্মমভাবে হত্যা করা হয় মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী অন্যতম জাতীয় চার নেতাকে। আমরা পরম শ্রদ্ধায় স্মরণ করি সেই চার জাতীয় নেতা, স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ, ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী ও এএইচএম কামারুজ্জামানকে। পঁচাত্তরের ৩ নভেম্বর ঘাতকচক্র কারাগারে ঢুকে হত্যা করে এই চার মহান নেতাকে। এর আগে ১৫ আগস্ট সপরিবারে বঙ্গবন্ধুকে হত্যার মধ্য দিয়ে দেশে এক অস্থিতিশীল অবস্থা তৈরি করেছিল খুনিচক্র।

মনে করা হয়, ১৫ আগস্টের ধারাবাহিকতায়ই ঘাতকচক্র জেলহত্যার নৃশংস ঘটনা ঘটিয়েছিল। দীর্ঘ ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছিল। বাঙালির হাজার বছরের ইতিহাসে শ্রেষ্ঠ গৌরব এই স্বাধীনতাযুদ্ধ। কিন্তু পরাজিত শক্তি থেমে থাকেনি।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ মধ্যরাতে পাকিস্তান সেনাবাহিনী ঘুমন্ত বাঙালিদের ওপর ট্যাংক, কামান ও মেশিনগান নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। শুধু ঢাকায় নয়, সারা দেশেই বাঙালি নিধনে মেতে উঠেছিল তারা। বাধ্য হয়ে বাঙালি জাতিও অস্ত্র হাতে রুখে দাঁড়িয়েছিল। সেই যুদ্ধে

জামায়াতে ইসলামী, মুসলিম লীগসহ কয়েকটি রাজনৈতিক দলের অনুসারীরা পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সঙ্গে হাত মিলিয়েছিল। ৩০ লাখ শহিদের রক্তের বিনিময়ে সেই যুদ্ধে বাঙালি বিজয়ী হয়। পাকিস্তানি বাহিনীর সঙ্গে হেরে যায় তাদের এ দেশীয় দোসররাও। তারাই পরবর্তীকালে সংগঠিত হওয়ার চেষ্টা করে এবং নানারকম ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। সপরিবারে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা এবং কারাগারে জাতীয় চার নেতাকে হত্যা ছিল সেই ষড়যন্ত্রেরই অংশ। এ হত্যাকাণ্ড শুধু বাংলাদেশের ইতিহাসে নয়, বিশ্বমানবতার ইতিহাসেও এক কলঙ্কজনক অধ্যায়। কারাগারের নিরাপত্তানীতি ভেঙে রাতের অন্ধকারে এভাবে জাতীয় নেতাদের হত্যার ঘটনা বিশ্বে বিরল।

কারাগারের বন্দি এবং সর্বোচ্চ নিরাপত্তায় থাকা মানুষকে হত্যার দৃষ্টান্ত আর নেই। সব সম্ভবের দেশ বাংলাদেশে তা ঘটেছিল। উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের বিচারে ৩ নভেম্বরের জেলহত্যা ১৫ আগস্টের হত্যাকাণ্ডের ধারাবাহিকতা ছিল। প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে একটু পেছনে ফিরে তাকানো যাক। ৩ নভেম্বর রাত দেড়টা থেকে ২টার মধ্যে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের সামনে সেনাসহ একটি পিকআপ এসে থামে। রাত দেড়টার দিকে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে জেলার আমিনুর রহমান কারাগারে আসেন। রাত ৩টায় সেনারা নির্দেশ দেয় চার জাতীয় নেতাকে একত্র করতে। কারা মহাপরিদর্শক একটি কাগজে চারজনের নাম লিখে জেলার আমিনুর রহমানকে দিলেন। চার জাতীয় নেতা হলেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, ক্যাপ্টেন মনসুর আলী ও এএইচএম কামারুজ্জামান। আমিনুর রহমানের বর্ণনা অনুযায়ী, সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও তাজউদ্দীন আহমদ একটি কক্ষে এবং ক্যাপ্টেন মনসুর আলী ও এএইচএম কামারুজ্জামান অন্য কক্ষে ছিলেন। সবাইকে প্রথম কক্ষে জড়ো করা হলো।

আমিনুর রহমান তাঁর ভাষ্যে বলেছেন, তাজউদ্দীন তখন কোরআন শরিফ পড়ছিলেন। সৈয়দ নজরুল ইসলাম হাতমুখ ধুলেন। কেউ কিন্তু কোনো প্রশ্ন করেননি, তাঁদের কেন এমন করা হচ্ছে। একত্র করার কাজে কিছুটা সময় লেগেছিল; এতে অধৈর্য ও ক্ষিপ্ত সেনাদের মুখ থেকে ছুটেছিল অশ্রাব্য গালাগাল। এরপর তো বার্স্ট ফায়ার!

বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, বঙ্গভবন দখলকারী মেজরদের হুকুম তামিল করেছিল তাদের আজ্ঞাবহ খন্দকার মোশতাক। তবে এটা সন্দেহাতীত যে জেলহত্যার চূড়ান্ত নির্দেশ এসেছিল প্রেসিডেন্টের কাছ থেকে। অবৈধ প্রেসিডেন্ট অবৈধ নির্দেশ দিয়েছিল। তাদের মতে, পঁচাত্তরের পর বাংলাদেশ তো মিনি পাকিস্তান হতে চলেছিল। উপরন্তু ডানপন্থি ও পাকিস্তানপন্থি মোশতাক খুনিদের পছন্দের ছিল। দ্বিতীয়ত, বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে জাতীয় চার নেতা মুক্তিযুদ্ধ সফলভাবে পরিচালনা করে আরও বড়ো অপরাধ করেছিলেন! ১৫ আগস্ট-পরবর্তী সময়ে জাতীয় চার নেতা মোশতাকের সহযাত্রী হলে তাঁরা বন্দি হতেন না বা তাঁদের প্রাণও দিতে হতো না।

বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যার আড়াই মাস পর ৩ নভেম্বর জেলে বন্দি অবস্থায় চার জাতীয় নেতাকে হত্যা করা হয়েছিল। এ আড়াই মাস দেশে কোনো বৈধ সরকারের অস্তিত্ব ছিল না। বিশ্বাসঘাতক খন্দকার মোশতাক আহমেদকে সামনে খাড়া রেখে চার খুনি মেজর ও কর্নেলের নির্দেশে ঢাকার শাসন পরিচালিত হচ্ছিল। প্রেসিডেন্সিয়াল ডিক্রির জোরে শাসন চলছিল। এ শাসন না সামরিক, না অসামরিক। সারা দেশে এ শাসনের থাবা তখনও বিস্তৃত হয়নি।

জাতীয় চার নেতা ছিলেন বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে মুক্তিসংগ্রামের চার অধিনায়ক। তাঁরা ছিলেন বঙ্গবন্ধুর গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রভিত্তিক অসাম্প্রদায়িক সমাজ গঠনের আদর্শে দৃঢ় বিশ্বাসী এবং তাঁর দৃঢ় অনুসারী। তাঁদের বাঁচিয়ে রাখলে তাঁদের নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধারা আবার ঐক্যবদ্ধ হবে এবং জিয়া-মোশতাকচক্রের সব ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দেবে–এ ভয় থেকেই ১৫ আগস্টের ঘাতকের দল ৩ নভেম্বরের কাপুরুষোচিত হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে। গণতান্ত্রিক রাজনীতির অনৈক্য ও ভুল এই হত্যাকাণ্ডে ঘাতক শক্তিকে সাহস জুগিয়েছে।

আন্তর্জাতিকভাবে খ্যাত সাংবাদিক ম্যাসকারেনহাসের লেখা 'আ লিগ্যাসি অব ব্লাড' গ্রন্থে জেলহত্যার উল্লেখ আছে। ১৯৭৫ সালের ২ নভেম্বর রাতে পালটা সামরিক ক্যুর ফলে যখন খন্দকার মোশতাক ও খুনিদের গদি টলটলায়মান হয়ে ওঠে, তখনই তারা রাষ্ট্রের সবচেয়ে নিরাপদ স্থানে হত্যা করে বরেণ্য এ চার জাতীয় নেতাকে। পলায়নের আগমুহূর্তে খুনিরা তাদের পৃষ্ঠপোষক রাষ্ট্রের ইঙ্গিতে নিশ্চিত হতে চেয়েছিল যাতে বাংলাদেশে আর কখনো মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ ও চেতনা ফিরে না আসে। ম্যাসকারেনহাসের বইয়ের বর্ণনায় পাওয়া যায়, পূর্বপরিকল্পনা অনুসারে খুনি মোসলেম উদ্দিন ও তার দল ওই রাতে সশস্ত্র অবস্থায় জেলখানায় প্রবেশ করতে চাইলে বঙ্গভবন থেকে ১৫ আগস্টের খুনি মেজরদের একজন মেজর রশিদ টেলিফোনে ডিআইজি প্রিজনকে নির্দেশ দেন, মোসলেম উদ্দিনকে যেন কোনো রকম বাধা দেওয়া না হয়। বিশ্বসভ্যতার ইতিহাসে এমন নজিরবিহীন ভয়ঙ্কর নির্দেশ শুনে ডিআইজি প্রিজন হতভম্ব হয়ে সরাসরি বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতি খন্দকার মোশতাককে টেলিফোন করেন। খন্দকার মোশতাকের কাছ থেকে একই রকম হুকুম শুনে ডিআইজি অসহায় হয়ে সবকিছু নিয়তির ওপর ছেড়ে দেন। এভাবেই বাঙালি জাতি ও ৩০ লাখ শহিদের রক্তে রঞ্জিত বাংলাদেশকে কলঙ্কিত করা হলো দ্বিতীয়বারের মতো, মাত্র আড়াই মাসের ব্যবধানে।

দুঃখের বিষয়, জেলহত্যার পর দীর্ঘদিন ক্ষমতা দখলে রেখেছিল খুনিদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক পক্ষ। তারা ধামাচাপা দিয়ে রেখেছিল হত্যা মামলার বিচার। সুপরিকল্পিতভাবে অনেক আলামত নষ্ট করা হয়েছিল। ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ বিজয়ী হয়ে সরকার গঠনের পর মামলার প্রক্রিয়া আবার চালু করা হয়। ২০০৪ সালের ২০ অক্টোবর নিম্ন আদালত থেকে মামলার রায় পাওয়া যায়। রায়ে তিনজনের মৃত্যুদণ্ডসহ ১৫ জনের সাজা হয়। এরপর মামলা যায় হাইকোর্টে, পাওয়া যায় হাইকোর্টের রায়; যদিও সাজাপ্রাপ্তদের বেশির ভাগই পলাতক কিংবা বিদেশে অবস্থান করছে। নির্মম সেই হত্যাকাণ্ডের ৪৯ বছর পেরিয়ে গেছে। কয়েকজনের ফাঁসি কার্যকর হয়েছে বঙ্গবন্ধুকে হত্যার অপরাধে। বাকি আসামিরা শুরু থেকে পলাতক। তাদের শাস্তির মুখোমুখি করা যায়নি। বিদেশে পলাতক খুনিদের ফিরিয়ে এনে ইতিহাসের আরেক কলঙ্ক থেকে জাতিকে মুক্ত করতে হবে।

৩ নভেম্বর প্রতিবছর আসে। আমরা শহিদ জাতীয় নেতাদের শ্রদ্ধা জানাই। কিন্তু আমরা কি তাঁদের আদর্শে পুনরায় দীক্ষা নিতে চাই? এ দীক্ষা নিতে হলে ইতিহাসের জটিল প্রশ্নগুলোর সঠিক ও সাহসী জবাব আমাদের খুঁজে বের করতে হবে। ৩ নভেম্বরে জাতীয় নেতারা ক্ষমতায় ছিলেন না। ছিলেন বিচারাধীন অভিযুক্ত হিসাবে জেলে বন্দি। এরপরও তাঁদের বিচারে দণ্ড না দিয়ে জেলে পাগলা ঘণ্টি বাজিয়ে হত্যা করা হলো কেন? ঘাতকদের হাতে জেলে ঢোকার জন্য অবৈধ প্রেসিডেন্টের অবৈধ অনুমোদনপত্র তুলে দেওয়া হয়েছিল কেন–এসব প্রশ্নের জবাব জানা খুবই প্রয়োজন আজ।

সমৃদ্ধ সোনার বাংলার স্বপ্ন দেখেছিলেন বঙ্গবন্ধু ও জাতীয় চার নেতা। তাঁদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা।

লেখক: সাংবাদিক ও ছড়াকার

প্রবন্ধ

বিজয়ীদের মুখেই শুনেছি বাংলাদেশের বিজয়গাথা

■ জুলফিকার আলি মাণিক

সব ধরনের সংকটে সাংবাদিক উলটো স্রোতের মানুষ। যুদ্ধ, গোলাগুলি, সহিংসতা, অগ্নিকাণ্ড, বন্যা, খরা, ঝড়, জলোচ্ছ্বাস, ভূমিকম্প, দুর্ভিক্ষ–এমন বিচিত্র ভয়াবহতায় সবাই যখন নিজেকে বাঁচাতে ঘটনাস্থল থেকে নিরাপদ আশ্রয়ে ছোটেন, সেখানে একমাত্র সাংবাদিকই সব ধরনের বিপদ-বিপর্যয়ের দিকে ছুটে যান। সাংবাদিকের এই ছুটে যাওয়ার উদ্দেশ্য হলো তথ্য সংগ্রহ করা। এ তথ্য সংগ্রহের কাজ করতে গিয়ে সাংবাদিক মানুষের জীবনের গল্প শুনেন। কাল্পনিক নয়, সত্য গল্প শুনেন। মানুষের বাস্তব অভিজ্ঞতার কথা জানেন তাঁদেরই মুখ থেকে। অল্পসংখ্যক মানুষের কাছ থেকে সত্যগুলো সংগ্রহ করে বিপুল জনগোষ্ঠীকে জানান। তাঁরা এ দায়িত্ব পালন করেন সমাজের সব ধরনের অসংগতি দূর করার উদ্দেশ্যে। নিয়মিতভাবে বিচিত্র অসংগতির খবর সংগ্রহ করতে গিয়ে তাঁদের মন-মানসিকতাও বিপর্যস্ত (ট্রমাটিক) হয়। এসবের সুদীর্ঘ, এমনকি চিরকালীন নেতিবাচক প্রভাবও তাঁদের মনোজগতে পড়ে–যা সাংবাদিকের মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। তবে এটাও ঠিক, একজন সাংবাদিক যত জটিল, কঠিন, বিস্তৃত ও স্পর্শকাতর ঘটনা নিয়ে রিপোর্টিং করেন, তাঁর জ্ঞান ও কাজের দক্ষতা ততই শানিত ও সমৃদ্ধ হয়।

সামসময়িক ও দূর অতীতের বিচিত্র বিষয় নিয়ে রিপোর্টিং করতে গিয়ে অসংখ্য সত্যের মুখোমুখি হয়েছি বিগত তেত্রিশ বছরে। যার অনেক প্রতিবেদনের চিরকালীন ঐতিহাসিক মূল্যও আছে বলে আমার বিশ্বাস। সেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড়ো বিষয় মহান মুক্তিযুদ্ধ। আমার

চোখের সামনে না ঘটলেও ঘটে যাওয়া ঘটনার সত্যের ভেতরে ঢুকতে গিয়ে অতীত জীবন্ত হয়ে ওঠে আমার জীবনে। মুক্তিযুদ্ধ আমার কাছে ঠিক তেমন একটি বিষয়। মুক্তিযুদ্ধের সাক্ষী হওয়ার সৌভাগ্য আমার হয়নি। কিন্তু প্রায় সাড়ে তিন দশকের সাংবাদিকতায় মুক্তিযুদ্ধের অগণিত প্রত্যক্ষ সাক্ষীর মুখে যুদ্ধগাথা শুনে রিপোর্টিং করতে করতে আমার মানসপটে মুক্তিযুদ্ধ এক জীবন্ত অধ্যায়। সেখানে মুক্তিযুদ্ধে জয়ের গৌরবময় বীরত্বগাথা যেমন আছে, তেমনই আছে জেনোসাইড, গণহত্যা, ধর্ষণ, লুটপাট, অগ্নিসংযোগ ও বিশ্বাসঘাতকতার মতো কলঙ্কজনক ও বেদনাবিধুর অধ্যায়। বাঙালির সর্বশ্রেষ্ঠ গৌরবের ইতিহাস স্বাধীনতার সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধ। সেই রাজনৈতিক সংগ্রামের এবং সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের সাক্ষীদের কাছ থেকে সরাসরি ঐতিহাসিক তথ্য জানার-বোঝার সুযোগকে সাংবাদিকতাচর্চায় সবচেয়ে বড়ো সৌভাগ্যের অধ্যায় বলে অনুভব করি।

একাত্তর সালে মহান মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে রণাঙ্গনের খবর নিয়ে সাংবাদিকতা করা দেশি সাংবাদিকের সংখ্যা বেশি নয়। তাঁদের মধ্যে অত্যন্ত সুপরিচিত আলোকচিত্রী সাংবাদিক রশীদ তালুকদার। তিনি ক্যামেরাবন্দি করে রেখেছিলেন রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের দুর্লভ ঐতিহাসিক বহু মুহূর্ত। কিন্তু সব প্রস্তুতি নিয়েও আকস্মিক দুঃখজনক ঘটনাচক্রে রশীদ তালুকদার একাত্তরের ১৬ ডিসেম্বর দখলদার পাকিস্তানের আত্মসমর্পণ ও স্বাধীন বাংলাদেশের বিজয়ের সর্বশ্রেষ্ঠ মুহূর্তের ছবি তুলতে পারেননি। একাত্তরের ১৬ ডিসেম্বর বিজয়ের তথ্য ও ছবি দেশের সংবাদপত্র ও সাংবাদিকরা কীভাবে সংগ্রহ করে প্রকাশ করেছিলেন, তা নিয়ে দেড় দশক আগে প্রতিবেদন করি দ্য ডেইলি স্টারে। সেই প্রতিবেদন করতে গিয়ে রশীদ তালুকদারের গভীর দুঃখ ও চিরকালীন আক্ষেপের কথাটি জানতে পারি। আমার সেই প্রতিবেদনের জন্য রশীদ তালুকদার ছাড়াও সাংবাদিক ফওজুল করিম (তারা ভাই নামে সুপরিচিত), হেদায়েত হোসেন মোরশেদ, আফতাব আহমদসহ বহুজনের সঙ্গে কথা হয়েছে। সরাসরি তাঁদের কাছ থেকে শুনতে শুনতে আমার মনে হয়েছে, একাত্তরের চির অমলিন বিজয়ের দিনটি স্বচক্ষে না দেখলেও আমার জীবনে জীবন্ত রূপ পেয়েছে। মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে আমার অগণিত রিপোর্টিংয়ের সুযোগ ও অভিজ্ঞতাকে সাংবাদিক হিসাবে অপার সৌভাগ্য বলে মনে করি। কারণ, সেই সময় হয়তো খুব বেশি দূরে নয়, যখন বাংলাদেশের সাংবাদিকদের জন্য মুক্তিযুদ্ধের সাক্ষীদের সাক্ষাৎ পাওয়ার সুযোগ চিরতরে শেষ হয়ে যাবে। কারণ, ইতিহাসের সাক্ষীরা বয়সের কারণে আমাদের জীবন থেকে হারিয়ে যাচ্ছেন। এরই মধ্যে চলে গেছেন স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় দৈনিক প্রকাশের সঙ্গে যুক্ত সেসব সাংবাদিক, যাঁদের সাক্ষাৎকার নিয়েছিলাম দেড় দশক আগে।

একইভাবে আর কখনো পাওয়া যাবে না জগজিৎ সিং অরোরা ও জে এফ আর জ্যাকবকে। তাঁরা বাংলাদেশের অকৃত্রিম বন্ধু, আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সবচেয়ে বড়ো মিত্র ভারতের সেনাবাহিনীর দুই কর্মকর্তা। অরোরা ও জ্যাকব একাত্তরের ১৬ ডিসেম্বর দখলদার পাকিস্তানি সেনাদের আত্মসমর্পণ ও মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের বিজয়ের ঐতিহাসিক ঘটনার অবিচ্ছেদ্য অংশ। দখলদার পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণের ঐতিহাসিক ছবিতে এ দুই বন্ধু যোদ্ধার অবদান অমোচনীয় স্মৃতি হয়ে আছে। সাংবাদিকতার সূত্রে এ দুজনের কাছ থেকে সরাসরি বাংলাদেশের বিজয়ের দিন সম্পর্কে জানার সুযোগ হয়েছে আমার। একাত্তরে ভারতীয় সেনাবাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের অধিনায়ক ছিলেন লেফটেন্যান্ট জেনারেল অরোরা। তখন জ্যাকব ছিলেন মেজর জেনারেল, তিনিও পরে লেফটেন্যান্ট জেনারেল হয়ে পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের অধিনায়ক হয়েছিলেন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের শুরু থেকে মুক্তিবাহিনীর গেরিলাদের প্রশিক্ষণ এবং অস্ত্র ও রসদ সরবরাহের ক্ষেত্রে ভারতীয় বাহিনীর সাহায্য এসেছিল জেনারেল অরোরার মাধ্যমে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের শেষ পর্যায়ে একাত্তরের ডিসেম্বরে নৃশংস দখলদার পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধে নামে ভারত। তখন পূর্বাঞ্চলে যুদ্ধের জন্য মুক্তিযুদ্ধরত বাংলাদেশ ও মিত্র ভারতের যৌথ কমান্ড গঠিত হয়েছিল। সেই কমান্ডের অধিনায়ক ছিলেন লে. জেনারেল অরোরা। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বিকালে ঢাকা শহরের রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) অরোরার কাছেই দখলদার পাকিস্তান সেনাবাহিনীর পূর্বাঞ্চলের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট জেনারেল এ এ কে নিয়াজি আত্মসমর্পণ করেন। নিয়াজির আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে একাত্তরে নয় মাসব্যাপী রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের বিজয় অর্জিত হয়। আত্মসমর্পণের ঐতিহাসিক দলিলটি তৈরি করেন লে. জেনারেল জ্যাক জ্যাকব এবং তিনিই পাকিস্তানি দখলদার সেনাবাহিনীর কমান্ডার নিয়াজিকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করান। একাত্তরের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশের বিজয়ের ইতিহাসের এই পর্বটি সাংবাদিকতার সূত্রে জ্যাকবের মুখ থেকেই জানার সৌভাগ্য হয়েছে আমার। জ্যাকব বলেছেন, আত্মসমর্পণের দলিলের খসড়া তৈরি করে তিনি একাত্তরের ১৬ ডিসেম্বর সকালে ঢাকায় দখলদার পাকিস্তান সেনাবাহিনীর পূর্বাঞ্চলের অধিনায়ক জেনারেল নিয়াজির কাছে যান। নিয়াজির সামনে টেবিলে খসড়া দলিলটি রাখেন জ্যাকব। তারপর নিয়াজিকে জিজ্ঞেস করেন, 'ডু ইউ অ্যাকসেপ্ট দিস ডকুমেন্ট?' নিয়াজিকে তিনবার এই প্রশ্ন

নিয়াজির সামনে টেবিলে খসড়া দলিলটি রাখেন জ্যাকব। তারপর নিয়াজিকে জিজ্ঞেস করেন, 'ডু ইউ অ্যাকসেপ্ট দিস ডকুমেন্ট?' নিয়াজিকে তিনবার এই প্রশ্ন করেছিলেন জ্যাকব। তিনবারই উত্তর না দিয়ে নিশ্চুপ ছিলেন নিয়াজি

করেছিলেন জ্যাকব। তিনবারই উত্তর না দিয়ে নিশ্চুপ ছিলেন নিয়াজি। তারপর জ্যাকব আত্মসমর্পণের খসড়া দলিলটি টেবিল থেকে তুলে নিয়ে নিয়াজিকে বলেন, 'তুমি এটা (আত্মসমর্পণের দলিল) গ্রহণ করেছ বলে আমি গণ্য করছি।' ২০০৮ সালে জ্যাকব ঢাকায় এসেছিলেন। তখন তাঁর বয়স ছিল ৮৭ বছর। আমি ছিলাম ইংরেজি দৈনিক দ্য ডেইলি স্টারের প্রতিবেদক। জ্যাকব দেহত্যাগ করেছেন ২০১৬ সালে।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ের ২৬ বছর পর ১৯৯৮ সালের মার্চে প্রথম ও শেষবারের মতো ঢাকায় এসেছিলেন বাংলাদেশের বিজয়ের আরেক সাক্ষী অরোরা। তখন তাঁর বয়স ৮১ বছর। ঢাকা সফরের সাত বছর পর ২০০৫ সালে অরোরা দেহত্যাগ করেন। একাত্তরের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ের পর ১৯৭২ সালের মার্চে জেনারেল অরোরা ও ভারতীয় মিত্রবাহিনীর সদস্যরা ফিরে যান ভারতে। এরপর মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের আমন্ত্রণে ১৯৯৮ সালে যখন ঢাকায় এসেছিলেন অরোরা, তখন আমি দৈনিক মুক্তকণ্ঠের প্রতিবেদক। অরোরার ঢাকা সফর নিয়ে রিপোর্ট করার দায়িত্ব পড়েছিল আমার ওপর। ঢাকায় বিমানবন্দরে অরোরা পৌঁছানোর মুহূর্ত থেকে আমার স্পট রিপোর্টিংয়ের কাজ শুরু হয়েছিল। ঢাকা বিমানবন্দরের ভিআইপি লাউঞ্জে অভ্যর্থনা জানানোর সময় অরোরার দুচোখের কোণে জল দেখেছিলাম। ছলছল চোখ আর আবেগাপ্লুত কণ্ঠে সবার সঙ্গে করমর্দন করেছিলেন। তাঁর পরনে নীল ব্লেজারে মুক্তিযুদ্ধকালীন বাংলাদেশের পতাকার 'কোটপিন' শোভা পাচ্ছিল। সেই কোটপিনকে ঘিরে কথা উঠতেই অরোরা জানিয়েছিলেন, বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় পতাকা সবুজের মধ্যে লাল বৃত্ত এবং বৃত্তের ভেতর হলুদ রঙে বাংলাদেশের মানচিত্র দিয়ে তৈরি একটি টাই একাত্তর সাল থেকে তাঁর কাছে সযত্নে রেখেছেন। ঢাকা বিমানবন্দরে আবেগঘন কণ্ঠে অরোরা সাংবাদিকদের বলেছিলেন, 'বাংলাদেশে আমি আমার বন্ধুদের কাছে এসেছি।...আমরা বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য একসঙ্গে যুদ্ধ করেছি। এটা আমার জীবনের এমন একটা ঘটনা, যা আমি কখনো ভুলতে পারব না, ভুলতে চাইও না।' মুক্তিযুদ্ধকালে জেনারেল অরোরার বয়স ছিল ৫৪ বছর। একাত্তরের ১৬ ডিসেম্বর তাঁর কাছে দখলদার পাকিস্তানি সেনাদের অধিনায়ক জেনারেল নিয়াজি আত্মসমর্পণ করেন। এই চির গৌরবের ইতিহাস পরবর্তী সময়গুলোয় তাঁর জীবনকে কতটা আলোড়িত করেছে? এই প্রশ্নের জবাবে অরোরা ভারতে তাঁর বাসায় গিয়ে দেখে আসার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন আমাদের। বলেছিলেন, 'দেখবেন বড়ো বড়ো ছবি আছে আমার বাসায়, যা প্রতিদিন সেই ঘটনা স্মরণ করিয়ে দেয়।'

দখলদার পাকিস্তানের আত্মসমর্পণ এবং বাংলাদেশের বিজয়ের ঐতিহাসিক আনুষ্ঠানিকতা হয়েছিল ঢাকার উন্মুক্ত রেসকোর্স ময়দানে। যেখানে জনসাধারণের উপস্থিতিও ছিল। কেন ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে দখলদার পাকিস্তানি সেনাদের আত্মসমর্পণ করানো হয়েছিল, সেই নজিরবিহীন প্রেক্ষাপটটি সরাসরি জেনারেল জ্যাকবের মুখ থেকেই শুনেছি, আর জ্যাকবই এ সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। যদিও নৃশংস দখলদার পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর অধিনায়ক জেনারেল নিয়াজি আত্মসমর্পণ করতে চেয়েছিলেন ঢাকায় তার কার্যালয়ে। কিন্তু জেনারেল জ্যাকব তাতে রাজি হননি। এর কারণ জেনেছি জ্যাকবের ভাষ্যে–নিয়াজি ও তার সেনাবাহিনী সত্যিই বাংলাদেশের মানুষের সঙ্গে বর্বর আচরণ করেছে। তাই আমি চেয়েছিলাম তাকে (নিয়াজিকে) ঢাকায় জনসম্মুখে আত্মসমর্পণ করাতে। তাই তাকে বলেছিলাম, রেসকোর্স ময়দানে আত্মসমর্পণ করতে হবে। তা-ই হয়েছে। এটা জনসম্মুখে আত্মসমর্পণের একমাত্র ইতিহাস।

লেখক: অনুসন্ধানী সাংবাদিক ও গবেষক

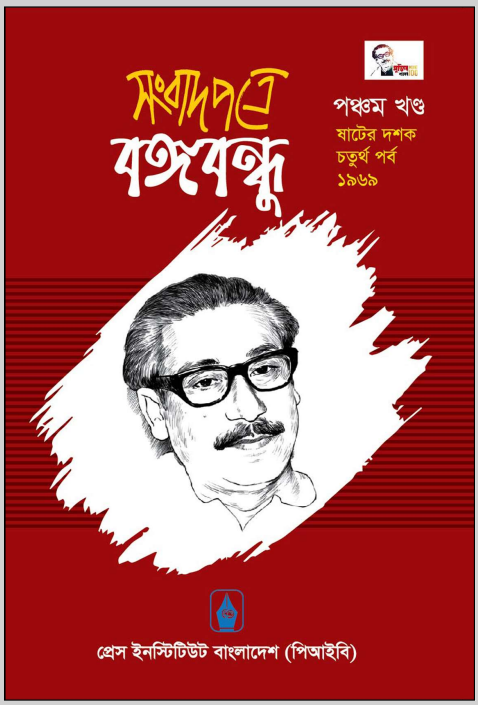

পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

প্রবন্ধ

মুক্তিযুদ্ধে যশোর রোড

■ সাজেদ রহমান

যশোর রোডের বয়স কয়েক শ বছর। কিন্তু তা বিখ্যাত হয়েছে আমেরিকার কবি অ্যালেন গিন্সবার্গের কারণে। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের শেষদিকে ভারতের কলকাতায় এসেছিলেন তিনি। সেখানকার অনেক কবি ও সাহিত্যিকের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব ছিল। তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। ১৯৭১ সালে কলকাতায় এসে তিনি সুনীলের বাড়িতেই উঠেছিলেন। তখন বাংলাদেশ থেকে অনেক শরণার্থী পশ্চিমবঙ্গ ও সীমান্তবর্তী অন্যান্য শহরে আশ্রয় নিয়েছিলেন। সুনীলকে সঙ্গে নিয়ে তিনি শরণার্থীশিবির দেখতে বের হন। সেসময় ভারি বৃষ্টি হওয়ায় যশোর রোডের অনেক স্থান পানিতে ডুবে গিয়েছিল। সড়কপথে যেতে না পেরে গিন্সবার্গ অবশেষে নৌকায় করে বনগাঁ পেরিয়ে যশোর সীমান্তে পৌঁছান। তাঁরা যশোর সীমান্ত ও এর আশপাশের শিবিরগুলোয় বসবাসকারী শরণার্থীদের দুর্দশা প্রত্যক্ষ করেন। পরে তিনি আমেরিকায় ফিরে যান। সেখানে গিয়ে ওই বছরের ১৪ থেকে ১৬ নভেম্বরের মধ্যে শরণার্থীশিবিরের অভিজ্ঞতা থেকেই গিন্সবার্গ লেখেন, 'সেপ্টেম্বর অন যশোর রোড' নামের একটি বিখ্যাত দীর্ঘ কবিতা–

'লক্ষ শিশু দেখছে আকাশ অন্ধকার
উদর স্ফীত, বিস্ফোরিত চোখের ধার
যশোর রোডে–বিষণ্ন সব বাঁশের ঘর
ধুঁকছে শুধু, কঠিন মাটি নিরুত্তর।'

আমাদের মহান স্বাধীনতাযুদ্ধে লাখ লাখ শরণার্থী যশোর রোড ধরেই ভারত গেছেন। আর বিজয়ের পর এ রোড ধরেই লাখ লাখ শরণার্থী ফিরে এসেছেন স্বদেশভূমিতে। তাঁদের দুঃখ-দুর্দশা প্রত্যক্ষ করেছে যশোর রোড আর তার শতবর্ষী রেইনট্রিগুলো। আবার এ পথ ধরেই যশোরে এসেছেন স্বাধীন বাংলার প্রথম অস্থায়ী সরকারপ্রধান তাজউদ্দীন আহমদসহ বহু দেশিবিদেশি সাংবাদিক।

মহান স্বাধীনতার ৫৩ বছর পর এ প্রজন্মের অনেকের কাছেই বিস্ময়কর মনে হতে পারে, তবুও সেদিন একাত্তরের উত্তাল দিনগুলোয় নিরস্ত্র লাখো জনতা যশোর সেনানিবাস অবরুদ্ধ করে রেখেছিল। একদিন নয়, পরপর চার দিন–৩১ মার্চ থেকে ৩ এপ্রিল। মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে গোটা দেশে পুরো নয় মাসে সাড়ে সাত কোটি বাঙালির প্রতিটি লড়াই ছিল সাহসে উজ্জীবিত; নির্বিকার শান্ত মৌন মানুষের ঝলসে ওঠার কাহিনিতে ভরা। তবুও এর মধ্যে কোনো কোনো ঘটনা আপন ঔজ্জ্বল্য নিয়ে চিরকাল দেদীপ্যমান হয়ে রয় ইতিহাসে। যশোরের প্রতিরোধযুদ্ধে ৩১ মার্চ থেকে ৩ এপ্রিলের সময়কাল তেমনই একটি পর্ব, যা কখনোই ম্লান হওয়ার নয়। এ চার দিনের শিক্ষা নয় মাসের মুক্তিযুদ্ধে ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে সাহস জুগিয়েছিল।

ঘড়ির কাঁটার মতো ঘণ্টা, মিনিট কিংবা সেকেন্ডের ঘরেই ইতিহাসের কালপর্বকে বাঁধা কঠিন। কেননা ইতিহাস সামনে এগিয়ে চলে একটি ঘটনার সঙ্গে অন্য একটি ঘটনাকে গ্রথিত করে। তাই একাত্তরে যশোরের প্রতিরোধযুদ্ধ শুধু ১ মার্চ থেকে শুরু হয়ে ৪ এপ্রিল যশোর শহরের পতন–এই সময়কালকে নির্দেশ করে না। এটা শুরু হয়েছিল ১৯৪৮ সালে ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে যখন যশোরবাসী রাজপথে নেমে এসেছিলেন আর সমাপ্তিকাল ১৯৭১ সালের ৬ ডিসেম্বর, যেদিন স্বাধীন বাংলার পতাকা নির্বিঘ্নে উড্ডীন হয়েছিল।

যখন যশোরের মানুষ সেনানিবাস অবরোধ করেছিল, তখন কলকাতার বেশ কয়েকটি পত্রিকার সাংবাদিক যশোর এসেছিলেন। তাঁদের বর্ণনা থেকে যশোর রোডের বিবরণ পাওয়া যায়। কলকাতার কালান্তর পত্রিকার সাংবাদিক অমিতাভ দাশগুপ্ত ২ এপ্রিল বেনাপোলের সাদীপুর সীমান্ত দিয়ে যশোর শহরে আসেন। তিনি লেখেন, 'প্রচণ্ড রোদের ভেতর ছাউনিবিহীন আমাদের জিপ ছুটে চলল। জিপের আগে-পিছে দুজন করে স্টেনগানধারী সৈনিক। কাগজপুকুর, শার্শা, নাভারণ পেরিয়ে জিপ ছুটে চলছে সামনে। ঝিকরগাছায় দেখলাম কয়েকটি বড়ো মাপের ট্রাক সেতু পেরিয়ে ছুটে আসছে। ট্রাকে বহু মহিলা ও শিশু। বুঝলাম শহর এলাকা থেকে এদের নিরাপদে সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে। যশোর শহরে পৌঁছে দেখলাম শহর মানে একটি দগ্ধাবশেষ শহর...।'

কলকাতার যুগান্তরের সাংবাদিক সুখরঞ্জন সেনগুপ্ত যশোর রোড দিয়ে ৮ এপ্রিল যশোর শহরের পাশে মালঞ্চি পর্যন্ত এসেছিলেন। যশোর রোডের শরণার্থীদের হৃদয়স্পর্শী বর্ণনা দিয়ে তিনি লেখেন, "যশোর রোডের উপর লাউজানি লেভেল ক্রসিং গেটের কাছে রেলের স্লিপারের উপর বসে আছি। আমার চারপাশে ৬ জন ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলের হাবিলদার। তাঁরা অত্যন্ত বিপন্ন। দূরে পুবদিকের কয়েক গ্রাম জ্বলছে দেখা যাচ্ছে। সেদিকে তাকিয়ে রয়েছি। এমন সময় দেখা গেল কয়েকশো লোকের মিছিল ভারত সীমান্তের দিকে। এদের অধিকাংশ নারী ও শিশু। সঙ্গে রয়েছে বাক্স, পোঁটলা-পুঁটলি, ছাগল, হাঁস ও মুরগি। চোখের জলের মধ্য দিয়ে তাদের যাত্রা। রেলওয়ে স্লিপার থেকে উঠে এলাম ওই লোকগুলোকে ভালো করে দেখার জন্য। পাঁচ-ছয় বছরের একটি মেয়ে গলা ছেড়ে কাঁদছে, কাঁদছে তার মায়ের জন্য। কাঁদছে আর হাঁটছে। তার মা পাকিস্তানি ফৌজের হাত থেকে বেরিয়ে আসতে পারেনি। একটি বুড়ি মেয়েটিকে সান্ত্বনা দিয়ে চলেছে, 'তোর মা আগে গেছে'। বারে বারে একই কথা বলতে বলতে বুড়িও চোখের জল মুছছে।"

যশোর রোড এবং এর আশপাশে কত মানুষ ও মুক্তিযোদ্ধা শহিদ হয়েছেন, এ বিষয়টিও ফুটে উঠেছে সুখরঞ্জন সেনগুপ্তের লেখায়। তিনি লিখেছেন, 'মুক্তিফৌজের একটি ছেলেকে বকাবকি করছিলেন তার কমান্ডার। পনেরো-ষোলো বছর বয়সের একটি ছেলে। সবে রাইফেল ছোড়া শিখেছে। বাংকারে বসে রাত্রে যুদ্ধের নিয়মকানুন মানে না। কখনো গান গায়, কখনো হেসে ফেলে, কখনো বা বিড়ি খায়। শত্রুপক্ষ যে কোনো সময় টার্গেট করে গুলি করে দিতে পারে। বকাবকির পরও ছেলেটার হাসি থামে না। পারের দিন আর ছেলেটিকে দেখতে পেলাম না। শুনলাম তার দেহ লাশ হয়ে গেছে। বাংকারে বসে গান গাইতে গাইতে বিড়ি ধরাচ্ছিল, অমনি ওপার থেকে শত্রুপক্ষের গুলি তার বক্ষ ভেদ করে যায়। বোধহয় তখনও তার মুখে হাসি ছিল, বোধহয় কণ্ঠে গানও।'

মার্চের শেষে বেনাপোল চেকপোস্টে বাংলাদেশের একটি পতাকা উত্তোলন করা হয়েছিল। নয় মাস ধরে হানাদার পাকিস্তানি বাহিনীর প্রচেষ্টা ছিল পতাকাটি নামানোর। আর মুক্তিবাহিনীর মরণপণ শপথ ছিল–যেভাবেই হোক স্বাধীনতা ও বিজয়ের প্রতীক ওই পতাকাটিকে রক্ষা করার। এজন্য উভয়পক্ষ হাজার হাজার রাউন্ড গুলি ছোড়ে। হতাহত হয়েছে দুতরফেই। তবুও শেষ পর্যন্ত হানাদারদের অভিলাষ অপূর্ণ থেকে গেছে।

বেনাপোল চেকপোস্টে বাংলাদেশ ভূখণ্ডে যশোর-কলকাতা মহাসড়কের পাশে স্বাধীন বাংলার ওই পতাকাটি উত্তোলন করা হয়েছিল অসহযোগ আন্দোলনকালে। ১৯৭১ সালের এপ্রিলের শেষ নাগাদ হানাদার পাকিস্তানি বাহিনী বেনাপোলের কাছে পৌঁছে যায়। কিন্তু পতাকাটি রক্ষার জন্য মুক্তিবাহিনীর একটি দল ক্যাপ্টেন হাফিজের নেতৃত্বে সেখানে তাঁদের অবস্থান বজায় রাখে। কারণ, ওই পতাকাটিই সাংবাদিকসহ বিদেশি পর্যবেক্ষকদের কাছে প্রমাণ দিত স্বাধীন বাংলাদেশের অস্তিত্বকে। পতাকাটি নামাতে না পেরে হানাদার পাকিস্তানি বাহিনী বেনাপোলের প্রবেশমুখ থেকে ভারতের অভ্যন্তরে কামানের গোলাবর্ষণ করতে থাকে মাঝেমধ্যে। এতে কয়েকজন ভারতীয় হতাহত হন।

মে মাসের মাঝামাঝি ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় সেনা কমান্ডের প্রধান লে. জেনারেল অরোরা বেনাপোল আসেন। তিনি ক্যাপ্টেন হাফিজকে অনুরোধ জানান চেকপোস্টের অবস্থান ছেড়ে ভারতের ভেতরে অবস্থান নিতে। এ সময় ১৮ বিএসএফ-এর কমান্ডার লে. কর্নেল মেঘ সিং এগিয়ে এসে জেনারেল অরোরাকে বলেন, 'স্যার ওই ফ্ল্যাগ স্ট্যান্ডে উড্ডীন বাংলাদেশের পতাকাটি রক্ষার প্রতিশ্রুতি আমি দিয়েছি। ওটি কেবল আমার মৃতদেহের ওপর দিয়েই নামানো সম্ভব।' জেনারেল অরোরা মুচকি হেসে চলে যান। ১৮ মে জেনারেল ওসমানী বেনাপোল সীমান্তে আসেন। তাঁর নির্দেশে ক্যাপ্টেন হাফিজ ও পতাকা রক্ষাকারী দল ভারতের অভ্যন্তরে অবস্থান নেয়। এরপর ক্যাপ্টেন তৌফিক-ই-এলাহি চৌধুরীর নেতৃত্বাধীন মুক্তিযোদ্ধা ও ভারতীয় সেনাবাহিনী পতাকাটির মর্যাদা রক্ষা করে চলেন। কোনোদিনই পতাকাটির কাছে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ঘেঁষতে পারেনি। ওরা এগিয়ে এলেই মুক্তি ও মিত্রবাহিনীর মেশিনগান গর্জে উঠত।

ভিনদেশের একটি পতাকার মর্যাদা রক্ষার জন্য মেঘ সিংহের এই ভূমিকা ও মমত্ববোধ আমাদের স্বাধীনতাযুদ্ধের ইতিহাসে বিরল। তাঁর ব্যাটালিয়নকে পরে অন্যত্র সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল। যাওয়ার সময় তিনি পতাকা রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত সেনাদের বলেছিলেন, 'ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা–এই পতাকা যেন বাংলাদেশ মুক্ত হওয়া পর্যন্ত উড্ডীন থাকে।' মেঘ সিংহের সেই প্রার্থনা মহান সৃষ্টিকর্তা মঞ্জুর করেছিলেন। গৌরব ও মর্যাদার সঙ্গেই স্বাধীন বাংলার পতাকা বেনাপোল চেকপোস্টে উড্ডীন ছিল হানাদারমুক্ত বাংলাদেশ অর্জন না হওয়া পর্যন্ত।

নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর ৬ ডিসেম্বর যশোর মুক্ত হয়। ১১ ডিসেম্বর যশোর শহরে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম জনসভা অনুষ্ঠিত হয় টাউন হল ময়দানে। সেসময় বহু বিদেশি সাংবাদিক এই যশোর রোড ধরেই যশোর আসেন। দেশে ফিরেন লাখ লাখ শরণার্থী এ পথ দিয়ে, যাঁরা এপ্রিল থেকে শুরু করে নভেম্বর পর্যন্ত ভারতে গিয়েছিলেন। দেশ স্বাধীনের পর 'জয় বাংলা' স্লোগানে মুখরিত হয়ে ওঠে যশোর রোড।

১৯৭১ সালের ৯ ডিসেম্বর বিখ্যাত যশোর রোডে ভারতীয় একটি ট্যাংকের এগিয়ে যাওয়াকে ক্যামেরাবন্দি করেন রঘু রাই

সাংবাদিক সুখরঞ্জন সেনগুপ্ত আরও লিখেছেন, "আমরা সকাল প্রায় পৌনে ৯টা নাগাদ বেনাপোল দিয়ে বাংলাদেশের যশোর জেলার সীমানায় প্রবেশ করি। কিন্তু আবেগের মুহূর্ত আসে নাভারণে। নাভারণ বাজারে বেশকিছু লোকের ভিড়। আমাদের গাড়ি সেখানে থামামাত্র লোকেরা আনন্দে 'জয় বাংলা' ধ্বনি দিতে থাকেন। আমাদের জড়িয়ে ধরেন এবং কেউ কেউ পশ্চিম পাকিস্তানিদের নির্মম অত্যাচারের কথা বলতে বলতে কেঁদে ফেলেন। সেই হত্যা, ধর্ষণ, লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ, নিপীড়নের করুণ কাহিনি যার শুরু হয়েছে মার্চের শেষ থেকে এবং অব্যাহত ছিল মাত্র ৪৮ ঘণ্টা আগেও। যাওয়ার পথে প্রথম বড়ো ভিড় হয় গদখালীতে। সেখানে লোকেরা শেখ মুজিবুর রহমান ও শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর জয়ধ্বনি করেন।

নাভারণ থেকে পশ্চিম পাকিস্তানি সৈন্যরা চলে যাওয়ার সময় নাভারণের ব্রিজটি উড়িয়ে দিয়ে যায়। ফলে আমাদের মাঠের মধ্য দিয়ে জিপ নিয়ে যেতে হয়। জওয়ানরা সেখানে বাইপাস তৈরি করেছেন। সকাল সাড়ে ৯টার পর যখন ঝিকরগাছা পৌঁছাই, তখন সেখানে কয়েক হাজার লোকের ভিড়। ঝিকরগাছা কপোতাক্ষ নদের উপর গুরুত্বপূর্ণ সড়ক ও রেলব্রিজ সোমবার রাত্রি ১টা নাগাদ পাকিস্তানি সৈন্যরা ভেঙে দিয়ে চলে যায়। ভারতীয় বাহিনীর আজ সকালে সেখানে রাবারের নৌকার উপর দিয়ে ব্রিজ নির্মাণের কাজ শুরু করেন এবং স্থানীয় লোকেরা ও মুক্তিবাহিনী ওই কাজে সহযোগিতা করেছেন।

নৌকায় কপোতাক্ষ পার হয়ে ঝিকরগাছার পূর্ব পারে গিয়ে ওঠার পর সেখানে আবারও জনতার জয়ধ্বনি। হোটেলওয়ালা বুড়ো নুর মিয়া দেখেই আনন্দ কলরব করে বলে উঠলেন, বাবু আবার এসেছেন। এপ্রিল মাসের প্রথম এক সপ্তাহ ঝিকরগাছায় নুর মিয়ার হোটেলে সাংবাদিকদের খাবার জায়গা ছিল। নুর মিয়া চোখের জল মুছতে মুছতে বললেন, খানেরা খুব মেরে মরে গেছি মনে করে ফেলে দিয়েছিল। আগের হোটেলে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে। স্কুটারওয়ালা শহিদুল ইসলাম তার স্কুটার গাড়িতে দুজন জওয়ানকে নিয়ে যাচ্ছিল। দেখামাত্র স্কুটার থেকে নেমে এসে জড়িয়ে ধরল, বাবু বেঁচে আছি। এই শহিদুল আন্দোলনের সময় আমাদের স্কুটারে করে বেনাপোল থেকে ঝিকরগাছায় নিয়ে আসত। ঝিকরগাছার লোকেরা পশ্চিম পাকিস্তানি সৈন্যদের নির্যাতনের কথা জানাতে গিয়ে বলছিল, ওদের নৃশংসতার কাহিনি বলতে গেলে এক মাসেও শেষ হবে না। তারা বলছিল যে, আজ যে এত লোক দেখছেন, এরা এতদিন সকলে দূর গ্রামের মধ্যে কোনোক্রমে প্রাণরক্ষা করেছে। বাজারগঞ্জে কোনো বয়সের পুরুষ আসতে পারত না। এতদিন পরে মুক্তির আনন্দে তারা রাস্তা ধরেছে। ঝিকরগাছায় স্থানীয় মানুষরা এসে ভিড় করছে। এদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে দেখছিলাম দলে দলে লোকেরা গ্রামের পথ দিয়ে মাঠ ভেঙে বাক্সপ্যাটরা, কাঁথা, লেপ নিয়ে ফিরে আসছে ঝিকরগাছায়। ছোটো শিশুরা আসছে কেউ গরু-ছাগলের দড়ি ধরে, কেউবা মুরগিকে বুকে জড়িয়ে ধরে। খালি গায়ে সকালের রোদ গায়ে মেখে। হাসতে হাসতে শিশুগুলো ধ্বনি তুলছে 'জয় বাংলা'। যে মেয়েরা পশ্চিম পাকিস্তানি সৈন্যদের দেখে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়াত মনপ্রাণ বাঁচাতে, তারাও কাঁধে ও হাতে সংসারের জিনিস নিয়ে ভারতীয় জওয়ানদের পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছেন। এ এক অদ্ভুত নিরাপত্তাবোধ ও নিশ্চয়তার আশ্বাস, যা না দেখলে বোঝা যায় না।"

৬ ডিসেম্বর যশোর মুক্ত হয়। মিত্রবাহিনী চৌগাছা দিয়ে প্রবেশ করে। চৌগাছায় ২০ থেকে ২২ নভেম্বর এবং ৪ ও ৫ ডিসেম্বর মিত্রবাহিনীর সঙ্গে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। এ যুদ্ধে হেরে গিয়ে পাকিস্তানি বাহিনী যশোর সেনানিবাস ফেলে পালিয়ে যায়। একদিকে স্বজন হারানোর বেদনা, অন্যদিকে বিজয়োল্লাসে জনতা ৬ ডিসেম্বর যশোর শহরে প্রবেশ করেন। বাংলাদেশের প্রথম মুক্ত জেলা যশোর।

লেখক: সিনিয়র সাংবাদিক

প্রবন্ধ

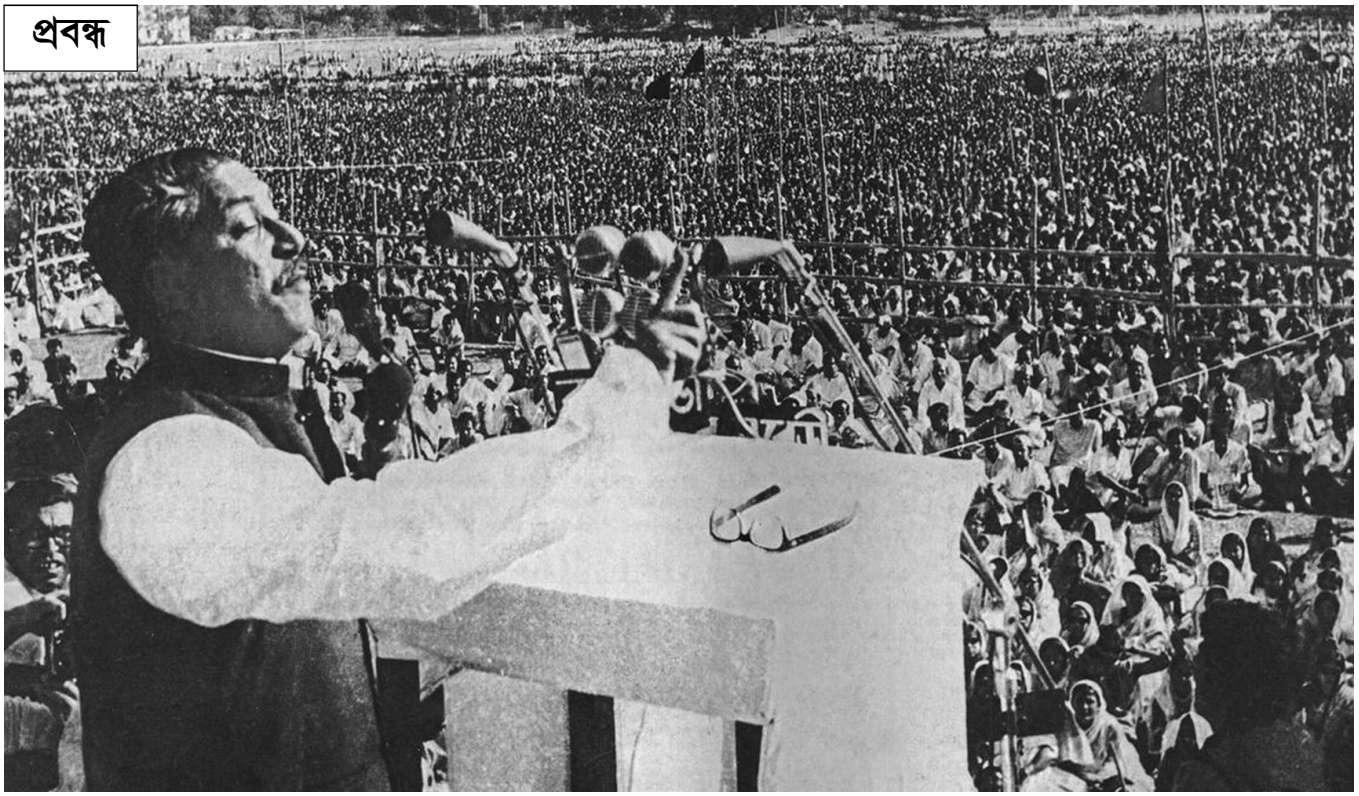

বঙ্গবন্ধু এবং একাত্তরে বাঙালির সাহসের বিজয়

■ সালাম জুবায়ের

একাত্তরে পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে বাঙালি জাতি যে বিজয় অর্জন করেছে, তা ছিল সত্যিকার অর্থে বাঙালির, তাবৎ বাঙালি জনগোষ্ঠীর সাহসের বিজয়। মুক্তিযুদ্ধে অকুতোভয় থাকা এবং বুকভরা সাহসই ছিল বাঙালির সবচেয়ে বড়ো অস্ত্র। বাঙালির এ সাহস দেশবিদেশে–সবখানে দৃশ্যমান হয়েছিল। আর এ সাহস বাঙালির মনে অঙ্কুরিত হয়েছিল এ ভূখণ্ডের সব শ্রেণি-পেশার গণমানুষের অবিসংবাদিত নেতা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কাছ থেকে। তখন তিনি ছিলেন বাংলাদেশের মানুষের প্রিয় নেতা, 'শেখ মুজিব'। বঙ্গবন্ধু বাঙালিকে সাহসের অনুপ্রেরণা দিয়েছিলেন, বাঙালির বুকে সাহস জাগিয়ে তুলেছিলেন। সেই সাহসে উজ্জীবিত হয়েই বাঙালি ঝাঁপিয়ে পড়েছিল পাকিস্তানিদের ওপর। বাঙালির মন ও মননে এমন সাহস সঞ্চার করার মধ্য দিয়ে মুক্তিযুদ্ধে বাঙালির বিজয়ের সাহস এবং বঙ্গবন্ধু একে অপরের পরিপূরক হয়ে উঠেছিলেন।

একাত্তরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন বাঙালি জাতির সাহসের প্রতীক এবং বাঙালি জাতি ছিল বঙ্গবন্ধুর সাহসের উৎস, সাহসের প্রবাহ। অন্যভাবে বলা যায়, বঙ্গবন্ধুর সাহসই বাঙালি জাতির সাহস। সাহসের ক্ষেত্রে জাতিগতভাবে আমাদের যা কিছু অর্জন, অবস্থান–এর সবই বঙ্গবন্ধুর হাত ধরে। তিনি ছিলেন অফুরন্ত সাহসের উৎস। বাঙালির বুকে কীভাবে আন্দোলন, সংগ্রাম, বিদ্রোহের সাহস সঞ্চার করতে হয়, তা বঙ্গবন্ধু ভালো করেই জানতেন।

মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের মানুষের বিজয়ের পর দীর্ঘ ৫২ বছর পেরিয়ে এসেছি আমরা। মহাকালের বিচারে এ ৫২ বছর বড়ো কোনো সময় হয়তো নয়। তবে খুব কম সময়, তাও নয়। এমন ৫২ বছরে পৃথিবীর অনেক দেশ স্বাধীনতা সংহতকরণ এবং জাতিগত উন্নয়নের অনেক সাফল্য দেখিয়েছে। সেই প্রেক্ষাপটে মুক্তিযুদ্ধে আমাদের বিজয়ের অনুপ্রেরণার উৎস এবং বিজয়ের মৌলিক বিষয়ে আরও পর্যালোচনা-বিশ্লেষণ প্রয়োজন। আর এ সময়ে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সবার মনে সবকিছুর ঊর্ধ্বে রাখতে আমরা কতটা এগিয়েছি, কতটা পিছিয়ে আছি, সে মূল্যায়নেরও সময় এখন আমাদের সামনে সমাগত।

আমাদের এ ভূখণ্ডের বাঙালির জীবনে একাত্তরের বিজয় একটি বড়ো অর্জন। এ অর্জনের জন্য বাঙালি অপেক্ষায় ছিল হাজার বছর ধরে। এই বাংলাদেশের প্রকৃতি ও মাটির সন্তান হয়েও বাঙালি হাজার বছরের কালপরিক্রমায় ছিল পরাধীন জাতি। নিজেকে নিজ শক্তিতে শাসন করার ক্ষমতা বাঙালি হাজার বছরেও অর্জন করতে পারেনি। হাজার বছরের পরাধীনতার পথের শেষ বিন্দুতে এসে বঙ্গবন্ধু দেশের স্বাধীনতা ও বিজয় বাঙালির হাতে তুলে দিয়েছিলেন। সেই গৌরবে বাঙালি পৃথিবীতে আজ গৌরবান্বিত এবং স্বাধীনতার গৌরবের অহংকার এখন বাঙালি অলংকার।

আমাদের আগামী প্রজন্মের জন্য এ বিজয়, এ গৌরবের ইতিবৃত্ত তুলে ধরতে একাত্তরের বিজয়, বিজয়ের প্রেক্ষাপট এবং বিজয়ের নায়ক বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে সুদূরপ্রসারী গবেষণা, বিশ্লেষণ, পর্যালোচনার গুরুত্ব অনেক। এক্ষেত্রে মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ের সময়ে আমাদের শক্তি ও সাহসের উৎস সম্পর্কে আরও গবেষণা-পর্যালোচনাকে অবহেলায় দূরে সরিয়ে রাখার সুযোগ নেই। বাঙালি জাতিকে স্বাধীনতার স্বাদ দিতে কীভাবে বঙ্গবন্ধু বাঙালির মনে এই সাহসের স্ফুরণ ঘটিয়েছিলেন, তা আরও গভীর অনুসন্ধানের মাধ্যমে সামনে নিয়ে আসা অতি আবশ্যক বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

যুদ্ধবিগ্রহ বা ইতিহাসের মোড় ঘুরিয়ে দেওয়া কোনো ঘটনার বিষয়ে আলোচনা, পর্যালোচনা, বিশ্লেষণ, গবেষণা সাধারণত সেই ঘটনার ৩০ বছর পর করা হয়। এ নিয়ম নানা কারণে মেনে চলা হয়। কারণ, যে যুগান্তকারী ঘটনা নিয়ে গবেষণা, মূল্যায়ন বা বিশ্লেষণ করা হয়, সেই ঘটনার প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ সুবিধাভোগীরা বা যারা সে ঘটনায় কৃতিত্বের অধিকারী বা যারা সে ঘটনার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছিলেন, তারা সবাই সেই ঘটনার প্রায় ৩০ বছর পর্যন্ত ক্ষমতায় থাকেন বা বেঁচে থাকেন। এরপর তাদের অবসরে যেতে হয় বা তারা মারা যান বলে ধরে নেওয়া হয়। অবসরে চলে যাওয়ার পর তারা আর ক্ষমতা দেখিয়ে কোনো মতামতকে প্রভাবিত করতে পারেন না বা মতামত তাদের বিপক্ষে গেলে তা নিয়ে কারও বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার অবস্থানে থাকেন না। ফলে সে ঘটনার প্রকৃত, সত্য, নিরপেক্ষ ও বস্তুনিষ্ঠ মূল্যায়ন, বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করা সম্ভব হয়। পৃথিবীর ইতিহাসে যুগান্তকারী অনেক ঘটনার পর এমনটা হওয়ার অনেক কাহিনি প্রচলিত আছে।

একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধে বাঙালির স্বাধীনতা অর্জনের আগের ঘটনাধারা এবং সেখানে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বের গৌরবের মহিমান্বিত ঘটনাগুলো আরেকটি কারণে প্রতিনিয়ত ব্যাপক আলোচনায় নিয়ে আসা প্রয়োজন। কারণটি হচ্ছে নতুন প্রজন্মকে জানানো। পঁচাত্তরে বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যার পর জন্মগ্রহণ করেছেন–এমন প্রজন্মের বয়স এখন প্রায় পঞ্চাশ ছুঁইছুঁই। তাঁরা এবং পরবর্তী প্রজন্মের মানুষই এখন দেশের জনসংখ্যার বেশির ভাগজুড়ে আছে। মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী প্রজন্মের অনেকেরই জীবন শুরুর কালে ছিল মুক্তিযুদ্ধবিরোধী শাসকদের অপশাসনে। সেই অপশাসকরা এ প্রজন্মের মানুষের মন ও মননে বঙ্গবন্ধুবিরোধী চিন্তাচেতনার উন্মেষ ঘটানোর চেষ্টা করেছে এবং কিছুটা সফলও হয়েছিল তারা। কারণ সেই সময়ে কেউই মুখ ফুটে বঙ্গবন্ধুর কথা বলতে পারতেন না, বঙ্গবন্ধুর আদর্শের কথা বলা তো অকল্পনীয় দূরের বিষয় হয়ে উঠেছিল। এভাবে দীর্ঘ একুশ বছর ধরে বঙ্গবন্ধুর কথা-কাহিনি না বলার কারণে তরুণ প্রজন্ম বঙ্গবন্ধুর কথা প্রায় ভুলেই যাচ্ছিল। ১৯৯৬ সালে বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা সরকার গঠনের পর সেই প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধ এবং বঙ্গবন্ধুর চেতনাধারায় ফিরিয়ে নিয়ে আসতে অনেক চেষ্টা, অনেক কসরত করতে হয়েছে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাসিক্ত মানুষকে। কিন্তু ২০০১ সালে আবার মুক্তিযুদ্ধ ও বঙ্গবন্ধুর চেতনাবিরোধী সরকার ক্ষমতায় আসার পর সেই প্রজন্মকে আবার বঙ্গবন্ধুবিরোধী চেতনায় অভিষিক্ত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়। ফলে পঁচাত্তর-পরবর্তী প্রজন্ম আবার মুক্তিযুদ্ধ ও বঙ্গবন্ধুকে জানার বিভ্রান্তিতে ভুল পথে হাঁটতে থাকে। এই প্রজন্ম থেকে পরবর্তী সব প্রজন্মকে চেতনার সঠিক পথে ফিরিয়ে আনতে মুক্তিযুদ্ধ ও বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে আরও গবেষণা এবং ইতিহাসের নানা অধ্যায় সম্পর্কে লেখালেখি অত্যন্ত প্রয়োজন। মুক্তিযুদ্ধের আরও তাত্ত্বিক ও যৌক্তিক বিশ্লেষণ নতুন প্রজন্মের সামনে তুলে ধরতে হবে, তাহলেই বিভ্রান্তি কাটবে।

মুক্তিযুদ্ধ ও বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে জানতে আমাদের ইতিহাসের সত্য পথ ধরে হাঁটতে হবে, ইতিহাসের অনেক অধ্যায় নতুন করে লিখতে হবে। রাজনৈতিক এবং গোষ্ঠী স্বার্থে প্রণীত ইতিহাস বিবেচনা করলে বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কিত প্রকৃত চিত্র পাওয়া যাবে না। পঁচাত্তর-পরবর্তী সময়ে দীর্ঘদিন এমনটাই হয়েছিল। এ পথ পরিত্যাগ করে মুক্তিযুদ্ধবিরোধী শক্তির বিভ্রান্তির গণ্ডি থেকে বেরিয়ে সত্যিকার চেতনার জগতে ফিরে আসতে হবে। তাকাতে হবে বঙ্গবন্ধুর দিকে। বঙ্গবন্ধুর জীবনাচরণ এবং যেভাবে তিনি গড়ে উঠেছিলেন রাজনীতির পথ বেয়ে, অনুসন্ধান করতে হবে সেই তথ্য। বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক আদর্শ এবং বাঙালি জনগোষ্ঠীকে নেতৃত্ব দিয়ে কীভাবে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন, তা বিশ্লেষণ করতে হবে।

ইতিহাসের পথে হাঁটতে গিয়ে আমরা দেখি, মুক্তিযুদ্ধ ও বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে এখনো অনেক কিছু বলার আছে, জানার আছে। অনেক কিছু নানাভাবে বিশ্লেষণ করে নতুন প্রজন্মের সামনে তুলে ধরার প্রয়োজন যেমন আছে, তেমনই এসব কাজের জন্য প্রচুর তথ্য-উপাত্তও ইতিহাসের বিভিন্ন অধ্যায়ে ছড়িয়ে আছে। এসব তথ্য-উপাত্ত তরুণ প্রজন্মের সামনে তুলে ধরার প্রচুর সুযোগ ও মাধ্যমও আমাদের হাতের নাগালে আছে। এখন প্রয়োজন আমাদের সদিচ্ছা ও অঙ্গীকার। আর একথা না বললেই নয় যে, সদিচ্ছা ও অঙ্গীকার ছাড়া বড়ো কোনো কাজই সফল ও সার্থকভাবে করা সম্ভব হয় না।

বঙ্গবন্ধু যে বাঙালি জাতিকে সাহসের সঙ্গে সংগ্রামের অগ্রযাত্রায় এগিয়ে নিয়ে গেছেন, সে সম্পর্কে ইতিহাস পাঠ থেকে অনেক তথ্য পাওয়া যায়। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন থেকে একাত্তরে পাকিস্তানি বাহিনীর ওপর নিরস্ত্র বাঙালির ঝাঁপিয়ে পড়ার ঘটনা–সবকিছুতেই বঙ্গবন্ধু ও বাঙালির সাহসের উদাহরণ ছড়িয়ে আছে।

সেই সত্তরের দশকের শুরুতে, আমাদের স্বাধীনতার প্রত্যক্ষ যুদ্ধ শুরুর সময়ে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীকে যুদ্ধবিদ্যায় পৃথিবীর একটি বড়ো শক্তি মনে করা হতো। এমন একটি পরাক্রমশালী বাহিনীকে স্বল্প প্রশিক্ষণ আর অনাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ করে পরাস্ত, অন্য অর্থে নাস্তানাবুদ করে প্রায় ৯৩ হাজার সদস্যের বিশাল সৈন্যবাহিনীকে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করা সহজ কোনো বিষয় ছিল না। কিন্তু বাঙালিরা নিজস্ব সাহসের তেজস্বীতে তা করে বিশ্বকে

দেখিয়েছেন যে, ইচ্ছা আর সাহস থাকলে অনেক অসম্ভবকে সম্ভব করা যায়। বাঙালির এ পারঙ্গমতা দেখানো সম্ভব হয়েছিল বঙ্গবন্ধু বাঙালির মনে অসীম সাহসের বীজ রোপণ করেছিলেন বলেই। বঙ্গবন্ধু তাঁর বজ্রকণ্ঠের আহ্বানের মধ্য দিয়ে বাঙালির মধ্যে এমন সাহস আর তেজস্বিতা রোপণ করেছিলেন।

আমরা প্রায়ই বলে থাকি, বাংলাদেশের স্বাধীনতা একদিনে আসেনি। কয়েকদিনের প্রস্তুতিতেই মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে, বিষয়টি এত সহজ নয়। মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপট তৈরি হয়েছিল দীর্ঘ ২৪ বছর ধরে। পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই শুরু হয়েছিল স্বাধীনতার প্রস্তুতিপর্ব। পাকিস্তান সৃষ্টির মধ্যেই নিহিত ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতার উপাদান। ভারত ভাগের পর সৃষ্ট পাকিস্তানের বিজাতীয় ও অপরিণামদর্শী শাসকরাই বাঙালি জাতিগোষ্ঠীর ওপর নির্যাতন করে, অর্থনৈতিক বৈষম্যের মাধ্যমে, বাংলাদেশ সৃষ্টির প্রেক্ষাপট তৈরিতে উপাদান জুগিয়েছে। বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানিদের এই নির্যাতন, বঞ্চনা ও বৈষম্যকেই প্রধান টার্গেট করেছিলেন বাঙালিদের স্বাধিকার ও আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার অর্জন ও জাতীয়তাবাদী হিসাবে জাগিয়ে তোলার ক্ষেত্রে। বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে একাত্তরে বাঙালি জাতি যেমন জেগে উঠেছিল, তেমনই ঐক্যবদ্ধও হয়েছিল।

বঙ্গবন্ধুর ব্যক্তিজীবনও ছিল সাহসে ভরপুর। ছাত্রজীবনে যখন তিনি তাঁর রাজনৈতিক গুরু হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন, তখন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে তাঁর সাহসের পরিচয় পাওয়া যায়। কোনো ধরনের ভয়ভীতি তাঁকে তাঁর আরাধ্য কাজ থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারেনি। তাঁর এ সাহসের গৌরব তিনি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বহন করে নিয়ে গেছেন। পঁচাত্তরের ১৫ আগস্ট ঘাতকরা যখন তাঁকে হত্যা করার জন্য সঙ্গিন উঁচিয়ে ধরে, তখনও তিনি তাঁর সাহস হারাননি। তিনি সাহসের জোরে বজ্রকণ্ঠে হত্যাকারীদের ভর্ৎসনা করেছেন, মৃত্যুর ভয়ে তাদের কাছে মিনতি করে কথা বলেননি, জীবনভিক্ষা চাননি। তিনি সাহস দেখিয়ে নেতৃত্বের মহান মর্যাদা আর সম্মানকে সবকিছুর ঊর্ধ্বে তুলে ধরেছেন। বাঙালি জাতি তাঁর এ সাহসে গৌরববোধ করতে পারে–আমাদের জাতির পিতা সাহসের সঙ্গে যেমন নেতৃত্ব দিয়েছেন, তেমনই দেশদ্রোহী ও কাপুরুষের কাছে মাথা নত করেননি।

এর আগের পাকিস্তানি আমলে রাজনীতি, অর্থনীতি এবং সামাজিক বৈষম্যের ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধুর যে প্রতিবাদী অবস্থান–সেই ইতিহাসের দিকে তাকালে আমরা দেখি, ইতিহাসের পরতে পরতে বঙ্গবন্ধুর সাহসের উদাহরণ ছড়িয়ে আছে। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন, বাষট্টির শিক্ষা কমিশনবিরোধী আন্দোলন, পঁয়ষট্টির ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ, ছেষট্টির ছয় দফা দাবি ঘোষণা, উনসত্তরের গণ-আন্দোলন, সত্তরের জাতীয় নির্বাচন, একাত্তরের অসহযোগ আন্দোলন এবং স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নে পাকিস্তানের সামরিক শাসকদের সঙ্গে আলোচনায় আপসহীন অবস্থান গ্রহণ–ইতিহাসের যুগসৃষ্টিকারী এসব ঘটনার প্রতিটি অধ্যায়ে বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক কৌশল এবং অকুতোভয় নেতৃত্বের সাফল্য–সবকিছুতেই বঙ্গবন্ধুর অপরিমেয় সাহসের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। এসব ক্ষেত্রে যে দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন বঙ্গবন্ধু, তা বাঙালি জনগোষ্ঠীর জাতীয়তাবাদী, স্বায়ত্তশাসন, স্বাধিকার, স্বাধীনতা আন্দোলনে সাহসের জোগান দিয়েছে।

একইভাবে সাহসের গৌরব তিনি বাঙালি জাতিকে উপহার দিয়েছেন একাত্তরের ২৬শে মার্চে পাকিস্তান বাহিনীর গণহত্যা শুরুর পরমুহূর্তে বাংলাদেশে স্বাধীনতা ঘোষণা করে। তিনি জানতেন, পাকিস্তানের অস্তিত্বে এমন কুঠারাঘাতে তাঁর নিশ্চিত মৃত্যুর সম্ভাবনা প্রবল। তারপরও তিনি পিছপা হননি। করুণ মৃত্যুর আশঙ্কায় জাতির প্রতি দায়িত্ব পালনে তিনি অবহেলা করেননি। এখানেই বঙ্গবন্ধুর জীবনের মহত্ত্ব।

ইতিহাসের এসব অধ্যায়ে একদিকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সপ্রাণ তেজস্বী নেতৃত্ব, অন্যদিকে বাংলাদেশের সংগ্রামী জনগোষ্ঠী এবং তাদের অকুতোভয় সংগ্রাম ও দাবি আদায়ে অনমনীয় চেতনা–এসবকিছু নিয়েই আমাদের স্বাধীনতাসংগ্রাম-যুদ্ধ এগিয়েছে পরিণতির দিকে। এক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধু ছিলেন এক সাহসী নেতৃত্বের প্রতীক।

পাকিস্তান অর্জনের আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার মধ্য দিয়ে সেই সময়ের ছাত্রনেতা শেখ মুজিবের মধ্যে ইতিবাচক রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও আকাঙ্ক্ষা জন্ম নিয়েছিল, যা তাঁকে রাজনীতিক হিসাবে অভিজ্ঞ, সাহসী ও আপসহীন ব্যক্তিত্বে পরিণত করেছিল। এর ফলে তিনি বাঙালি জাতিকে অত্যন্ত সাহসের সঙ্গে নেতৃত্ব দেওয়ার মতো সক্ষমতা অর্জন করেছিলেন। এর প্রমাণ তিনি দিয়েছেন তাঁর জীবনের পরবর্তী অধ্যায়ে পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে সফল রাজনৈতিক আন্দোলন গড়ে তোলা এবং সেই আন্দোলনকে সফল পরিণতির দিকে নিয়ে যাওয়ার মধ্য দিয়ে অর্থাৎ বাংলাদেশকে স্বাধীনতা এনে দেওয়ার মাধ্যমে। এখানে বঙ্গবন্ধু অনন্য, যেমন বাঙালি জাতির কাছে, তেমনই বিশ্বপরিসরে।

প্রজ্ঞাবান রাজনীতিক হিসাবে সাতচল্লিশে অর্জিত স্বাধীন পাকিস্তান হতাশ করেছিল শেখ মুজিবুর রহমানকে। প্রথমত, পাকিস্তানে যোগ্য সম্মান পায়নি বাঙালি জনগোষ্ঠী। দ্বিতীয়ত, পাকিস্তানের জনসংখ্যার সংখ্যাগুরু হওয়া সত্ত্বেও ভাষার অধিকারের ক্ষেত্রে চরমভাবে বঞ্চিত করা হয় বাঙালিদের। আন্দোলন-সংগ্রাম করে পাকিস্তান অর্জনের কিছুদিনের মধ্যেই, বিশেষ করে বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে পাকিস্তানি শাসকদের বৈষম্যমূলক আচরণের আভাস পাওয়ার পর থেকেই বঙ্গবন্ধু তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় অনুভব করলেন, সাধের পাকিস্তান বাঙালি জাতিকে চরম বঞ্চনা, না পাওয়ার আক্ষেপ ও হতাশার মধ্যে নিক্ষেপ করেছে।

শেখ মুজিবুর রহমান এ সময় চিন্তা করতেন যে, এমন বৈষম্যের পাকিস্তান তো বাঙালিরা চায়নি। এই পাকিস্তানে বাঙালিরা তাঁদের আর্থসামাজিক-রাজনৈতিক অধিকার তো পাবেই না, এর চেয়ে বেশি যে ক্ষতি বাঙালি জাতির হবে, তা হচ্ছে নিজের মাতৃভাষায় কথা বলতে না পারা। এসব মৌলিক অধিকারের যৌক্তিক বিষয় তখন তুখোড় রাজনীতিক বঙ্গবন্ধুকে ভাবিয়ে তোলে। এ ভাবনার মধ্যেই জন্ম নেয় নতুন চেতনা–বাংলাদেশের (তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের) স্বায়ত্তশাসন ছাড়া বাঙালি জাতিগোষ্ঠীর সামাজিক-অর্থনৈতিক কোনো উন্নতি আশা করা যায় না। এ ভাবনা উদ্রেক হওয়ার পরপরই বঙ্গবন্ধু এসব সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে অটল সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেন। সে সিদ্ধান্ত হলো বাঙালিদের জীবনমান উন্নয়নের জন্য পাকিস্তানিদের কাছ থেকে পূর্ব পাকিস্তানের (বাংলাদেশের) স্বায়ত্তশাসন ছিনিয়ে আনতে হবে।

বাঙালিদের দাবিদাওয়ার ব্যাপারে পাকিস্তানিদের উদাসীনতা এবং বৈষম্য ও বঞ্চনা থেকেই তিনি উপলব্ধি করেন, এই পাকিস্তানে আন্দোলন ছাড়া বাঙালিদের পূর্ণ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার অর্জন করা যাবে না। আর এ বঞ্চনা থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষাই শেখ মুজিবুর রহমানের মধ্যে সাহসের জন্ম দিয়েছিল। যে সাহসের ওপর দাঁড়িয়ে পুরো পাকিস্তানকে নাড়িয়ে দিয়েছিলেন শেখ মুজিব এবং অন্যায়, বৈষম্য, বঞ্চনার বিরুদ্ধে চরম প্রত্যয় নিয়ে জাগিয়ে তুলেছিলেন বাঙালি জাতিকে।

চুয়ান্নর নির্বাচনের পর বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের কাছ থেকে স্বায়ত্তশাসন আদায়ের পরিকল্পনা তৈরি করতে থাকেন। এর প্রস্তুতিও নিতে শুরু করেন। এর পরিণতি দাঁড়ায় ঐতিহাসিক ছয় দফা দাবিনামা প্রণয়ন এবং পাকিস্তানি সরকারের কাছে তা উত্থাপন। '৫৪ সালের ঐতিহাসিক নির্বাচন, যা ইতিহাসে যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন হিসাবে খ্যাত, নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করে। সেখানেও অত্যন্ত সাহসের সঙ্গে পরিস্থিতি নিজের অনুকূলে নিয়ে আসতে সক্ষম হন বঙ্গবন্ধু। তরুণ শেখ মুজিব তখন সময়োপযোগী, সঠিক ও সাহসী নেতৃত্ব দিয়ে অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা পালন করেছিলেন।

১৯৫৩ সালের শেষদিকে শেখ মুজিবুর রহমান আওয়ামী মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়ে রাজনীতিতে অত্যন্ত দৃঢ় অবস্থান তৈরি করতে সক্ষম হন। এ অবস্থান তাঁকে রাজনীতিতে আরও বড়ো ধরনের ইতিহাস গড়ার সাহস ও সুযোগ করে দেয়, যা তিনি রাজনীতির পরবর্তী ধাপে কাজে লাগিয়েছেন।

বঙ্গবন্ধু যখন পাকিস্তানের কাছে ছয় দফা দাবিনামা উত্থাপন করেন, তখন অনেকেই তাঁর রাজনৈতিক সাহসের তারিফ করেছেন। এর কারণ বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, বঙ্গবন্ধু ঠিক যে সময়ে বাংলাদেশের বাঁচা-মরার প্রশ্নে কোনো আপস না করেই ছয় দফা প্রণয়ন করেছিলেন, তা ছিল সত্যিকার অর্থেই একটি সাহসী উদ্যোগ। তখন দেশের অধিকাংশ রাজনৈতিক দলের মধ্যে ছিল পাকিস্তানি শাসকদের ভয়ে ভীতিকর পরিস্থিতি। কথায় কথায় পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক নেতাদের জেলে ঢোকানো তখন ছিল ডালভাতের মতো। তখন পূর্ব পাকিস্তানকে স্বায়ত্তশাসন দেওয়ার দাবি তুলে বঙ্গবন্ধু আসলে মৌচাকে ঢিল ছুড়েছেন। এক অর্থে পূর্ব পাকিস্তানে বিজাতীয় পাকিস্তানি শাসকদের শাসনকে চ্যালেঞ্জ করা খুব একটা সহজ বিষয় ছিল না তখন। এর পরিণতি অসম্ভব খারাপ এবং মারাত্মক হতে পারে–এমনটাই সবাই ধরে নিয়েছিলেন। কিন্তু এমন চরম ঝুঁকিকে বঙ্গবন্ধু গায়েই মাখেননি, ভয় পাওয়া তো দূরের কথা।

এক্ষেত্রে আরেকটি বিষয় উল্লেখ করতে হয়। তা হলো, ছয় দফায় আসলে কী কথা বলা হয়েছে, তা জানা দরকার। রাজনীতি বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, ছয় দফা আসলে বাংলাদেশের স্বাধীনতা নিয়ে পূর্বপরিকল্পনার চিন্তা থেকে উত্থাপন করা কয়েকটি দাবি। ছয় দফা যদি পাকিস্তান সরকার মেনে নিত তবে স্বাধীনতার দিকেই এগিয়ে যাওয়া হতো। কিন্তু পাকিস্তান সরকার তখন এতটা সহজসরল ছিল না যে, তারা নিজের মাথায় কুড়াল মারবে। এসব বিবেচনায় নিয়ে ছয় দফা উত্থাপনের বিষয়টি চিন্তা করলে বলতেই হয়, বঙ্গবন্ধু অসীম সাহসের আধার ছিলেন বলেই মৃত্যুভয় তুচ্ছ করে তিনি ছয় দফা প্রণয়ন করেছিলেন। ছয় দফার মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধু পাকিস্তান কীভাবে পরিচালিত হবে, এর একটি নীতিমালা তুলে ধরেছিলেন। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে থাকবে শুধু দেশরক্ষা ও পররাষ্ট্র বিষয় দেখাশোনা করা। এ দুটি বিষয় ছাড়া একটি দেশের জন্য যত ধরনের নীতি-আইন প্রয়োজন, এর সবই করবে প্রাদেশিক সরকার। প্রদেশের মুদ্রাও আলাদা থাকবে। এতে বাংলাদেশ পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন পেয়ে যেত। অর্থাৎ বাঙালিরা নিজেরা নিজেদের শাসন এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন করার সব সুযোগ পেয়ে যেত। ছয় দফা পাঠ করলে যে কেউ বুঝতে পারবেন যে, দাবিগুলো অত্যন্ত সুচিন্তিতভাবেই প্রণয়ন করা হয়েছিল। ষাটের দশকের মধ্যভাগে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে এভাবে স্বায়ত্তশাসনের দাবি তুলে ধরা কতটা রাজনৈতিক সাহসের বিষয় হতে পারে, তা সেই সময়কে বিশ্লেষণ করতে না পারলে সঠিকভাবে অনুধাবন করা সম্ভব নয়।

এখন ভাবলে অবাক হতে হয়, বঙ্গবন্ধু কতটা দূরদর্শী ছিলেন যে, ছয়দফা দাবি ঘোষণার মাত্র পাঁচ বছরের মাথায় বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশকে স্বাধীন করার শেষ প্রান্তে এসে পৌঁছে যান। দেশে দেশে যুদ্ধ করে স্বাধীনতা অর্জনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে একে একটি বিরল ঘটনাই মনে হয়। আর সে ঘটনার গৌরব এখন আমরা সবাই বহন করে চলেছি।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য বঙ্গবন্ধু কবে থেকে কীভাবে পরিকল্পনা করেছিলেন, সে ইতিহাসের দিকে তাকালে আমরা দেখি, বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের পর থেকে বঙ্গবন্ধুর মনে স্বাধীনতার বীজ রোপিত হয়েছিল। দিনদিন সেই বীজ বর্ধিত হয়ে একসময় মহিরুহে পরিণত হয়েছে। আমরা আগেই জেনেছি, চুয়ান্নর যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনের আগে বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানিদের কাছ থেকে স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনার চিন্তা শুরু করেছিলেন অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে। এজন্য প্রয়োজনে সশস্ত্র সংগ্রাম করারও চিন্তা তাঁর মনে জেগে উঠেছিল। তাঁর এমন চিন্তার বহিঃপ্রকাশ ঘটে ১৯৬২ সালে, যখন তিনি সশস্ত্র যুদ্ধে বাংলাদেশকে সহযোগিতার জন্য ভারত সরকারের সাহায্য চাইতে অত্যন্ত গোপনে কুমিল্লাসংলগ্ন ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য ত্রিপুরায় গিয়েছিলেন। কিন্তু আঞ্চলিক রাজনীতির মারপ্যাঁচের কারণে ভারত সরকার বঙ্গবন্ধুকে সশস্ত্র সহযোগিতা করতে অপারগতা জানিয়ে ফিরিয়ে দিয়েছিল। এর পরের ইতিহাস তো অত্যন্ত করুণ। পাকিস্তান সরকার বঙ্গবন্ধুর সেই উদ্যোগের খবর পেয়ে যায় এবং একপর্যায়ে বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দেয়। তবে এ কথাও অত্যন্ত সত্য যে, এ আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলাই পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের মানুষকে আরও প্রতিবাদী ও সংগ্রামী চেতনায় সমৃদ্ধ করে।

বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য সর্বশেষ যে উদ্যোগ নিয়ে বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন তা হলো, একাত্তরের মার্চে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলন গড়ে তোলা। সারা বিশ্ব সেই অসহযোগ আন্দোলনের সময় চিন্তা করেছিলেন যে, পাকিস্তানের মৃত্যু আর কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। হয়েছিলও তাই। সেই মার্চেই বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের কবর রচনার সব আয়োজন সম্পন্ন করেছিলেন। এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে একাত্তরের ৭ মার্চের বঙ্গবন্ধুর ভাষণের কথা। বঙ্গবন্ধু হয়তো তাঁর দূরদর্শিতা দিয়ে বুঝতে পেরেছিলেন, এ জনসভার পর তিনি বাঙালি জনগোষ্ঠীকে আর কোনো নির্দেশনা দেওয়ার সময় নাও পেতে পারেন, এর আগেই পাকিস্তানিদের হাতে তাঁর জীবন যেতে পারে। এ দূরদর্শিতা তাঁর মধ্যে হয়তো কাজ করেছিল বলেই একাত্তরের ঐতিহাসিক ৭ মার্চে বঙ্গবন্ধু রেসকোর্স মাঠে লাখো বাঙালির সামনে বজ্রকণ্ঠে উচ্চারণ করেছিলেন, 'যার যা আছে, তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে।' তিনি এও বলে দিয়েছিলেন, তিনি যদি হুকুম নাও দিতে পারেন, তবুও যেন সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া হয়। শেষ বাক্যে বঙ্গবন্ধু বাঙালি জাতিকে শেষ কথা বলে দিয়েছিলেন, 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' এরপর স্বাধীনতার ঘোষণা এবং বাঙালিকে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার নির্দেশ দেওয়ার আর কী বাকি থাকল।

এসব বিষয় আমাদের গভীর অনুসন্ধিৎসু মনোভাব নিয়ে বিশ্লেষণ করতে হবে। তবেই আমরা অনুভব করতে পারব বঙ্গবন্ধু কতটা সাহসী ছিলেন, কতটা সাহসের সঙ্গে তিনি নিজের জীবনকে তুচ্ছ করে বাঙালিকে স্বাধীনতার দিকে এগিয়ে নিয়েছিলেন।

লেখক: সিনিয়র সাংবাদিক

প্রবন্ধ

স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সংবাদপত্র দৈনিক আজাদী

■ রাশেদ রউফ

'গণমাধ্যম' সাম্প্রতিক কালে বাংলাদেশে বহুলপ্রচলিত একটি শব্দ। ইংরেজি 'মিডিয়া' কথাটি আমাদের পূর্বপরিচিত। একসময় সংবাদপত্রই ছিল গণযোগাযোগের মাধ্যম। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির কল্যাণে এখন আর 'প্রিন্ট মিডিয়া' বা কাগজে ছাপা সংবাদপত্রই গণযোগাযোগের মাধ্যম নয়। সংবাদপত্র, রেডিয়ো, টেলিভিশন, ইন্টারনেট এমনকি কোটি কোটি মানুষের দৈনন্দিন ব্যবহৃত হাতের মোবাইল ফোনটিও এখন গণযোগাযোগের মাধ্যম হয়ে দাঁড়িয়েছে। অবশ্য তথ্যপ্রযুক্তি আবিষ্কারের আগে সিনেমা এবং তথ্যচিত্রও অংশত গণমাধ্যম হয়ে উঠেছিল। তবে সিনেমা ছিল মূলত বিনোদনের মাধ্যম। এজন্য পাশ্চাত্যের মতো আমাদের দেশেও সাংবাদিকতা শিক্ষার প্রচলিত ধারার পরিবর্তন হয়।

গণমাধ্যমের এই সম্প্রসারিত ব্যবস্থা একদিকে যেমন সবার জন্য তথ্যভান্ডার উন্মুক্ত করে দিয়েছে, অন্যদিকে সেই সুবাদে তথ্য জানাকে একটি মৌলিক অধিকারে পরিণত করেছে। উন্নত অনেক দেশের মতো বাংলাদেশেও প্রণীত হয়েছে 'তথ্য অধিকার আইন'। তথ্য অধিকার এখন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অপরিহার্য অনুষঙ্গ। আরও একটি মৌলিক পরিবর্তনও কারও দৃষ্টি এড়ায় না। অতীতে প্রিন্ট মিডিয়া বা সংবাদপত্রের আদি যুগে সংবাদপত্র বা গণমাধ্যম শিল্প ছিল না। বর্তমানে তা শিল্প হয়ে উঠেছে। সেই শিল্প-ভুবনে অনন্য নাম 'দৈনিক আজাদী'। পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শোষণ, স্বৈরাচারী নিপীড়ন, আক্রমণ এবং এই শোষণ-শাসন ও অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-প্রতিরোধের সংঘাতময় বাস্তবতার মধ্যে আজাদীর জন্ম।

দৈনিক আজাদী স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সংবাদপত্র। ঢাকা থেকে দৈনিক ইত্তেফাকসহ কয়েকটি পত্রিকা ১৭ ডিসেম্বর প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু আজাদীর জন্ম বাংলাদেশের জন্মের ১১ বছর ৩ মাস ১১ দিন আগে, অর্থাৎ ১৯৬০ সালের ৫ সেপ্টেম্বর। এখানে উল্লেখ করা জরুরি যে, ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশের বিজয় লাভের পর ১৭ ডিসেম্বর সকালে প্রকাশিত হয় দৈনিক আজাদী।

আজাদী চট্টগ্রামের মাটি ও মানুষের সংবাদপত্র। সুদীর্ঘ সময় ধরে অবহেলিত চট্টগ্রামের দুঃখ-হাহাকার-সংকট আর সম্ভাবনার কথা তুলে ধরতে ধরতে এটি পরিণত হয়েছে এই অঞ্চলের মানুষের ভালোবাসার মুখপত্রে। চট্টগ্রামের জনমানুষের কথা বলার জন্য, সর্বোপরি বঞ্চিত ও অবহেলিত জনপদের উন্নয়নে ভূমিকা রাখার লক্ষ্য নিয়ে ৬৪ বছর আগে যাত্রা শুরু করেছিল দৈনিক আজাদী। আজাদী আজ শুধু একটি সংবাদপত্রই নয়, এটি এখন চট্টগ্রামের আয়না হিসাবেও স্বীকৃতি অর্জন করেছে।

২০২৩ সালের ৫ সেপ্টেম্বর আজাদী পূর্ণ করেছে প্রতিষ্ঠার ৬৩ বছর। এটি বাংলাদেশের সংবাদপত্রের ইতিহাসে একটি মাইলফলক। সবদিক দিয়ে অনিশ্চয়তার এ যুগে একটি পত্রিকার ৬৪ বছরে পদার্পণ রীতিমতো ঈর্ষণীয় ব্যাপার। আমরা মনে করি, এ সাফল্য শুধু আজাদীর নয়, যাঁরা মিডিয়ার সঙ্গে যুক্ত আছেন, পেশাজীবী সাংবাদিক এবং যাঁরা পত্রিকার পাঠক–এ সাফল্য তাঁদের সবার। এত বছর ধরে টিকে থাকার মাধ্যমে প্রতীয়মান হয়, এ পত্রিকার সঙ্গে মানুষের সম্পৃক্ততা রয়েছে, দেশের স্বার্থের সংশ্লিষ্টতা আছে।

আজাদীর প্রতিষ্ঠাতা মোহাম্মদ আবদুল খালেক হলেন বৃহত্তর চট্টগ্রামের প্রথম মুসলমান ইঞ্জিনিয়ার। যিনি নিজের উজ্জ্বল পেশা ছেড়ে লাইব্রেরি, প্রেস ও পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন এই জনপদের পশ্চাৎপদ মুসলিম সমাজকে শিক্ষার মাধ্যমে এগিয়ে নিতে। ইঞ্জিনিয়ার আবদুল খালেকের কর্মজীবন শুরু হওয়ার কথা ছিল শিবপুরেই। তড়িৎ প্রকৌশলী হিসাবে সেখানে খুব লোভনীয় বেতনে তাঁর চাকরি হয়েছিল। কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করেননি। মা ও মাতৃভূমির টানে তিনি ফিরে এসেছিলেন দেশেই। অবশেষে ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দে তিনি চট্টগ্রাম ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানিতে চাকরি নেন। চাকরিজীবনের প্রথম থেকেই তিনি নিষ্ঠা ও সততার পরিচয় দিতে শুরু করেন। শ্রম ও মেধার সমন্বয় ঘটিয়ে তিনি কর্মক্ষেত্রকে পবিত্র করে তোলেন। সহযোগী তড়িৎ প্রকৌশলী থেকে তিনি কবছরে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী হয়ে যান। পরে কর্তৃপক্ষ তাঁকে প্রধান প্রকৌশলীর পদ দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি বেশি দিন চাকরি করেননি। মূলত ১৯২৯ খ্রিষ্টাব্দ থেকেই তিনি চাকরির প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন। কর্তৃপক্ষ প্রথমে বিশ্বাস করেননি যে তিনি চাকরি ছেড়ে দেবেন। তাই আর্থিক সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধিসহ তাঁকে আরও বড়ো পদ দিতে চাইলেন। কিন্তু না, ইঞ্জিনিয়ার আবদুল খালেক তাঁর সিদ্ধান্ত থেকে পিছু হটলেন না। তিনি সাহিত্য, সংস্কৃতি ও পরহিতব্রতে নিজেকে অধিকতর জড়িয়ে রাখার মানসে ১৯৩২ খ্রিষ্টাব্দে চাকরি থেকে ইস্তফা দেন। চাকরিতে থাকাবস্থায় ইঞ্জিনিয়ার খালেক ১৯২৯ খ্রিষ্টাব্দে কোহিনুর লাইব্রেরি এবং ১৯৩০ খ্রিষ্টাব্দে কোহিনুর ইলেকট্রিক প্রেস প্রতিষ্ঠা করেন। শিল্পী-সাহিত্যিকদের লেখা প্রকাশনায় তিনি যথেষ্ট সহযোগিতা করতেন, অনুপ্রেরণা জোগাতেন। মননশীল সাহিত্য সংকলন প্রকাশের ক্ষেত্রেও তাঁর কোহিনুর প্রেস ছিল উল্লেখযোগ্য। অন্নদাশঙ্কর রায়, আশুতোষ চৌধুরী, ড. মুহাম্মদ এনামুল হকের মতো লেখকদের লেখায় সমৃদ্ধ সাহিত্য সংকলন 'পূরবী' ছাপানো হতো কোহিনুর প্রেস থেকেই। বলতে গেলে ইস্টার্ন এক্সামিনার, ইউনিটি ও ইনসাফ অবাঙালিদের এই তিনটি পত্রিকা ছাড়া চট্টগ্রামের প্রায় সব পত্রপত্রিকাই তাঁর কাছে ঋণী। তাঁর পরিচালিত কোহিনুর ইলেকট্রিক প্রেস থেকে ছাপা হয়েছিল একুশের প্রথম কবিতা 'কাঁদতে আসিনি, ফাঁসির দাবি নিয়ে এসেছি'–কী অসাধারণ সাহস থাকলে বাঙালিবিদ্বেষী পাকিস্তান সরকারের হিংস্রতার সময় একটি প্রেস এমন সাহসী ভূমিকা নিতে পারে।

মাহবুব উল আলম চৌধুরীর এ অমর কবিতাটি মুদ্রণের ভার পড়ে খোন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াসের ওপর। সিদ্ধান্ত হয় সারা রাত প্রেসে কাজ চালিয়ে পরদিন সকালের মধ্যে গোপনে প্রকাশ করতে হবে অমর একুশের প্রথম সাহিত্য সৃষ্টি, প্রথম সাহিত্য সংকলন। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ভাষা আন্দোলনের শহিদের রক্ত সবার মনে যে গভীর রেখাপাত করেছিল, তারই প্রতিক্রিয়া হিসাবে ম্যানেজার, কম্পোজিটর ও মেশিনম্যানের সুপ্ত ক্রোধটাকে বাস্তবরূপে প্রকাশ করেছে মনেপ্রাণে বিদ্রোহ ঘোষণার মাধ্যমে এই 'কাঁদতে আসিনি, ফাঁসির দাবি নিয়ে এসেছি' পুস্তিকাটি, তদানীন্তন পাকিস্তান সরকারকে ভাষা আন্দোলনে চ্যালেঞ্জ করে রাতারাতি ছাপিয়ে প্রকাশ করে। সেসময়কার নুরুল আমীন সরকার বাংলা ভাষার বিরোধিতায় এতই তৎপর ছিলেন যে, ভাষার ব্যাপারে বিরোধী কোনো সূত্র পেলেই জেলহাজতে ঢোকাত। এমনই একসময়ে একা চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করা কী রকম দুঃসাধ্য ব্যাপার ছিল, সেই সময়কার পরিবেশই তার সাক্ষ্য দেয়। সেসময়ে কোহিনুর ইলেকট্রিক প্রেসের সমতুল্য কোনো প্রেস ছিল না। কত ত্যাগ কোহিনুর ইলেকট্রিক প্রেসের শ্রমিক-কর্মচারীরা স্বীকার করেছেন, তা সত্যিকার অর্থেই এখন ইতিহাস। সেসময়ে যদি কোহিনুর ইলেকট্রিক প্রেসের কর্ণধার ইঞ্জিনিয়ার আবদুল খালেক ও প্রেসের শ্রমিক-কর্মচারীরা সাহসী ভূমিকা না নিতেন, তাহলে একুশের প্রথম কবিতা ছাপা হতো কি না, তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ রয়েছে।

বায়ান্নর ২২ ফেব্রুয়ারি রাতেই কোহিনুর ইলেকট্রিক প্রেসে শুরু হয়ে যায় কবিতাটি প্রকাশের কার্যক্রম। গভীর রাতে কম্পোজ ও প্রুফের কাজ যখন সমাপ্তপ্রায়, তখন পাকিস্তান সরকারের গোয়েন্দা বাহিনী হঠাৎ হামলা শুরু করে প্রেসে। কিন্তু প্রেস কর্মচারীরা অতীব দ্রুততায় সম্পূর্ণ কম্পোজ ম্যাটার এমনভাবে লুকিয়ে ফেলে যে, তন্ন তন্ন করে খোঁজাখুঁজির পরও পুলিশ তার খোঁজ পায়নি। ফলে 'কাঁদতে আসিনি, ফাঁসির দাবি নিয়ে এসেছি'র প্রকাশনার কাজ শেষ করা যায়। পরদিন ২৩ ফেব্রুয়ারি লালদীঘির প্রতিবাদসভায় কবিতাটি পাঠের সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপক সাড়া পড়ে যায়। পাকিস্তান সরকার কবিতাটি নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। আবদুল খালেক ইঞ্জিনিয়ারকে গ্রেফতার করতে এলে প্রেস ম্যানেজার দবির আহমদ চৌধুরী নিজ কাঁধে ছাপার দায়িত্ব তুলে নেন। তাই গ্রেফতার করা হয় প্রেস ম্যানেজার দবিরকে। অবশ্য পরে তাঁকে জামিন দেওয়া হয়েছিল।

ভাষা ও দেশমাতৃকার সেবায় নিবেদিত ব্যক্তিত্ব আবদুল খালেক ইঞ্জিনিয়ার পরবর্তী সময়ে সেই কোহিনুর প্রেস থেকে আজাদী প্রকাশে ব্রত হন। এর আগে অবশ্য তিনি কোহিনুর নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন। সেই কোহিনুর পত্রিকাটি মহান ভাষা আন্দোলনে অনন্য ভূমিকা পালন করে। আজাদী প্রকাশের দুই বছরের মাথায় ২৫ সেপ্টেম্বর ১৯৬২ সালে তিনি ইন্তেকাল করেন। এ সময় অধ্যাপক মোহাম্মদ খালেদ সম্পাদক হিসাবে দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে আমৃত্যু কাজ করে যান।

সংবাদপত্রের মতপ্রকাশের স্বাধীনতার প্রশ্নে আজাদী সব সময় আপসহীন ভূমিকা পালন করে এসেছে। সাংবাদিক সাধন কুমার ধর তাঁর এক প্রবন্ধে বলেন, ১৯৬৬ খ্রিষ্টাব্দের ১৬ জুন আইয়ুবি শাসনামলে প্রাদেশিক গভর্নর আবদুল মোনায়েম খান যখন দৈনিক ইত্তেফাকের কণ্ঠ চেপে ধরেন এবং তার প্রকাশনা বন্ধ করে দেন, তখন সমগ্র পূর্ববাংলার পেশাদার সাংবাদিকরা এর তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে সাংবাদিক ইউনিয়নের ডাকে একদিন পূর্ণ ধর্মঘট পালন করেন। ফলে পরদিন তৎকালীন এই প্রদেশের কোথাও কোনো সংবাদপত্র বের হয়নি। কিন্তু এ সত্যকে মিথ্যা প্রমাণের জন্য প্রাদেশিক গভর্নরের নির্দেশে বিভিন্ন পত্রিকা বিলম্বে সীমিত আকারে প্রকাশ করে। কিন্তু চট্টগ্রামে আজাদী এবং ঢাকায় দৈনিক সংবাদই কেবল গভর্নরের সেই ইচ্ছা পূরণে এগিয়ে আসেনি। এ কারণে

এ দুটি পত্রিকাকে তৎকালীন সরকার পুরো একটি বছর কালো তালিকাভুক্ত করে রাখে এবং সরকারি বিজ্ঞাপন থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত রাখে।

ঐতিহাসিক ছয় দফা আন্দোলনেও এ পত্রিকার ভূমিকা নিঃসন্দেহে কৃতিত্বের দাবিদার। তৎকালীন প্রাদেশিক সরকার ছয় দফা আন্দোলনের বিরুদ্ধে তাদের প্রচারাভিযানের অংশ হিসাবে সব দৈনিকে কিছু প্রবন্ধ সরবরাহ করে তা প্রকাশ করতে তাদের বাধ্য করে। দৈনিক আজাদী তা প্রকাশ করেও পরদিন এর জবাবে বলিষ্ঠ যুক্তির অবতারণা করে পালটা প্রবন্ধ ছাপে। তাই সরকারি গোয়েন্দা রিপোর্টে আজাদী সম্পর্কে বলা হয়, 'A Bengali daily from Chittagong having leaning towards opposition'.

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা, উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান ও একাত্তরের মুক্তিসংগ্রামে দৈনিক আজাদী প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক শক্তির পক্ষেই বলিষ্ঠ ভূমিকা নেয়। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের শুরুতে দেশ হানাদার পাকিস্তানি বাহিনীর দখলে চলে গেলে দৈনিক আজাদীর প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়। পত্রিকার সম্পাদক নির্বাচিত সংসদ সদস্য অধ্যাপক মোহাম্মদ খালেদসহ কয়েকজন সাংবাদিককে মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে দেশ ত্যাগ করতে হয়। তাঁরা স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় অংশ নেন। আজাদীর অন্য যেসব সাংবাদিক ও সংবাদকর্মী দেশে থেকে যান, তাঁদের সংগ্রামও সমভাবে প্রশংসার দাবি রাখে। মুক্তিযুদ্ধের প্রথমদিকে প্রায় তিন মাস দৈনিক আজাদীর প্রকাশনা বন্ধ থাকে। সেই দুর্দিনে দেশের সামগ্রিক পরিবেশ এমনই দুঃসহ ছিল যে, পত্রিকার প্রকাশনা অব্যাহত রাখা সম্ভব ছিল না।

পরবর্তী সময়ে দেশে স্বাভাবিক পরিস্থিতি বিদ্যমান বোঝানোর জন্য পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর পক্ষ থেকে পত্রিকার প্রকাশনা পুনরায় চালু করার ওপর জোর দেওয়া হয়। সেই সুযোগে জুন-জুলাই ১৯৭১ থেকে দৈনিক আজাদী পুনঃপ্রকাশের উদ্যোগ নেওয়া হয়। একদিকে ঘাতক পাকিস্তানি বাহিনীর নির্যাতন, হত্যার ভয়; অন্যদিকে সাংবাদিকদের কাজের জগতে বের করে আনা ছিল অনেকটা হাতে ধরে মৃত্যুর দুয়ারে আসা। একদিকে আলবদর, রাজাকার, আলশামস বাহিনীর শ্যেনদৃষ্টি, অন্যদিকে হানাদার পাকিস্তানি বাহিনী। এমন অবস্থায় বর্তমান সম্পাদক এমএ মালেক জীবনের ঝুঁকি নিলেন। তিনি ভাবলেন, পত্রিকা বের করা ঝুঁকিপূর্ণ, আবার না করাও ঝুঁকিপূর্ণ। এমন ভয়াবহ পরিস্থিতি মোকাবিলা করে আজাদী প্রকাশিত হলো কোহিনুর ইলেকট্রিক প্রেস থেকে। সেই সময় সম্পাদকের কঠিন দায়িত্বে ছিলেন এমএ মালেক। ১৯৭১ সালের ১৭ ডিসেম্বর সকালে স্বাধীন বাংলাদেশে দৈনিক আজাদী 'জয় বাংলা, বাংলার জয়' ব্যানার শিরোনাম দিয়ে বিজয়ের কথা চট্টগ্রামে নিশ্চিত করে। আর এরই মাধ্যমে দৈনিক আজাদীই স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সংবাদপত্র হিসাবে স্বীকৃত হয়। দেশের মিডিয়া ব্যক্তিত্বদের মতে, 'জয় বাংলা, বাংলার জয়' স্লোগানে স্বাধীনতার প্রথম প্রহর ১৭ ডিসেম্বর দৈনিক আজাদীর প্রকাশ ঐতিহাসিক।

দীর্ঘসময় ধরে সম্পাদনার দায়িত্বে থাকা বরেণ্য সাংবাদিক অধ্যাপক মোহাম্মদ খালেদ ছিলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঘনিষ্ঠ সহচর। তিনি স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধান রচয়িতাদের একজন। ষাটের দশকে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে যত আন্দোলন, সংগ্রাম–সবকিছুর সঙ্গে দৈনিক আজাদী ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল। মহান মুক্তিযুদ্ধে এ পত্রিকার অবদান অপরিসীম। অধ্যাপক মোহাম্মদ খালেদ একাত্তরে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে ও মুক্তিযোদ্ধাদের নানা কর্মকাণ্ডে নেতৃত্ব দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জাতীয় দায়িত্ব পালন করেন। ২০০৩ সালে অধ্যাপক মোহাম্মদ খালেদের মৃত্যুর পর দৈনিক আজাদীর সম্পাদকের দায়িত্ব নেন এমএ মালেক এবং পরিচালনা সম্পাদক হিসাবে দায়িত্ব নেন ওয়াহিদ মালেক। মহান মুক্তিযুদ্ধে অসামান্য অবদান এবং সাংবাদিকতার বিকাশে অনন্য ভূমিকার জন্য অধ্যাপক মোহাম্মদ খালেদকে ২০১৯ সালে সরকার সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় পুরস্কার 'স্বাধীনতা পুরস্কারে' ভূষিত করে।

বর্তমান সম্পাদক এমএ মালেক তাঁর সংবাদপত্রকে সব সময় আধুনিক সজ্জায় রাখার চেষ্টা করেছেন। তাঁর একান্ত ইচ্ছায় দৈনিক আজাদী পায় প্রযুক্তির ছোঁয়া। বিশ্বের প্রায় সব দেশেই ভ্রমণের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। এ অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়েছেন তিনি। আশির দশকের শেষের দিকে তিনি পত্রিকায় এনেছিলেন ফটোটাইপ মেশিন। আজাদীর ৬৪ বছরের পথচলায় পর্যায়ক্রমে 'হ্যান্ড কম্পোজ, লাইনো টাইপ, মনোটাইপ, ফটোটাইপ হয়ে কম্পিউটার সেটআপ'-এর উজ্জ্বল সঙ্গী তিনি। বর্তমানে পত্রিকাটির প্রিন্ট সংস্করণের পাশাপাশি অনলাইনেও দুটি সংস্করণ রয়েছে। আশি বছর বয়সেও দিনে ১৮ ঘণ্টারও বেশি সময় তিনি ব্যয় করছেন আজাদীর জন্য। সাংবাদিকতায় অনন্য ভূমিকার জন্য আজাদী সম্পাদক এমএ মালেককে ২০২২ সালে সরকার দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় পুরস্কার 'একুশে পদকে' ভূষিত করে।

আবদুল খালেক ইঞ্জিনিয়ার পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন চট্টগ্রামের সামাজিক-সাংস্কৃতিক জীবনে তথ্যপ্রবাহের মাধ্যমে নতুন গতি সঞ্চার করতে। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই আজাদী দৃঢ়ভাবে পালন করে এসেছে কল্যাণমুখী, মানবব্রতী ও দেশব্রতী ভূমিকা।

অস্কার ওয়াইল্ড বলেছিল: In America the President reigns four years and Journalism governs for ever and ever. কথাটি সংবাদপত্র ও সাংবাদিকদের জন্য শ্লাঘার। কোনো পত্রিকা যদি জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা সঠিকভাবে তুলে ধরতে পারে, তাহলে তার স্থায়িত্ব হয় দীর্ঘকালীন।

আসলে মিডিয়া এখন বিস্তৃত আয়না। পৃথিবীর সব দৃশ্য এতে দৃশ্যমান। এখন কাজ যত সহজ ও দ্রুততর হচ্ছে, তেমনই গতিশীল হচ্ছে সাংবাদিকতা। স্বাধীন সাংবাদিকতার কণ্ঠরোধ বা মুক্ত তথ্যপ্রবাহ থেকে মানুষকে বঞ্চিত রাখা এখন আর সম্ভব হচ্ছে না। তথ্যপ্রযুক্তির দ্রুত ও অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রার কারণে গণমাধ্যম এখন অনিবার্য ভরসাস্থল হয়ে দাঁড়িয়েছে মানুষের কাছে। সাংবাদিকতার মূলধারাটি সব সময় আপামরসাধারণের পাশে থেকেছে এবং তাতে জনগণের বিজয়ের পাশাপাশি সাংবাদিকতার পথের অনেক বাধাও অপসারিত হয়েছে। আগের যে কোনো সময়ের চেয়ে সংবাদমাধ্যম ও সাংবাদিকদের শক্তি অনেক বেশি সংহত হয়েছে এবং অনেক বেশি স্বাধীনতা অর্জন করছে। ভবিষ্যতে এ ধারা অব্যাহত থাকবে এবং জনগণ নতুন ধারার সাংবাদিকতার মুখোমুখি হবে। আস্থা ও বিশ্বাসের জায়গাটা আরও বেশি দৃঢ় ও মজবুত হবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। মানুষের আস্থার জায়গায় আজাদীর কর্মীরা তৎপর।

দৈনিক আজাদী জন্মলগ্ন থেকেই সেই সৎ সাংবাদিকতাই করে আসছে। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই আজাদী দৃঢ়ভাবে পালন করে এসেছে কল্যাণমুখী, মানবব্রতী ও দেশব্রতী ভূমিকা। সেই ধারাবাহিকতায় আজাদী চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা বিভাগে কৃতী শিক্ষার্থীদের জন্য চালু করেছে বৃত্তি। প্রতিবছর বেশ কয়েকজন শিক্ষার্থী সেই বৃত্তি গ্রহণ করে তাদের শিক্ষা কার্যক্রমে সহায়তা নেয়।

দলমতের ক্ষেত্রে আজাদী অনুসরণ করেছে নিরপেক্ষ ইতিবাচক ভূমিকা। আর এজন্য দলমতনির্বিশেষে পাঠকপ্রিয়তা পেয়েছে আজাদী। মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ধারণ করে এগিয়ে চলা প্রগতিশীল এই পত্রিকাটির মূলধন পাঠকসমাজ। এ পাঠকসমাজই আজাদীকে বাঁচিয়ে রাখবে। সামগ্রিক অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ২০১৯ সালে আজাদী লাভ করে বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল পদক। দৈনিক আজাদী আজ শুধু একটি সংবাদপত্রই নয়, এটি এখন চট্টগ্রামের আয়না হিসাবেও স্বীকৃত।

লেখক: সাংবাদিক, শিশুসাহিত্যিক; ফেলো (নম্বর-৪২২), বাংলা একাডেমি;
সাবেক সাধারণ সম্পাদক, চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাব

প্রবন্ধ

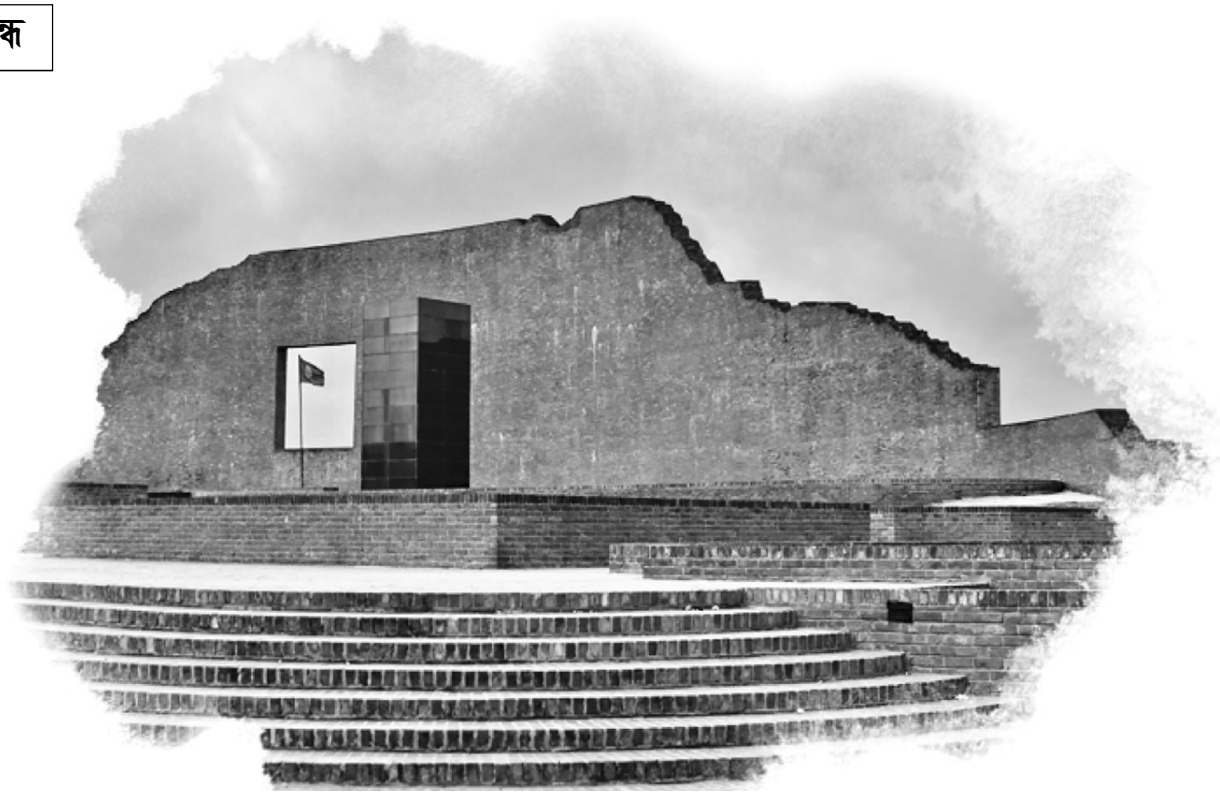

চেতনার দিনে বারবার ফিরে যেতে ইচ্ছা করে

■ রাজন ভট্টাচার্য

দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পৃথিবীর মানচিত্রে স্বাধীন দেশ হিসাবে জায়গা করে নেয় বাংলাদেশ। একজন গণমাধ্যমকর্মী হিসাবে দেশের জন্মের ইতিহাস জানা যেমন জরুরি, তেমনই বিজয় দিবসের সংবাদ সরবরাহ করা গুরুত্বপূর্ণ, এমনকি আগ্রহের বিষয়। এর বড়ো কারণ হলো, দিবসের নানা আয়োজনে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, স্মৃতিচারণাসহ নানা বিষয়ে নিজেকে সমৃদ্ধ করা যায়। দেশের জন্মদিনের চেতনার সঙ্গে শামিল হওয়ার প্রাপ্তি অনেক বড়ো।

১৬ ডিসেম্বর উপলক্ষ্যে রাজধানী ঢাকায় বড়ো পরিসরে আয়োজন হয় অনেক জায়গায়–জাতীয় স্টেডিয়াম, জাতীয় প্যারেড গ্রাউন্ড থেকে শুরু করে সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধ প্রভৃতি স্থানে। এর মধ্যে সাভারে লোকসমাগম বেশি হয়। বীর শহিদদের উদ্দেশে স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধা নিবেদন-পর্বের সংবাদ সরবরাহ করতে প্রতিবার শীতে আগের মধ্যরাতে ঘটনাস্থলে পৌঁছাতে হয়। রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে কুয়াশাচ্ছন্ন সকালে সর্বস্তরের মানুষের জন্য স্মৃতিসৌধের ফটক উন্মুক্ত করা হয়। এরপর দেশপ্রেমিক লাখো মানুষের ঢল। প্রায় বিকাল পর্যন্ত এ পর্ব চলে। কার্যত সারা দেশ থেকে স্মৃতিসৌধে শামিল হয় সব বয়সের মানুষ।

তেমনই ১৪ ডিসেম্বর শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবসে 'রায়েরবাজার বধ্যভূমি স্মৃতিসৌধ' ও মিরপুরে 'শহিদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধ'-এ লোকে লোকারণ্য হওয়া স্বাভাবিক বিষয়। প্রতিবছরের এ দিনে দুটি স্থানে গিয়েই সংবাদ সরবরাহের আগ্রহ তৈরি হতো। কিন্তু একার পক্ষে তা সম্ভব হতো না। কারণ, এখানে যারা আসেন, তাদের মুখ থেকে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর গণহত্যার নানা বিবরণ জানা যায়। মুক্তিযোদ্ধাদের থেকে জানা যায় নতুন নতুন তথ্য, যা নিজেকে সমৃদ্ধ করে। তাই মিরপুরে একই প্রতিষ্ঠানের আরেকটি টিম রাখা হতো সংবাদ সংগ্রহের জন্য।

পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী এ দেশীয় দোসরদের নিয়ে নিশ্চিত পরাজয় জেনে বিজয়ের ঠিক আগ মুহূর্তে ১৪ ডিসেম্বর বুদ্ধিজীবী হত্যায় মেতে ওঠে। তারা পূর্ববাংলার সূর্যসন্তানদের বেছে বেছে মৃত্যু নিশ্চিত করে। শুরুটা ছিল ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ কালরাত্রিতে অপারেশন সার্চলাইটের নামে গণহত্যার মধ্য দিয়ে আতঙ্ক তৈরি ও মেধাবীদের কোণঠাসা করে যুদ্ধ থেকে সরিয়ে রাখা। আর শেষটা ছিল পরাজয়ের যন্ত্রণা থেকে। যেন বাংলাদেশ আর কোনোদিন মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে।

স্বাধীনতার পর 'বুদ্ধিজীবী নিধন তদন্ত কমিশন' গঠিত হয়। ওই কমিশনের প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, পাকিস্তানি মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী শুধু ডিসেম্বরেই ২০ হাজার বুদ্ধিজীবী হত্যার পরিকল্পনা করেছিল। ঘাতকদের নেতৃত্বে ছিল চৌধুরী মঈনুদ্দীন ও আশরাফুজ্জামান খান। তারা বুদ্ধিজীবীদের তালিকা করে তাঁদের হত্যা কার্যকর করার পরিকল্পনা করে। পরে তাঁদের লাশ রায়েরবাজার বধ্যভূমিসহ বিভিন্ন স্থানে ফেলে দেওয়া হয়।

১৯৭১ সালে স্বাধীনতার পর আশরাফুজ্জামানের নাখালপাড়ার বাসা থেকে একটি ডায়ারি জব্দ করা হয়েছিল। ওই ডায়ারিতে যেসব বুদ্ধিজীবীর নাম-ঠিকানা পাওয়া যায়, তাদের সবাইকে ১৪ ডিসেম্বর হত্যা করা হয়। রায়েরবাজার ও মিরপুরের শিয়ালবাড়ী বধ্যভূমিতে কয়েকজন বুদ্ধিজীবীকে নিজ হাতে আশরাফুজ্জামান হত্যা করে বলে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের রায়ে বলা হয়।

১৯৮৫ সালের ১৪ ডিসেম্বর ২৫০ জনের তালিকা নিয়ে শহিদ বুদ্ধিজীবী কোষগ্রন্থ প্রকাশ করা হয়। যে ২৫০ শহিদ বুদ্ধিজীবীর নাম সংগ্রহ করা হয়, তাঁদের অনেকেরই আবাসিক ঠিকানা খুঁজে পাওয়া যায়নি। ফলে কিছু শহিদ বুদ্ধিজীবীর বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। কোষগ্রন্থের নাম-ঠিকানা ধরে খোঁজখবর নিয়ে শহিদ বুদ্ধিজীবীদের কয়েকজনের নিকটাত্মীয়ের লেখা সংকলিত করে ১৯৮৮ সালে বাংলা একাডেমি প্রকাশ করে 'স্মৃতি-৭১' গ্রন্থ। 'স্মৃতি-৭১' গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ার পর ব্যাপক সাড়া জাগায় এবং কোষগ্রন্থে প্রকাশিত তালিকার বাইরে অনেক শহিদ বুদ্ধিজীবীর আত্মীয়স্বজন তাঁদের তথ্য নিয়ে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে বাংলা একাডেমির সঙ্গে যোগাযোগ করেন। এ পর্যায়ে এসে কোষগ্রন্থের তালিকাসহ প্রায় ৩২৫ শহিদ বুদ্ধিজীবীর নাম বাংলা একাডেমির হাতে আসে। পরে একের পর এক 'স্মৃতি-৭১' প্রকাশিত হতে থাকে। ১৯৯৭ সালের ৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত এ গ্রন্থের দশম খণ্ড প্রকাশিত হয় ।

১৪ ডিসেম্বর বুদ্ধিজীবী হত্যা প্রসঙ্গে ১৯৭১ সালের ২৪ ডিসেম্বর সাপ্তাহিক 'বাংলাদেশ'-এর বুলেটিনে প্রকাশিত খবরে বলা হয়েছে ২৫০ বুদ্ধিজীবী হত্যার কথা। সব তথ্য-উপাত্ত ও প্রমাণ বলছে, ১৯৭১ সালের ১৪ ডিসেম্বর বুদ্ধিজীবীরা পাকিস্তানিদের বড়ো ধরনের নীলনকশার শিকার হয়েছেন। সেই বীর সন্তানদের স্মরণ করতে প্রতিবছর রায়েরবাজার বধ্যভূমিতে সর্বস্তরের মানুষের শ্রদ্ধা নিবেদনের পাশাপাশি একটি অংশে জাতীয় শিশু-কিশোর সংগঠন কেন্দ্রীয় খেলাঘর আসর 'গণহত্যার প্রতিকৃতি' তুলে ধরে। এটি একেবারেই ব্যতিক্রমী আয়োজন। নতুন প্রজন্ম যদি মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস জেনে এবং অন্যদের কাছে তুলে ধরে, এর ফল হলো মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় নতুন প্রজন্ম গড়ে তোলা। এ কাজটি যদি সবার সহযোগিতায় সারা দেশে ছড়িয়ে দেওয়া সম্ভব হতো, তাহলে একটি দেশপ্রেমিক প্রজন্মের হাতে ভবিষ্যৎ বাংলাদেশ অনেকটাই নিরাপদ থাকবে–এমন প্রত্যাশা স্বাভাবিক। এর মধ্য দিয়ে সমাজে অনিয়ম, দুর্নীতি, স্বেচ্ছাচারিতা, সামাজিক, রাজনৈতিক, পারিবারিক থেকে শুরু করে নানা সংকট কমে আসত। কারণ, একজন দেশপ্রেমিক মানুষ বিবেকের কারণে ইচ্ছা করলেই যা ইচ্ছা তা করতে পারেন না।

রায়েরবাজারে প্রতীকী এই বধ্যভূমির আয়োজন করা হয় চন্দ্রালোক, সূর্যালোক ও ঘাসফুল খেলাঘর আসরের পক্ষ থেকে। তিনটি শাখা আসরের ৩০ শিশু-কিশোর গণহত্যার প্রতিকৃতিতে অংশ নেয়। পাশাপাশি আলোর মিছিল কর্মসূচিও পালন করে সংগঠনটি।

১৯৭১ সালের ১৪ ডিসেম্বর ঢাকার বিভিন্ন বাসা থেকে যেসব বীর সন্তানকে তুলে নেওয়া হয়েছিল, পরবর্তী সময়ে তাঁদের অনেকের লাশ পাওয়া যায় এ বধ্যভূমিতে। অসংখ্য লাশের ভিড়ে কেউ নিজের স্বজনকে খুঁজে পেয়েছিলেন, কেউ পাননি। লাশ বিকৃত হয়ে যাওয়ায় অনেকে স্বজনকে চিনতেও পারেননি। বেশকিছু লাশ কুকুর খেয়ে ফেলেছিল।

১৪ ডিসেম্বর দেশের বীর সন্তানদের হত্যার ভয়াল সেই স্মৃতির সাক্ষী এই রায়েরবাজার। তাই বধ্যভূমিতে সেই সময়ের দুঃসহ স্মৃতি নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরতে খেলাঘর এ স্থানটিতে গণহত্যার প্রতিকৃতি তৈরির জন্য বেছে নেয়। পুরো আয়োজন দেখে মনে হবে অবিকল গণহত্যার চিত্র।

সেখানে প্রদর্শন করা হয় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও দেশীয় দোসরদের নির্মম অত্যাচারে ক্ষতবিক্ষত শরীর। বস্ত্রহীন দেহে অসংখ্য গুলির চিহ্ন। গায়ে কালো দাগ। অবিরাম রক্ত ঝরছে। তুলে নেওয়া হয়েছে চোখ। বিকৃত করা হয়েছে মুখমণ্ডল। কেউ আহত অবস্থায় কাতরাচ্ছেন। চিৎকার করছেন। বাঁচার আকুতি জানাচ্ছেন। রক্তে ভিজে উঠেছে মাটি। গণহত্যার প্রতিচিত্রে ১৯৭১ সালের বধ্যভূমির এরকম দৃশ্য জীবন্ত হয়ে সবার কাছে ফুটে ওঠে প্রতিবার।

পাকিস্তানিদের এরকম বর্বরতা দেখে অনেকে ধিক্কার দেন। শিউরে ওঠেন। ইতিহাস জানার চেষ্টা করেন নতুন প্রজন্মের অনেকেই। কেউ কেউ ডুকরে কেঁদে ওঠেন ঘটনা জানার পরই। মনের অজান্তেই দুচোখ বেয়ে ঝরে অশ্রু।

১৪ ডিসেম্বর ও বিজয় দিবসের অনুষ্ঠানে সংবাদ সরবরাহ করতে গিয়ে প্রতিবারই মনে হয়েছে, এ আয়োজনের সঙ্গে দেশের জন্মের নিবিড় বন্ধন। তাই দেশের তরুণ প্রজন্মকে দিবস উপলক্ষ্যে সব আয়োজনের সঙ্গে প্রতিবার যুক্ত করা উচিত। কারণ, এখানে মুক্তিযোদ্ধা, বীরাঙ্গনা থেকে শুরু করে যুদ্ধের সময় যাঁরা বিভিন্ন পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন, এমনকি প্রত্যক্ষদর্শী–সবাই কমবেশি এসব আয়োজনে শামিল হওয়ার চেষ্টা করেন। তাঁদের কাছ থেকে মুক্তিযুদ্ধের অজানা অনেক ইতিহাস জানা যায়। অনেকেই বয়সের ভারে ন্যুব্জ। তাঁদের মুখ থেকে অজানা ইতিহাসগুলো শুনে সংরক্ষণ করাও নাগরিক হিসাবে দায়িত্ব রয়েছে। পাশাপাশি মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিজ্ঞানমনস্ক সমাজ বিনির্মাণের শপথের ধারণা–এমন আয়োজন থেকেই আগামী প্রজন্ম নিতে পারে। বদলে যাওয়া বাংলাদেশকে আরও এগিয়ে নিতে এর বিকল্প নেই।

লেখক: সিনিয়র সাংবাদিক ও কলামিস্ট

সংবাদপত্রের পাতায় প্রথম বিজয়োৎসব

■ শাহেলা আক্তার

'মুক্তির মন্দির সোপানতলে
কত প্রাণ হলো বলিদান
লেখা আছে অশ্রুজলে।'

ডিসেম্বর ১৯৭২। প্রথম বিজয় উৎসব সন্নিকটে।

স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম বিজয়োৎসব। মুক্তিযোদ্ধা, রাজনৈতিক নেতা, বুদ্ধিজীবী, ছাত্রসহ আপামরসাধারণের মনে উৎসাহ-উদ্দীপনা। চারদিকে সাজসাজ রব। নতুন দেশ, নতুন জাতীয় চেতনা। এরই মধ্যে ১৩-১৪ ডিসেম্বর বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ডের মতো হৃদয়বিদারক ঘটনার স্মরণে জাতি ব্যথাতুর ও দুঃখ ভারাক্রান্ত। একদিকে স্বপ্ন, অন্যদিকে দুঃস্বপ্ন। এমনই এক পরিক্রমায় ১৬ ডিসেম্বর প্রথম বিজয় দিবস আগত হয়। এর সূত্রপাত আগের বছরে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর আত্মসমর্পণে বিজয় লাভের মধ্য দিয়ে। বাংলাদেশের বিজয় ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে কাতারে কাতারে মানুষ নেমে আসে রাস্তায়। কিন্তু মানুষের আবেগ, বিজয়ের আকাঙ্ক্ষা তাদের দমাতে পারেনি। আটকিয়ে রাখতে পারেনি ঘরের কোণে।

'ঢাকার রাজপথে ছুটে আসা তরুণ-তরুণীর মনে তখন আনন্দের ফল্গুধারা। সংবাদপত্র আর দেশি-বিদেশি রেডিওর রিপোর্টার-ফটোগ্রাফারও বেরিয়ে পড়েছেন। ওরা বিজয়ের উৎসবে আত্মহারা।'[১]

সহজেই অনুমেয়, প্রথম বিজয় উৎসব, তা ছিল অনেক আকাঙ্ক্ষার, অনেক গৌরবের। ১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর যে বিজয় উৎসব হয়েছিল, তা ছিল আনন্দ, উৎসব, শোক ও শ্রদ্ধার এক অপরূপ সম্মিলন। রাজধানী ঢাকা থেকে শুরু করে বিভিন্ন বিভাগ, জেলা ও থানা পর্যায়ে মহাসমারোহে উদ্‌যাপন হয়েছিল প্রথম বিজয় উৎসব। এই উৎসব ছিল স্বতঃস্ফূর্ত ও প্রাণময়, যাতে দেশের স্বাধীনতাকামী সব মানুষ অংশ নিয়েছিল। সংবাদপত্রের পাতা থেকে আমরা দেখতে পাই আওয়ামী লীগ, সরকার ও মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডসহ আপামরসাধারণ ভিন্ন ভিন্নভাবে এ উৎসব কর্মসূচি দিয়েছিল।

১২ ডিসেম্বর দৈনিক আজাদ পত্রিকার প্রথম পাতায় দেখতে পাই 'বিজয় দিবসে আওয়ামী লীগের কর্মসূচী' শিরোনামে একটি সংবাদ। এতে বলা হয়েছে–

'বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সম্পাদকমণ্ডলীর এক সভায় বিজয় দিবস উপলক্ষে এক দলীয় কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়।

কর্মসূচি– ভোর ৫টায় প্রভাত ফেরী, মন্দির-মসজিদে শহীদদের জন্য মোনাজাত-প্রার্থনা। সকাল ৭টায় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে পুষ্পমাল্য অর্পণ। সারাদেশে দলীয় কার্যালয় সমূহে জাতীয় ও দলীয় পতাকা উত্তোলন। বিকেল আড়াইটায় সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে জনসভা এবং সন্ধ্যায় গণসঙ্গীতের আসর।'[২]

দৈনিক পূর্বদেশে ১৯৭২ সালের ১১ ডিসেম্বর এজাতীয় একটি সংবাদ ছাপা হয়েছে, যার শিরোনাম:

'যথাযোগ্য মর্যাদায় বিজয় দিবস পালন করুন।'

সংবাদটি এরকম–

'যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে বিজয় দিবস উদযাপনের জন্য বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ তার সকল ইউনিটের প্রতি নির্দেশ দিয়েছে। দলীয় সূত্র থেকে এই তথ্য জানা গেছে। বিজয় দিবস উপলক্ষে আওয়ামী লীগ সারা দেশে ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশনাবলী জেলা ইউনিটগুলোর কাছে পৌঁছে দিয়েছে।'[৩]

১২ ডিসেম্বর দৈনিক আজাদ বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে আরও কিছু কর্মসূচির সংবাদ প্রকাশ করে। সংবাদে বলা হয়:

'বিজয় দিবস উপলক্ষে আগামী ১৬ই ডিসেম্বর বুড়িগঙ্গা নদীতে তিনটি গানবোট প্রদর্শনের জন্য উন্মুক্ত করে রাখা হবে। এ প্রদর্শনী সকাল ৮টায় শুরু হয়ে বিকেল ২টায় শেষ হবে। এ গানবোটগুলো স্কুলের ছেলেমেয়েদের জন্য প্রদর্শিত হবে।

এছাড়া বিভিন্ন ধরনের সমরাস্ত্র প্রদর্শনের জন্য বাংলাদেশ আর্মি ঐ একই দিনে ঢাকা স্টেডিয়ামে একটি প্রদর্শনী খুলবে।'[৪]

ওই একই দিন আরেকটি সংবাদের শিরোনাম করা হয়েছে–

'ইন্টারকন-শ্রমিক ইউনিয়ন'

সংবাদটি এরকম–

'বিজয় দিবস উপলক্ষে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল ঢাকা শ্রমিক ইউনিয়ন এক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এদিন ভোর ৬টায় তারা জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও শহীদ মিনারে পুষ্পমাল্য অর্পণ করবেন। বিকেল সাড়ে ৫টায় এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হবে গ্রান্ড বলরুমে।'[৫]

দৈনিক আজাদে বিজয় দিবসে উপলক্ষ্যে বাস্কেটবল ও ভলিবল প্রতিযোগিতার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। শিরোনাম দুটি এরকম–

'বিজয় দিবস বাস্কেট বল
স্পার্স পরবর্তী রাউন্ডে উঠলো'
এবং
'বিজয় দিবস ভলিবল
দিলকুশা দলের সহজ বিজয়'[৬]

এ দুটি পত্রিকা প্রথম বিজয় দিবস ও শহিদদের স্মরণে সম্পাদকীয়, কলাম, মতামত কলাম, ফিচার, বিজ্ঞাপন ও বিশেষ নিবন্ধও প্রকাশ করে।

বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে দৈনিক আজাদে বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়েছে এভাবে–

'১৬ই ডিসেম্বর
বিজয় দিবস
বাঙ্গালীর জাতীয় ইতিহাসের সবচেয়ে স্মরণীয় দিন
এই ঐতিহাসিক দিনে
দৈনিক আজাদ
বিশেষ সংখ্যা হিসেবে প্রকাশিত হবে
এতে দেশের প্রখ্যাত
কবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও চিন্তাবিদরা লিখছেন।
বিজ্ঞাপনের জন্য
সত্বর যোগাযোগ করুন:
বিজ্ঞাপন ম্যানেজার
দৈনিক আজাদ, ফোন: ২৪৬৭৪৬

রাজশাহী অফিস	রংপুর অফিস	যশোর অফিস
আবুল হোসেন মালেক তালুক ভিলা কাদিরগঞ্জ, রাজশাহী	মোনাজাতউদ্দিন সেন্ট্রাল রোড	আবুল হোসেন মীর লাল দীঘির পাড় যশোর, ফোন: ৬২৫

বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে বেশকিছু কলাম প্রকাশিত হয়েছে। এসব সম্পাদকীয় ও কলামও মুক্তিযুদ্ধ এবং এর প্রেক্ষাপটে রচিত। এগুলোর মধ্যে ১২ ডিসেম্বর দৈনিক আজাদে 'মুক্তি সংগ্রামে ভৈরব' শিরোনামে মুক্তিযুদ্ধে ভৈরবের যোদ্ধাদের বীরত্বগাথা নিয়ে লেখেন বশীর আহমেদ, লেখাটি প্রকাশিত হয়েছে সম্পাদকীয় পাতায়।

১৩ ডিসেম্বর দৈনিক আজাদের সম্পাদকীয় লেখা হয় 'জাতিসংঘ দায়িত্ব এড়াতে পারে না' শিরোনামে। যার একটি প্যারায় বলা হয়েছে–

'গত বছর মানবাধিকার দিবসে বর্বর পাক হানাদার বাহিনী ও তার দোসর আলবদর, আলশামস বাহিনী বাংলার বুকে ইতিহাসের সর্বাধিক বিভীষিকাপূর্ণ গণহত্যা চালিয়েছিল। বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের সুস্থ মস্তিষ্ক চিরতরে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার খেলায়ও তারা মেতে উঠেছিল। ফলে বাংলাদেশকে হারাতে হয়েছে অনেক কৃতী সাহিত্যিক, সাংবাদিক, শিক্ষক, ডাক্তার ও ইঞ্জিনিয়ার বুদ্ধিজীবীকে। এবারকার মানবাধিকার দিবসেও পাকিস্তানে আটক পাঁচ লক্ষ নিরীহ বাঙালীর আর্তনাদে আকাশ বাতাস মুখরিত। জাতিসংঘের মানবাধিকার সনদের এরচেয়ে বড় রকমের অবমাননা আর কি হতে পারে। এই অবস্থার মধ্যেও বাংলাদেশ সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী পাকিস্তানী নাগরিকদের দেশে ফিরে যেতে দিতে প্রস্তুত বলে উল্লেখ করেছেন। এটা কেবল জাতিসংঘের মানবাধিকার সনদের প্রতি বাংলাদেশের শ্রদ্ধাশীল মনোভাবের পরিচয় বহন করে।'[৮]

বিজয় উৎসবের প্রাক্কালে বছর ধরে চলা সবার মনের একটি জিজ্ঞাসা 'যুদ্ধবন্দিদের কী হবে'। এর ওপর একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে দৈনিক পূর্বদেশ। প্রতিবেদনটি যদিও ভারতের লোকসভা নিয়ে; কিন্তু বিতর্কটি ছিল যুদ্ধবন্দি প্রশ্নে। তাই সংবাদটি গুরুত্বসহকারে প্রকাশ করে দৈনিক পূর্বদেশ। শিরোনামটি ছিল এরকম–

'লোকসভায় বিতর্ক চলাকালে শরন সিং বলেন– পাকিস্তান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি না দিলে যুদ্ধবন্ধী প্রশ্ন জটিল থেকে যাবে।'[৯]

এছাড়া বিজয় দিবসের প্রাক্কালে আরও কিছু সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে দৈনিক পূর্বদেশ ও দৈনিক আজাদে। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রতিবেদনগুলোর শিরোনাম হচ্ছে এরকম–

১. 'বিজয় দিবসে বিভিন্ন সংস্থার কর্মসূচী'–১৩ ডিসেম্বর, দৈনিক আজাদ

২. 'স্মরণ করি শহীদ সাংবাদিক নিজামুদ্দিনকে'–দৈনিক আজাদ, ১২ ডিসেম্বর ১৯৭২

৩. 'এই দিনে হানাদার হননে মরণাঘাত
আত্মসমর্পণের পালা শুরু' (দৈনিক আজাদ, ১২ ডিসেম্বর ১৯৭২)

৪. 'জাতিসংঘ সমিতির অনুষ্ঠানে সামাদ: মানবাধিকারের পূর্ণ মর্যাদা দিতে বাংলাদেশ দৃঢ় সংকল্প
স্বদেশে ফেরা আটক বাঙালীদের মৌলিক অধিকার'–দৈনিক পূর্বদেশ, ১১ ডিসেম্বর ১৯৭২

৫. 'মুক্তির আলোতে তীর্থে রক্তদান' সলিমুল্লাহ–মতামত কলাম, দৈনিক পূর্বদেশ, ১১ ডিসেম্বর ১৯৭২

৬. 'স্বাধীনতার স্বপ্নে বিভোর শহীদ মোস্তফা স্মরণে' বিশেষ ফিচার–দৈনিক পূর্বদেশ, ১১ ডিসেম্বর ১৯৭২

৭. 'আজিকার এই দিনে'–বিশেষ প্রতিবেদন, দৈনিক পূর্বদেশ, ১১ ডিসেম্বর ১৯৭২

৮. 'বীরের এ রক্তস্রোতে মাতার এ অশ্রুধারা'–রফিকুল ইসলাম লিখিত নিয়মিত এ মতামত কলামটি প্রকাশ পেত সম্পাদকীয় পাতায় দৈনিক পূর্বদেশে

৯. 'বিজয় দিবসে বিশ্ববিদ্যালয় কালাকানুন বাতিলের ঘোষণা চাই'–দৈনিক পূর্বদেশ, ১০ ডিসেম্বর ১৯৭২

১০. 'স্মৃতির আলোয় পাষাণপুরী'–আবদুশ শহীদ লিখিত মতামত কলাম, দৈনিক আজাদ, ১৪ ডিসেম্বর ১৯৭২

১১. 'মুক্তি সংগ্রামে ভৈরব'–বশীর আহমেদ লিখিত কলাম, দৈনিক আজাদ, ১৪ ডিসেম্বর ১৯৭২

১২. 'ডিসেম্বর এসেছে আসবে–সে ফিরে আসবে কি?' ফিচার রিপোর্ট, দৈনিক আজাদ, ১৪ ডিসেম্বর ১৯৭২

১৬ ডিসেম্বর প্রথম বিজয় দিবসকে লক্ষ্য করে দৈনিক ইত্তেফাক একটি বিশেষ সম্পাদকীয় ছাপে। যার বক্তব্য ছিল এরকম–

'বুকের তাজা রক্ত দান করিয়া যে লক্ষ লক্ষ মানুষ রাত্রির গভীর স্তব্ধ হইতে স্বাধীনতার সূর্য ছিনিয়া আনিয়াছেন, তাহাদের পূণ্যময় স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের সঙ্গে সঙ্গে আমরা এই মর্মে দৃঢ় প্রত্যয় উচ্চারণ করিতে পারি যে, আকাঙ্খিত শান্তি ও সমৃদ্ধির লক্ষ্যে পৌঁছাইতে আমরা কিছুতেই ব্যর্থ হইবো না।'[১০]

দৈনিক গণকণ্ঠে প্রকাশিত সম্পাদকীয়তে শপথ নেওয়া হয় মেহনতি মানুষের সার্বিক মুক্তির জন্য–'তিতুমীর, হাজী শরিয়তুল্লাহ, ক্ষুদিরাম, মাষ্টারদা, প্রীতিলতা, নেতাজি, বরকত, সালাম, ওয়াজিউল্লাসহ মুস্তফা, বাবুল, মনু মিয়া, আসাদ, রুস্তম, জহুর এবং স্বপন চিশতীসহ আরো তিরিশ লক্ষ লোক যে পথ আমাদের দেখিয়েছে এবং যে মতের পথিক হয়ে কৃষক শ্রমিক মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী তথা মেহনতি মানুষের সার্বিক মুক্তির জন্য ইতিহাসের ধারা ইঙ্গিত করে, সে পথ ও মতই হোক ১৬ই ডিসেম্বর শপথ।[১১]

প্রতিবছর ১৬ ডিসেম্বরের দিনকে বিজয় দিবস হিসাবে রাষ্ট্রীয়ভাবে পালন করা হয়। ১৯৭২ সালের ২২ জানুয়ারি এক প্রজ্ঞাপনে দিনটিকে জাতীয় দিবস হিসাবে ঘোষণা করা হয়।[১২] সে হিসাবে এ দিনটি সরকারি ছুটির দিন। এজন্য প্রতিবছরই রাজধানী ঢাকা থেকে শুরু করে বিভাগীয় শহর, জেলা, উপজেলা, থেকে শুরু করে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে মহাসমারোহে উদ্‌যাপিত হয় বিজয় দিবস। বিভিন্ন দেশে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসগুলোও দিবসটি উপলক্ষ্যে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। ১৯৭২ সালে প্রথম বিজয় উৎসবেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। বরং স্বাধীন দেশে উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়েই পালিত হয়েছিল প্রথম বিজয় উৎসব। দৈনিক ইত্তেফাকের প্রতিবেদনে এরই প্রতিফলন পাওয়া যায়।

"৩০ লক্ষ শহীদের রক্তরাঙ্গা পূর্ণস্মৃতি স্মরণে রাখিয়া সারা বাংলাদেশ বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনাসহকারে গৌরবদীপ্ত বিজয় দিবস পালন করিল। গতকাল পৌষের সূর্যকরোজ্জ্বল সুপ্রভাত হইতেই রাজপথ জনতরঙ্গের প্রাণবন্যায় উৎসব মুখর হইয়া উঠে। পথে পথে সুদৃশ্য তোরণের বৈভব, ভবনে ভবনে উড্ডীন রক্তসূর্য খচিত জাতীয় পতাকা, সন্ধ্যায় আলোক মালায় রাজধানী ঢাকা এক অপরূপ সৌন্দর্য শোভায় শোভিত হইয়া উঠে। বেলা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রাজপথ জনসাগরে রূপান্তরিত হইয়া যায়। ঢাকা পরিণত হয় মিছিলের নগরীতে। একের পর এক মিছিল বাসে, ট্রাকে মিছিল, সকলের কণ্ঠে সোচ্চারিত স্লোগান– 'শহীদের রক্ত বৃথা যেতে দেব না।' শুধু রাজধানীর নাগরিকগণই নহেন– বিশেষ লঞ্চ, ট্রেন, বাস, ট্রাক বোঝাই করিয়া শহরতলী ও গ্রামের হাজার হাজার মানুষ রাজধানীতে আগমন করিয়া বিজয় দিবসের অনুষ্ঠানসমূহ বিশেষ করিয়া সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের জনসভায় যোগদান করেন। সকালে স্টেডিয়ামে শিশুদের শরীরচর্চা ও পল্টনে সেনাবাহিনীর সমরাস্ত্র প্রদর্শনীতে হাজার হাজার শিশু-কিশোর, তরুণ-তরুণীসহ সকল শ্রেণির মানুষের প্রচণ্ড ভিড় পরিলক্ষিত হয়। বিমান বাহিনী বিমান মহড়াও প্রদর্শন করে। দুপুর হইতে না হইতেই সকলের একই পথে অভিযাত্রা 'সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে চলো"[১৩]।

তথ্যসূত্র

১. চিন্ময় মুৎসুদ্দী, নিরীক্ষা ১৬৫তম সংখ্যা, ডিসেম্বর ২০০৭, পৃ. ৩
২. আজাদ ১২ ডিসেম্বর ১৯৭২; প্রথম পাতা, ৭ কলাম
৩. পূর্বদেশ, ১১ ডিসেম্বর ১৯৭২; ১ম পাতা, ২য় কলাম
৪. দৈনিক আজাদ, ১২ ডিসেম্বর ১৯৭২, শেষ পাতা, ৫ম কলাম
৫. দৈনিক আজাদ, ১২ ডিসেম্বর ১৯৭২
৬. দৈনিক আজাদ, ১২ ডিসেম্বর ১৯৭২, ৭ম পাতা, শেষ কলাম
৭. দৈনিক আজাদ, ১২ ডিসেম্বর ১৯৭২, শেষ পাতা
৮. সম্পাদক, দৈনিক আজাদ, ১৩ ডিসেম্বর ১৯৭২
৯. দৈনিক পূর্বদেশ, ১০ ডিসেম্বর ১৯৭২
১০. সম্পাদকীয়, দৈনিক ইত্তেফাক, ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭২ (১ম পাতা, ২য় কলাম)
১১. গণকণ্ঠ, সম্পাদকীয়, ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭২
১২. উইকিপিডিয়া
১৩. দৈনিক ইত্তেফাক, ১৭ ডিসেম্বর ১৯৭২, প্রথম পাতা

লেখক: সহকারী সম্পাদক, প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)

প্রবন্ধ

বাঙালির মুক্তিযুদ্ধে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট

■ জাফর ওয়াজেদ

মুক্তিযুদ্ধে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের ভূমিকা অতুলনীয়। কিন্তু তারপরও রয়ে গেছে খাদ। সব বাঙালি সৈন্য মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছে, তা নয়। অনেকে পাকিস্তানি হানাদারের সহযোগীও ছিল। পাকিস্তানেও ফিরে যায় অনেকে। একাত্তরের মার্চে বাংলাদেশ ছিল উত্তাল। স্বাধীনতাকামী মানুষের আকাশভেদী স্লোগানে প্রকম্পিত। শেখ মুজিবের ডাকে পুলিশ, ইপিআর, সরকারি-বেসরকারি চাকরিজীবী থেকে শুরু করে সাড়ে সাত কোটি বাঙালি তখন আনুগত্য প্রকাশ করে তাঁর নির্দেশ মেনে চলছিল। শুধু কর্মরত বাঙালি সেনারা তখনও আনুগত্য প্রকাশের পর্যায়ে ছিল না। তাঁদের কেউ কেউ পাকিস্তানি সেনাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে ২৫ মার্চ রাতে গণহত্যা চালানোর পর। কেউ কেউ আবার পাকিস্তান বাহিনীর প্রতি আনুগত্য বজায় রাখে। বাঙালি সেনাদের অনেকে পাকিস্তানিদের হাতে নিহত হন সেসময়েই।

বাঙালি সৈনিকদের সমন্বয়ে গঠিত ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট কী পর্যায়ে ছিল ১৯৭১ সালে বা কী অবস্থা হয়েছিল তাঁদের–মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের দিকে তাকালে এই প্রশ্ন সামনে আসবেই। এই সৈনিকদের হালহকিকত কী দাঁড়িয়েছিল ১৯৭১ সালে, এ নিয়ে পূর্ণাঙ্গ কোনো কাজ হয়নি তেমন। ছিল যাঁরা সহকর্মী; তাঁরাই শত্রুতে পরিণত হয়েছিল ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের কাছে। ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের শীর্ষ কর্তারা কেউ সারেন্ডার করেন, কেউ মারা পড়েন।

ব্রিটিশকালে ভারতীয় সেনাবাহিনীতে বাঙালির অংশগ্রহণ ছিল নামমাত্র। পাকিস্তান সেনাবাহিনী প্রতিষ্ঠার পর ১৯৭০ সাল পর্যন্ত তাতে বাঙালির প্রতিনিধিত্ব ছিল শতকরা ৫ ভাগ।

৯৫ ভাগ পাকিস্তানির পাশে ৫ ভাগ নস্যি যেন। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিভিন্ন ইউনিট বা প্রতিষ্ঠানে বাঙালিরা ছিল ছড়ানো-ছিটানো অবস্থায়। পুরোপুরি বাঙালি সৈনিকের গঠিত কোনো ইউনিট বা প্রতিষ্ঠানও ছিল না। একমাত্র পদাতিক বাহিনীর রেজিমেন্টগুলো ছিল পাকিস্তানিদের আঞ্চলিক বা প্রাদেশিক ভিত্তিতে। প্রাদেশিক ভিত্তিতে সৈনিক রিক্রুটমেন্ট বা নিয়োগ করা হতো। অঞ্চল ভিত্তিতেই নামকরণ করা হয় রেজিমেন্টগুলোর। একাত্তর সালেও পাকিস্তান সেনাবাহিনীর চারটি পদাতিক রেজিমেন্ট ছিল। পাঞ্জাব রেজিমেন্ট, বেলুচ রেজিমেন্ট, ফ্রন্টিয়ার ফোর্স রেজিমেন্ট এবং ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট। এগুলোর আবার একাধিক ব্যাটালিয়ন ও ব্রিগেড ছিল। বাঙালিরা অন্য রেজিমেন্টগুলোয় কাজ করার সুযোগ পেত তা নয়। বাঙালি রেজিমেন্টেরও শীর্ষ পদসহ অন্য পদগুলো বাকি তিন রেজিমেন্ট থেকে আসা সেনাদের দখল বা নিয়ন্ত্রণে থাকত। কুমিল্লার বুড়িচংয়ের মেজর জেনারেল গণি বা টাইগার গণি ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন।

পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে বাঙালি সৈনিকদের সমন্বয়ে গঠিত একমাত্র রেজিমেন্ট ছিল ইস্ট বেঙ্গল। যার ছিল মাত্র ৮ ব্যাটালিয়ন সৈনিক। প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম ইস্ট বেঙ্গল ছিল নাম। এই আট ব্যাটালিয়নের মধ্যে ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ পর্যন্ত পাকিস্তানের লাহোর, করাচিতে ছিল তিনটি ব্যাটালিয়ন। আর পূর্ববাংলায় পাঁচটি। এ পাঁচটি ইউনিটের দায়িত্বপ্রাপ্ত অধিনায়কদের মধ্যে দুজন ছিলেন বাঙালি। বাকি তিনজন পাকিস্তানি উর্দুভাষী অবাঙালি।

প্রথম ইস্ট বেঙ্গল ছিল যশোরে, যার অধিনায়ক বাঙালি লেফটেন্যান্ট কর্নেল রেজাউল জলিল। দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট ছিল জয়দেবপুরে, অধিনায়ক বাঙালি লেফটেন্যান্ট কর্নেল মাসুদুল হাসান খান। এ দুই রেজিমেন্টের দুই অধিনায়কই পাকিস্তানিদের কাছে বড়ো কোনো চাপ ছাড়াই আত্মসমর্পণ করেন। এ দুই ব্যাটালিয়ন সেনাদের কেউ কেউ পাকিস্তানিদের হাতে নিহত হলেও অধিকাংশই পালিয়ে আত্মরক্ষা করেন এবং মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন।

১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবে আওয়ামী লীগ–এমন হিসাবটা পাকিস্তানি সামরিক জান্তাদের ধারণার বাইরে ছিল। 'বাঙালির হাতে পাকিস্তানের শাসনভার যে দেওয়া যায় না'–এই মতে একাট্টা ছিল সামরিক জান্তারা। তাই তারা 'পূর্ব পাকিস্তান'জুড়ে পাকিস্তানি সেনাবহর সংখ্যা বাড়ানোয় মনোযোগ নিবদ্ধ করেছিল। ১৯৭১ সালের ফেব্রুয়ারিতে পাকিস্তানি সেনা ছিল বাংলাদেশে ১০ থেকে ১২ হাজার। ১৫ মার্চ থেকে এই সংখ্যা ক্রমশ বাড়তে থাকে। সারা বাংলায় পাকিস্তানিদের মাত্র চারটি ব্রিগেড সেনা ছিল। ২৫ মার্চ পর্যন্ত পাকিস্তানিদের শক্তি ছিল ১৪তম ডিভিশনের কয়েকটি ব্যাটালিয়ন মাত্র।

১৯৭১ সালের ৩ ডিসেম্বর ভারত সর্বাত্মক যুদ্ধ ঘোষণা করে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে। এ সময় বাংলাদেশে পাকিস্তানের সামরিক ও আধা-সামরিক বাহিনীর সদস্য সংখ্যা ছিল প্রায় এক লাখ। এই বাহিনী 'ইস্টার্ন কমান্ড হেড কোয়ার্টার্সের' অধীনে কুখ্যাত লে. জেনারেল আমির আবদুল্লাহ খান নিয়াজির নেতৃত্বে পাঁচটি পদাতিক ডিভিশন এবং একটি ইনডিপেনডেন্ট ব্রিগেডের ছত্রছায়ায় ছিল। শুধু এক লাখ পাকিস্তানি সেনারাই গণহত্যা, বর্বরতা, নৃশংসতাসহ যুদ্ধ করেনি, তাদের সহযোগী হিসাবে ছিল আরও বাহিনী। বাংলাদেশীয় দালাল, চাটুকার, মোসাহেবদের দিয়ে পাকিস্তান বাহিনী গঠন করেছিল এক লাখের বেশি আধা-সামরিক বাহিনীর সদস্য রাজাকার, আলবদর, আলশামস বাহিনী। এছাড়াও ছিল পাকিস্তানি সেনাদের পক্ষে বাংলাদেশে বসবাসকারী তিন লক্ষাধিক অবাঙালি বিহারি মুসলমান। সব মিলিয়ে পাকিস্তানি সেনা সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল নিয়মিত বাহিনীর সৈনিক ১ লাখ এবং রাজাকার, আলবদরসহ আধা-সামরিক আরও ১ লাখ সদস্য। মানবতাবিরোধী সব ধরনের অপরাধের সঙ্গে এরা জড়িত ছিল।

অপরদিকে জুলাই পর্যন্ত মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ছিল ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের ৩ হাজার সেনা, রাইফেলসের ১২ হাজার সেনা এবং আনসার, মুজাহিদ, পুলিশ ও ছাত্র স্বেচ্ছাসেবক ছিল মাত্র কয়েক হাজার। অস্ত্র বলতে ৩০৩ রাইফেল, সামান্যসংখ্যক হালকা মেশিনগান এবং নগণ্য ভারী মেশিনগান ও তিন ইঞ্চি মর্টার। পরে এই সংখ্যা বাড়তে থাকে। নিয়মিত বাহিনী ও গণবাহিনী এবং অন্যান্য বাহিনী মিলিয়ে কয়েক লাখ যোদ্ধা যুদ্ধ করেছিল। শেষে ভারতীয় সেনারা এসে মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে মিত্রবাহিনী গড়ে তোলায় সেনা সংখ্যা কয়েকগুণ বাড়ে।

পাকিস্তানে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের যে তিনটি রেজিমেন্ট ছিল, সেখান থেকে অনেক মেজর, ক্যাপ্টেন পালিয়ে এসে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন। বাকিরা ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। অনেক বাঙালি সেনা পাকিস্তানিদের হয়ে বাঙালি নিধনে নেমেছিল। ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের প্রথম ব্যাটালিয়ন, যারা 'সিনিয়র টাইগার' নামে পরিচিত, তারা সব সেনা, অস্ত্র, রসদসহ বাঙালি অধিনায়ক লে. কর্নেল রেজাউল জলিলের নেতৃত্বে যশোরের চৌগাছায় অবস্থান করছিল। তারা ২৪ মার্চ থেকেই বার্ষিক 'ফিল্ড এক্সারসাইজ' উপলক্ষ্যে সেখানে ছিল। ২৫ মার্চ গণহত্যা শুরুর খবর জানার পরও তারা নির্বিকার ছিল। দক্ষিণ-পশ্চিম রণাঙ্গনের মুক্তিযুদ্ধের সেনা অধিনায়ক মেজর আবু উসমান চৌধুরী দুদফা চিঠি পাঠান লে. কর্নেল জলিলকে। যাতে উল্লেখ করেন, 'দেশ ও দশের লোকের নিরাপত্তা পাকিস্তান সেনাবাহিনীর হাতে বিপর্যস্ত। মা-বোনের ইজ্জত লুণ্ঠিত, জ্ঞানী-গুণী ও ছাত্ররা হতাহত হচ্ছে। তাই এর বিরুদ্ধে আমি আমার ইপিআর বাহিনীকে নিয়ে বিদ্রোহ করেছি। বাংলাদেশের পতাকা উড়িয়েছি। আর কে কী করছে জানি না। কিন্তু আপনি সিনিয়র, আপনার কাছে সৈন্য আছে, হাতিয়ার আছে, আপনি আসুন, অধিনায়কত্ব গ্রহণ করুন। আমরা সম্মিলিতভাবে এদের হনন করতে সক্ষম হব।' প্রথম দফা চিঠিটি পেয়ে কোনো জবাব না দিলে পরদিন ২৮ মার্চ একই পত্র পাঠালে কর্নেল জলিল পত্রবাহককে 'পাগলের প্রলাপ' বলে হেসে উড়িয়ে দেন কোনো জবাব না দিয়ে। এমনকি এ বিষয় নিয়ে পুনরায় না আসার জন্য বার্তাবাহককে সতর্ক করে দেন।

কী করলেন এই কর্নেল, পরের দৃশ্যে দেখি তাকে। যশোর সেনানিবাসের পাকিস্তানি কমান্ডারের নির্দেশে কর্নেল জলিল 'সিনিয়র টাইগার'দেরসহ সব অস্ত্রশস্ত্র ও যানবাহন নিয়ে ২৯ মার্চ যশোর ক্যান্টনমেন্ট পৌঁছান এবং সব জমা দেন। পাকিস্তানি ব্রিগেড অধিনায়ক ব্রিগেডিয়ার সরদার আবদুর রহিম দুররাণী অস্ত্রাগারের চাবি হস্তগত করেন। ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সিনিয়র টাইগারদের এর পরের পর্বের ইতিহাস অত্যন্ত করুণ ও মর্মান্তিক। টাইগার ক্যাপ্টেন হাফিজউদ্দিন আহমদ লিখেছেন, '৩০ মার্চ সকাল ৯টার সময় যশোর সেনানিবাসে পাকিস্তানি বাহিনী প্রথম বেঙ্গল রেজিমেন্টের ওপর অতর্কিতে তিনদিক থেকে আক্রমণ করে। এর আগে সকালে ব্রিগেডিয়ার দুররাণী ব্যাটালিয়ন অফিসে যান এবং কমান্ডিং অফিসার লে. কর্নেল জলিলকে বলেন যে, আমাদের ব্যাটালিয়নকে নিরস্ত্র করা হলো এবং আমাদের অস্ত্রশস্ত্র জমা দিতে হবে। তারপর ব্রিগেডিয়ার আমাদের ব্যাটালিয়ন অস্ত্রাগারে অস্ত্রশস্ত্র জমা করে চাবিগুলো হস্তগত করেন।' আর একই সময়ে পাকিস্তানি বাহিনী যশোরের পুলিশ লাইন ও ইপিআর সেক্টর সদরে বেপরোয়া আক্রমণ চালায়।

২৫ মার্চ রাতে চট্টগ্রামে বন্দি হন লে. কর্নেল এমআর চৌধুরী। তিনি পাকিস্তানিদের বিশ্বাস করেছিলেন। কিন্তু ২০ বেলুচ রেজিমেন্টের সেনারা তাঁকে নির্মমভাবে হত্যা করে সেই বিশ্বাসের জবাব দিয়েছিল। চট্টগ্রামে তখন পাকিস্তানি সেনা সংখ্যা ছিল শ তিনেক। আর ইপিআর তথা রাইফেলসের বাঙালি সৈনিকই ছিল প্রায় দেড় হাজার

পাকিস্তান বিমানবাহিনীর ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট পদ থেকে পদত্যাগকারী ও মুক্তিযুদ্ধের নৌ-কমান্ডের উপ-অধিনায়ক আহমদ রেজা 'একাত্তরের স্মৃতিচারণ' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, 'কর্নেল জলিলের অধীনস্থ রেজিমেন্ট পাকিস্তানি কমান্ডিং অফিসারের নির্দেশে যশোর সেনানিবাসে ফিরে যায় এবং সেখানে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী তাদের ঘিরে ফেলে ও হামলা চালায়। ফলে প্রথম বেঙ্গল রেজিমেন্ট প্রায় নিঃশেষ হয়ে যায়। মাত্র এক-দেড়শ সৈনিক কোনোমতে পালিয়ে যেতে সক্ষম হন। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন ক্যাপ্টেন হাফিজ। অবশ্য লে. কর্নেল জলিল ইতোমধ্যে আত্মসমর্পণ করে বন্দিত্বের বিনিময়ে জীবন রক্ষা করতে সমর্থ হন। পাকিস্তানে তিনি কর্নেল পদে উন্নীত হন। কর্নেল জলিল পঁচাত্তর-পরবর্তী সময়ে ক্রীড়া পরিষদের কর্মকর্তা ছিলেন দীর্ঘদিন।

দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট ছিল জয়দেবপুরে। অধিনায়ক বাঙালি লে. কর্নেল মাসুদের রেজিমেন্টটি ২২ মার্চ থেকেই একরকম বিদ্রোহ করে। মেজর মঈনুল হোসেন চৌধুরীর অধীনে রেজিমেন্টটির এই অংশটি এরই মধ্যে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ব্রিগেডিয়ার আবরারের বাঙালি নিরস্ত্রীকরণ প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দেয়। ২৫ ও ২৬ মার্চ ঢাকায় অপারেশন সার্চলাইট শুরুর পর তাঁরা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে অবস্থান ছেড়ে সরে যান। রেজিমেন্টের অপর দলটি মেজর শফিউল্লাহর অধীনে ক্যান্টনমেন্টের বাইরে ছিল। তাঁরই নেতৃত্বে সেনারা বিদ্রোহ করেন। এমন পরিস্থিতিতে লে. কর্নেল মাসুদ স্ত্রী, পুত্র-কন্যাসহ সেনানিবাসে নিজ গৃহে অবস্থান করছিলেন। তিনিও আত্মসমর্পণ করেন। পুরো নয় মাস তার পরিবারটি ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে ছিল মেজর জিয়ার পরিবারসহ। অধীনস্থ রেজিমেন্টের বিদ্রোহের দায়িত্ব তাকে গ্রহণ করতে হবে; তিনি তা উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। কিন্তু কেন–সে প্রশ্নের জবাব মেলেনি।

তৃতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট ছিল রংপুরে। যার অধিনায়ক ছিলেন পাকিস্তানি লে. কর্নেল ফজলুর রহমান। এখানে বাঙালি সেনারা সুবিধা করতে পারেননি।

চতুর্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট ছিল কুমিল্লায়। যার অধিনায়ক ছিলেন লে. কর্নেল খিজির হায়াত খান পাঞ্জাবি। উপ-অধিনায়ক হিসাবে মেজর খালেদ মোশাররফ ২৪ মার্চ দায়িত্ব গ্রহণ করেন। দায়িত্ব নেওয়ার পরপরই তাঁকে পাঠানো হয় একটি কোম্পানিসহ শমসেরনগর। আরেকটি কোম্পানি মেজর শাফায়েত জামিলের অধিনায়কত্বে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় অবস্থান করছিল। ২৭ মার্চ শাফায়েত জামিল অধিনায়ক খিজির হায়াত খানকে আটক করেন। এ দুটি কোম্পানি প্রথমেই বিদ্রোহ করে এবং পাকিস্তানি সেনাদের ওপর হামলা চালায়। প্রায় সবাই যুদ্ধে অংশ নেন।

অষ্টম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট ছিল চট্টগ্রামে। পাঞ্জাবি লে. কর্নেল রশিদ জানজুয়া ছিলেন এর অধিনায়ক। তবে এই ব্যাটালিয়নের উপ-অধিনায়ক ছিলেন বাঙালি মেজর জিয়াউর রহমান। এই বেঙ্গল ব্যাটালিয়নকেও পশ্চিম পাকিস্তানে পাঠানোর জন্য ২৫ মার্চের আগেই আদেশ জারি করা হয়েছিল। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাটালিয়নের এক কোম্পানি সেনা একজন পাঞ্জাবি অফিসারের নেতৃত্বে 'অ্যাডভান্সড পার্টি' বা অগ্রবর্তী দল হিসাবে পাকিস্তানের খাবিয়ান সেনানিবাসে চলে যায়। ব্যাটালিয়নের একটি কোম্পানিকে কর্নেল জানজুয়ার আদেশে 'সোয়াত' জাহাজ থেকে গোলাবারুদ খালাস করার জন্য চট্টগ্রাম বন্দরে নিয়োজিত রাখা ছিল। অবশিষ্টাংশ লে. কর্নেল জানজুয়ার অধীনে ষোলশহর নামক স্থানে প্রায় নিরস্ত্র অবস্থায় পাকিস্তান পাড়ি দেওয়ার জন্য দিন গুনছিল। কোনো ব্যাটালিয়নকে দেশের এক উইং থেকে অন্য উইংয়ে পাড়ি দেওয়ার প্রাক্কালে গাড়ি, অস্ত্রশস্ত্রসহ গোলাবারুদ জমা দিতে হয় নিয়মানুযায়ী, যা বদলি স্থানে যোগদানের পর পুনরায় পূরণ করা হয়। অষ্টম ইস্ট বেঙ্গলের এই ব্যাটালিয়নটির এই অবস্থা তখন। কেবল সৈনিকদের দৈনন্দিন প্রশিক্ষণের জন্য ন্যূনতম গাড়ি ও হাতিয়ার ছিল। এ ব্যাটালিয়নটি পুরোপুরি যুদ্ধোপযোগী ছিল না। সব মিলিয়ে রেজিমেন্টের প্রায় তিনশ বাঙালি তখন চট্টগ্রামে ছিল।

ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের রিক্রুটিং ট্রেনিং সেন্টারটি ছিল চট্টগ্রামের সেনানিবাসে। যার নাম ছিল 'ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টাল সেন্টার' বা 'ইবিআরসি'। একাত্তরের মার্চে এই সেন্টারে সব মিলিয়ে আড়াই হাজার সেনা ছিল। সেন্টার কমান্ড্যান্ট ছিলেন বাঙালি ব্রিগেডিয়ার এআর মজুমদার। আর প্রধান প্রশিক্ষক কর্মকর্তা ছিলেন বাঙালি লে. কর্নেল এমআর চৌধুরী। এছাড়া সেন্টারে বেশকিছু বাঙালি অফিসার অবস্থান করছিল। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল হামিদ ২৪ মার্চ পাঞ্জাবি ব্রিগেডিয়ার আনসারীকে নিয়ে হেলিকপ্টারে চড়ে চট্টগ্রাম যান। চট্টগ্রামের নিয়ন্ত্রণভার প্রদান করেন আনসারীকে ব্রিগেডিয়ার মজুমদারের স্থলে। আর মজুমদার ২৫ মার্চ আটক হন এবং পুরো নয় মাস বন্দিজীবন কাটান।

২৫ মার্চ রাতে চট্টগ্রামে বন্দি হন লে. কর্নেল এমআর চৌধুরী। তিনি পাকিস্তানিদের বিশ্বাস করেছিলেন। কিন্তু ২০ বেলুচ রেজিমেন্টের সেনারা তাঁকে নির্মমভাবে হত্যা করে সেই বিশ্বাসের জবাব দিয়েছিল। চট্টগ্রামে তখন পাকিস্তানি সেনা সংখ্যা ছিল শ তিনেক। আর ইপিআর তথা রাইফেলসের বাঙালি সৈনিকই ছিল প্রায় দেড় হাজার।

অষ্টম ইস্ট বেঙ্গল ব্যাটালিয়নের মাত্র ৩টি কোম্পানি ২৫ মার্চ ষোলশহরে অবস্থান করছিল। পাকিস্তানি ব্রিগেডিয়ার আনসারী রেজিমেন্টের অধিনায়ক জানজুয়াকে নির্দেশ দেন, যে কোনো মূল্যেই হোক সব অবরোধ পরিষ্কার করতে হবে। নির্দেশানুযায়ী জানজুয়া অষ্টম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টকে ষোলশহর থেকে সেনানিবাস পর্যন্ত সব ব্যারিকেড সরানোর কাজে নিয়োগ করলেন। হাজার হাজার জনতার বাধা সত্ত্বেও সেনারা ব্যারিকেড সরাতে বাধ্য হলো। রাত ৯টার মধ্যে তারা সব সরায়। এই ব্যাটালিয়নকে ছোটো ছোটো গ্রুপে বিভক্ত করে রাখা এবং বাঙালি অফিসারদের সৈনিকদের কাছ থেকে পৃথক করে রাখা, এমনকি সুযোগমতো হত্যা করার উদ্দেশ্যে ব্রিগেডিয়ার আনসারী

ও জানজুয়ারা পরিকল্পনা করে। তাই ২৫ মার্চ সন্ধ্যার পর ষোলশহর থেকে ব্যাটালিয়নের 'সি' কোম্পানিসহ মেজর মীর শওকতকে ট্রানজিট ক্যাম্পে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। মেজর জিয়াকে চট্টগ্রাম বন্দরে রিপোর্ট করার জন্য বলা হয়। এ বাঙালি সেনারাই পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। সঙ্গে ইপিআর বাহিনী। এই ব্যাটালিয়নের সব সেনাকে একত্রিত করে অধিনায়কত্ব নিজ হাতে নিয়েছিলেন মেজর জিয়া। তারা পাকিস্তানি বেশকিছু সেনাকে হত্যা করে। এ ব্যাটালিয়নটি চট্টগ্রামের বিভিন্ন স্থানে প্রতিরোধযুদ্ধ গড়ে তুলেছিল। তারা ১১ এপ্রিল পর্যন্ত চট্টগ্রামকে ধরে রাখে। কালুরঘাটে হেরে গিয়ে পিছু হটে। এখানে ক্যাপ্টেন হারুন আহমদ চৌধুরী গুরুতর আহতাবস্থায় দুজন সহযোদ্ধার সহায়তায় পেছনে সরে আসেন। আর আহতাবস্থায় লে. শমশের মবিন চৌধুরী পাকিস্তানিদের হাতে ধরা পড়েন। তিনি পুরো ৯ মাস ক্যান্টনমেন্ট হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। স্বাধীনতার পর তাকে জার্মানি পাঠানো হয় চিকিৎসার জন্য।

মুক্তিযুদ্ধের নৌ-কমান্ডোর উপ-অধিনায়ক আহমদ রেজার মনে হয়েছে, 'ইবিআরসির অধিকর্তা ব্রিগেডিয়ার মজুমদার ২৪ মার্চ চট্টগ্রাম থেকে ঢাকায় আসার পর বন্দি হন। তখনকার অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তার সেই সময় ঢাকায় আসার কোনো যুক্তিই সুবিবেচিত মনে হয়নি।' কিন্তু এমনটা কেন হলো, সে নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন পাকিস্তান বিমানবাহিনীর একদা ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট আহমদ রেজা। লিখেছেন, 'দুটি বেঙ্গল রেজিমেন্টের অধিকর্তা ও ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টাল সেন্টারের অধিকর্তা–এই তিনজন কেন এমন বিবেচনাহীন হলেন? জাতির প্রতি দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতার অপরাধ কী কেবল তাদের? ঢাকা সেনানিবাসে একক কোনো বাঙালি ইউনিট ছিল না। তাই ২৫ মার্চ বা এর পরবর্তী সময়ে সেখানে কোনো আক্রমণ, প্রতিরোধ বা প্রতি আক্রমণ ঘটেনি।'

১৯৭১-এর ২৫ মার্চ পর্যন্ত বাংলাদেশজুড়ে পাকিস্তানি সেনার অবস্থান ছিল ১০ থেকে ১২ হাজার। ২৫ মার্চ পর্যন্ত পাকিস্তানিদের শক্তি বলতে ছিল ১৪তম ডিভিশনের কয়েকটি ব্যাটালিয়ন মাত্র। সারা দেশে পাকিস্তানিদের ৪টি ব্রিগেড ছিল। এর মধ্যে ঢাকায় ৫৭তম ব্রিগেড, যশোরে ১০৭তম, রংপুরে ২৩তম ও কুমিল্লায় ৫৩তম ব্রিগেড। এই চার ব্রিগেডে যে সেনা ছিল, তা তুলনায় বেশি নয়। পদাতিক ব্যাটালিয়ন ছিল ১৫টি–যার মধ্যে ১১টি পাকিস্তানি ও ৪টি ইস্ট বেঙ্গল, ১টি আরমার বা ট্যাংক রেজিমেন্ট, ১টি কমান্ডো ব্যাটালিয়ন, ৫টি ফিল্ড রেজিমেন্ট আর্টিলারি, ১টি এফএফ ব্যাটারি বিমান বিধ্বংসী কামান এবং ২টি মর্টার ব্যাটারি (১২০ মি.মি. মর্টার)। এসব রেজিমেন্ট ৮টি ক্যান্টনমেন্টে অবস্থান করছিল।

ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে ছিল ২২তম বেলুচ রেজিমেন্ট, ১টি এফএফ ব্যাটালিয়ন, ১টি পাঞ্জাব ব্যাটালিয়ন ও দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট ব্যাটালিয়ন (জয়দেবপুর) এবং ২টি ফিল্ড রেজিমেন্ট আর্টিলারি। চট্টগ্রামে ছিল ২০তম বেলুচ রেজিমেন্ট ও অষ্টম ইস্ট বেঙ্গল ব্যাটালিয়নের অংশ। যশোরে ২৭তম বেলুচ রেজিমেন্ট, প্রথম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ২২তম ফ্রন্টিয়ার ফোর্স এবং ১টি ফিল্ড রেজিমেন্ট আর্টিলারি। রাজশাহীতে ২৫তম পাঞ্জাব রেজিমেন্ট। সৈয়দপুরে ২৬তম ফ্রন্টিয়ার ফোর্স রেজিমেন্ট ও তৃতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট। রংপুরে ১টি আরমার (ট্যাংক) রেজিমেন্ট, ১টি মর্টার ব্যাটারি ও ষষ্ঠ বেলুচ রেজিমেন্ট। সিলেটে ৩১তম পাঞ্জাব রেজিমেন্ট। কুমিল্লায় ছিল চতুর্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ১টি কমান্ডো ব্যাটালিয়ন, ১টি ফিল্ড রেজিমেন্ট আর্টিলারি ও ১টি মর্টার ব্যাটারি।

১৯৭১ সালের মার্চের মাঝামাঝি থেকে পুরো এপ্রিল পর্যন্ত সেনা সংখ্যা বাড়াতে থাকে পাকিস্তান। এ সময়ের মধ্যে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর নবম ও ষোড়শ ডিভিশন দুটিকে বাংলাদেশে আনা হয়। নবমকে পাঠানো হয় যশোর এবং ষোড়শকে উত্তরবঙ্গে। চতুর্দশ ডিভিশন ঢাকা ও ময়মনসিংহ এলাকায় গণহত্যা, নির্যাতন, লুটপাট, ধর্ষণ কাজে নিয়োজিত থাকে। ১৫ এপ্রিলের পর সামরিক জান্তারা ৩৬ ও ৩৯ ডিভিশন দুটিকেও বাংলাদেশে নিয়ে আসে। এদের বিভিন্ন জেলা পর্যায়ে দায়িত্ব দেওয়া হয় সামরিক প্রশাসকের তত্ত্বাবধানে।

ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের পাকিস্তানে যে তিনটি রেজিমেন্ট ছিল, সেখান থেকে অনেক মেজর ক্যাপ্টেন পালিয়ে এসে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন। বাকিরা ১৯৭৪ সালে দেশে ফেরত আসেন। মুক্তিযুদ্ধের প্রথম প্রহরে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট ছিন্নভিন্ন হয়ে গেলেও পুরো যুদ্ধকালে প্রতিরোধ গড়েছিল স্থায়ীভাবে সর্বত্র।

লেখক: একুশে পদকপ্রাপ্ত সাংবাদিক ও মহাপরিচালক
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)

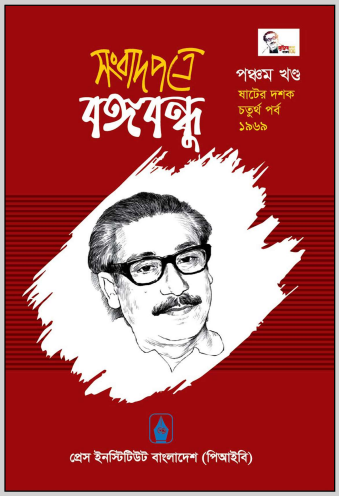

পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

বিএফইউজের সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী

সাংবাদিক নির্যাতন, পুলিশ হত্যা আন্তর্জাতিক অঙ্গনে তুলে ধরুন

জাতীয় প্রেস ক্লাবে বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতীয় প্রেস ক্লাবে বিএফইউজে প্রতিনিধি সম্মেলনে সাংবাদিক নির্যাতন ও পুলিশ হত্যার তীব্র নিন্দা জানিয়ে বলেছেন, এধরনের ঘটনা আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে তুলে ধরতে হবে যাতে করে বিএনপি ও তার অঙ্গসংগঠনের আসল চেহারা সবার সামনে ফুটে ওঠে।

শেখ হাসিনা বলেন, 'আমি সাংবাদিকদের বলব, এসব সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড এবং দায়িত্ব পালনকালে আপনাদের ওপর যারা আক্রমণ করেছে, তাদের আসল চরিত্র আন্তর্জাতিকভাবে আপনাদের তুলে ধরা উচিত।' তিনি বলেন, 'সাংবাদিকদের মাটিতে ফেলে পেটানোর মতো এ ধরনের ন্যক্কারজনক হামলার ঘটনা আর দেখা যায়নি। এর জবাব বিএনপিকে দিতে হবে।'

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২ নভেম্বর জাতীয় প্রেস ক্লাবে বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন (বিএফইউজে) আয়োজিত প্রতিনিধি সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে এসব কথা বলেন।

২৮ অক্টোবর বিএনপি'র সমাবেশে সাংবাদিক ও পুলিশের ওপর আক্রমণের তীব্র নিন্দা জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'কোনো কোনো পত্রিকা এটাকে আবার কভার দেওয়ারও চেষ্টা করেছে। তাদের ধিক্কার জানাই।' সেদিন গায়ের জ্যাকেটে 'প্রেস' স্টিকার লাগিয়ে যুবদলকর্মীর সন্ত্রাস ও অগ্নিসংযোগে অংশ নেওয়ার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'প্রকাশ্যে যারা এ ধরনের অপকর্ম করেছে, তারা ধরা পড়ে গেছে। সাংবাদিক নির্যাতন ও পুলিশ হত্যার শাস্তি এদের পেতেই হবে।' প্রধানমন্ত্রী নির্যাতিত ও ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত সাংবাদিকদের পাশে থাকার বিষয়েও সবাইকে আশ্বস্ত করেন।

অনেক মিডিয়ায় নবম ওয়েজ বোর্ড বাস্তবায়ন না হওয়াকে দুঃখজনক আখ্যায়িত করে প্রধানমন্ত্রী সাংবাদিকদের জন্য নতুন দশম ওয়েজ বোর্ড ঘোষণার প্রস্তুতি চলছে বলেও জানান। ভবিষ্যতে জেলায় জেলায় সাংবাদিকদের আবাসনের জন্য প্লট বরাদ্দের পরিকল্পনাও সরকারের রয়েছে বলে উল্লেখ করেন।

বিএফইউজে সভাপতি ওমর ফারুকের সভাপতিত্বে প্রতিনিধি সম্মেলন পরিচালনা করেন মহাসচিব দীপ আজাদ। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ। শোকপ্রস্তাব পাঠ করেন বিএফইউজের সহসভাপতি মধুসূদন মণ্ডল। অনুষ্ঠানে বিএফইউজের সাবেক সভাপতি ও মহাসচিবদের সম্মাননা দেওয়া হয়। সাংবাদিক নেতা ইকবাল সোবহান চৌধুরী, আবুল কালাম আজাদ, মনজুরুল আহসান বুলবুল, আব্দুল জলিল ভূঁইয়া, শাবান মাহমুদ এবং ওমর ফারুক প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে এই সম্মাননা গ্রহণ করেন।

সারা দেশ থেকে যোগ দেওয়া সাংবাদিক ইউনিয়ন নেতাদের মধ্যে বক্তব্য দেন সোহেল হায়দার চৌধুরী, আব্দুস সালাম খোকন, আতাউল কবির খোকন, ম. শামসুল ইসলাম, আবু তাহের, ফারুক আহমেদ, মনতোষ বসু, রাশেদুল ইসলাম বিপ্লব, রফিকুল ইসলাম, আমজাদ হোসেন শেখ মিন্টু, ওয়াহিদুল ইসলাম, কেএম মনিরুল আলম স্বপন খন্দকার, আতাউর রহমান ও দীপক চৌধুরী বাপ্পি।

সূত্র: ৩ নভেম্বর ২০২৩, কালের কণ্ঠ ও সমকাল

তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব পেলেন মোহাম্মদ আলী আরাফাত

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব পেয়েছেন মোহাম্মদ আলী আরাফাত *এম.পি*। তিনি মোহাম্মদ এ. আরাফাত নামে সুপরিচিত। ১১ জানুয়ারি রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন বঙ্গভবনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং অন্যান্য মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীদের শপথবাক্য পাঠ করান।

মোহাম্মদ আলী আরাফাত আওয়ামী লীগের পরপর দু'বারের সংসদ সদস্য। ৭ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তিনি ঢাকা-১৭ আসন

থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। এর আগে একই আসন থেকে একাদশ জাতীয় সংসদে উপনির্বাচনে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন।

মোহাম্মদ আলী আরাফাত একজন শিক্ষাবিদ ও রাজনীতিবিদ। তিনি ২০২২ সালের ডিসেম্বরে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য মনোনীত হন। তাঁর জন্ম রাজশাহীতে। তাঁর পিতা মোহাম্মদ সেতাব উদ্দিন বাংলাদেশ বেতারের পরিচালক ছিলেন।

মোহাম্মদ আলী আরাফাতের শিক্ষাজীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হলো ওকলাহোমা স্টেট ইউনিভার্সিটি এবং প্রেইরি ভিউ এঅ্যান্ডএম বিশ্ববিদ্যালয়ে। তিনি কানাডিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশের একজন সিন্ডিকেট সদস্য এবং ট্রাস্টি বোর্ডের প্রধান উপদেষ্টা। মুক্তচিন্তা বিকাশে তিনি সুচিন্তা ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করেছেন।

দায়িত্ব গ্রহণের পর তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী আরাফাত বলেছেন, 'আমরা গুজব ও অপতথ্যমুক্ত গণমাধ্যম চাই। যেখানে শুধু তথ্যের অবাধ প্রবাহ থাকবে। গণমাধ্যম সরকার বা অথরিটিকে অবশ্যই প্রশ্ন করবে এবং সেই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার সুযোগ থাকতে হবে। শুধু প্রশ্ন নয়, সমালোচনারও সুযোগ থাকতে হবে। তবে সেই সমালোচনা যেন সঠিক তথ্যের ওপর হয়, সেই বিষয়ে আমরা জোর দিতে চাই।'

প্রতিমন্ত্রী আরও বলেছেন, 'গণমাধ্যম যে প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে পরিচালিত হয় সেটি যাতে টিকে থাকে, একইসঙ্গে প্রতিষ্ঠানটিতে যারা কাজ করে তারাও যাতে টিকে থাকে সে উদ্যোগ নেওয়া হবে। তাহলে এক ধরনের ভারসাম্য থাকবে। তিনি বলেছেন, 'গণমাধ্যমে আরও পেশাদারিত্ব ও স্বচ্ছতা আনা প্রয়োজন। এ বিষয়গুলো অনতিবিলম্বে নজর দিতে হবে। গণমাধ্যমের অপব্যবহার কখনোই কাম্য নয়। এ বিষয়ে মালিক-সাংবাদিক সব পক্ষেরই সহযোগিতা প্রয়োজন।' মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর বক্তব্য সাংবাদিকসহ সংশ্লিষ্ট মহলের জন্য শুভবার্তা বহন করে।

মোহাম্মদ আলী আরাফাত বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও চ্যালেঞ্জ, ট্রানজিট ও যোগাযোগ, বিদ্যুৎ খাতের জন্য উপযুক্ত নীতি, যুদ্ধাপরাধের বিচার, রাজনৈতিক উন্নয়ন, বাংলাদেশে গণতন্ত্র প্রভৃতি বিষয়ের ওপর লেখালেখি করেন। তিনি বিভিন্ন সভা-সেমিনার-টকশো'র একজন সুবক্তা। প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর পক্ষ থেকে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী আরাফাতকে অভিনন্দন।

জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার ২০২২ প্রদান

দেশীয় চলচ্চিত্রে অবদানের জন্য সর্বোচ্চ পুরস্কার 'জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার-২০২২' বিজয়ীদের হাতে তুলে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এ সময় প্রধানমন্ত্রী জানান, তিনি টাকার হিসাব করেন না। বরং দেশের চলচ্চিত্র যাতে মাথা তুলে

প্রধানমন্ত্রীর হাত থেকে আজীবন সম্মাননা পুরস্কার গ্রহণ করছেন চিত্রনায়িকা রোজিনা

দাঁড়াতে পারে, শিল্পীরা যাতে ভালোভাবে কাজ করতে পারেন, সেটাই তাঁর চাওয়া।

১৪ নভেম্বর সন্ধ্যায় রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার প্রদান শেষে চলচ্চিত্র নিয়ে অনেক কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী। বিএফডিসি কমপ্লেক্স নির্মাণের ব্যয় প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'টাকার অঙ্ক দিয়ে হিসাব করি না, আমাদের শিল্পীরা যাতে ভালো করে কাজ করতে পারেন, সেটাই চাই। আমরা গাজীপুরে ফিল্ম সিটি প্রতিষ্ঠা করেছি। এটাও বঙ্গবন্ধু চিন্তা করেছিলেন। এটার প্রথম পর্বের কাজ শেষ হয়ে গেছে। দ্বিতীয় পর্বের কাজও হচ্ছে। সেখানে সব ধরনের শুটিং যাতে করা যায়, সেই ব্যবস্থা থাকবে। আমরা চাই–দেশের অঙ্গন ছাড়িয়ে আমাদের চলচ্চিত্র বিদেশেও সমাদৃত হোক। সেই সঙ্গে শিল্পী-কুশলী সবাইকে আমি এই আহ্বান জানাই–এদিকে আরও মনোযোগ দিন। যেহেতু মানুষের জীবনে সচ্ছলতা এসেছে, তাই তারা বিনোদনের দিকে ঝুঁকছে।'

বক্তব্যের একপর্যায়ে বঙ্গবন্ধুর বায়োপিক 'মুজিব: একটি জাতির রূপকার' ছবির শিল্পীদের প্রশংসা করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'নির্মাতা-শিল্পীরা প্রত্যেকেই চমৎকার কাজ করেছেন। বিশেষ করে অভিনয়শিল্পীরা, তাঁরা চমৎকার অভিনয় করেছেন। সম্পূর্ণ অন্তর দিয়ে কাজ করেছেন। এজন্য সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। আশা করি, এটা বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের ইতিহাসে বড়ো অর্জন হয়ে থাকবে।'

অনুষ্ঠানে তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদের সভাপতিত্বে স্বাগত বক্তব্য দেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মো. হুমায়ুন কবীর খোন্দকার। বিশেষ অতিথির বক্তব্য দেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি হাসানুল হক ইনু।

৩১ অক্টোবর তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের এক প্রজ্ঞাপনে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারপ্রাপ্তদের তালিকা প্রকাশ করা হয়। চলচ্চিত্র শিল্পে গৌরবোজ্জ্বল ও অসাধারণ অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে ২৭টি ক্ষেত্রে বিশিষ্ট শিল্পী ও কলাকুশলী এবার জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার পেয়েছেন।

পুরস্কার পেলেন যারা: *'হাওয়া' চলচ্চিত্রে প্রধান চরিত্রে অভিনয়ের জন্য সুচিন্ত্য চৌধুরী (চঞ্চল চৌধুরী) শ্রেষ্ঠ অভিনেতা এবং যৌথভাবে শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর পুরস্কার পেয়েছেন 'বিউটি সার্কাস'-এর জন্য জয়া আহসান ও 'শিমু'র জন্য রিকিতা নন্দিনী শিমু। যুগ্মভাবে শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র পুরস্কার পেয়েছে মুহাম্মদ আব্দুল কাইউম প্রযোজিত চলচ্চিত্র 'কুড়া পক্ষীর শূন্যে উড়া' এবং মো. তামজিদ উল আলম প্রযোজিত 'পরাণ'।*

আজীবন সম্মাননা অভিনেতা খসরু (বীর মুক্তিযোদ্ধা কামরুল আলম খান খসরু) এবং অভিনেত্রী রোজিনা (রওশন আরা রোজিনা)। অভিনেতা খসরুর অনুপস্থিতিতে তাঁর পক্ষে সম্মাননা গ্রহণ করেন চিত্রনায়ক আলমগীর।

শ্রেষ্ঠ স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র এসএম কামরুল আহসান প্রযোজিত 'ঘরে ফেরা'। শ্রেষ্ঠ প্রামাণ্য চলচ্চিত্র ড. এ জে এম শফিউল আলম ভূঁইয়া প্রযোজিত 'বঙ্গবন্ধু ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়'। পার্শ্বচরিত্রে শ্রেষ্ঠ অভিনেতা মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন খান (পরাণ), পার্শ্বচরিত্রে শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী আফসানা করিম (আফসানা মিমি) (পাপ-পুণ্য), খলচরিত্রে শ্রেষ্ঠ অভিনেতা সুভাশিষ ভৌমিক (দেশান্তর), কৌতুক চরিত্রে শ্রেষ্ঠ অভিনেতা মো. সাইফুল ইমাম (দীপু ইমাম) (অপারেশন সুন্দরবন), শ্রেষ্ঠ শিশুশিল্পী যৌথভাবে বৃষ্টি আক্তার (রোহিঙ্গা) ও মুনতাহা এমিলিয়া (বীরত্ব), শিশুশিল্পী শাখায় বিশেষ পুরস্কার মোছা. ফারজিনা আক্তার (কুড়া পক্ষীর শূন্যে উড়া), শ্রেষ্ঠ সংগীত পরিচালক মাহমুদুল ইসলাম খান (রিপন খান) (পায়ের ছাপ), যৌথভাবে শ্রেষ্ঠ গায়ক শুভাশীষ মজুমদার বাপ্পা (বাপ্পা মজুমদার) (অপারেশন সুন্দরবন, গান: এ মন ভিজে যায়) ও চন্দন সিনহা (হৃদিতা, গান: ঠিকানাবিহীন তোমাকে), শ্রেষ্ঠ গায়িকা আতিয়া আক্তার আনিসা (পায়ের ছাপ, গান: এ শহরের পথে পথে), শ্রেষ্ঠ গীতিকার রবিউল ইসলাম জীবন (পরাণ, গান: ধীরে ধীরে তোর স্বপ্নে), শ্রেষ্ঠ সুরকার শওকত আলী ইমন (পায়ের ছাপ, গান: এ শহরের পথে পথে), শ্রেষ্ঠ কাহিনিকার ফরিদুর রেজা সাগর (দামাল), শ্রেষ্ঠ চিত্রনাট্যকার মুহাম্মদ আব্দুল কাইউম (কুড়া পক্ষীর শূন্যে উড়া), শ্রেষ্ঠ সংলাপ এসএ হক অলিক (গলুই), শ্রেষ্ঠ সম্পাদক সুজন মাহমুদ (শিমু),

রাজধানীর শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনে ১৯ নভেম্বর তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদসহ অতিথিদের সঙ্গে ডিআরইউ অ্যাওয়ার্ড বিজয়ীরা

শ্রেষ্ঠ শিল্পনির্দেশক হিমাদ্রি বড়ুয়া (রোহিঙ্গা), শ্রেষ্ঠ চিত্রগ্রাহক আসাদুজ্জামান (মজনু) (রোহিঙ্গা), শ্রেষ্ঠ শব্দগ্রাহক রিপন নাথ (হাওয়া), শ্রেষ্ঠ পোশাক ও সাজসজ্জায় তানসিনা শাওন (শিমু) এবং শ্রেষ্ঠ মেকাপম্যান মো. খোকন মোল্লা (অপারেশন সুন্দরবন) পুরস্কার পেয়েছেন। সূত্র: ১৫ নভেম্বর ২০২৩, দৈনিক ইত্তেফাক

ডিআরইউ অ্যাওয়ার্ড পেলেন ২০ সাংবাদিক

ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি (ডিআরইউ) অ্যাওয়ার্ড-২০২৩ জিতেছেন প্রিন্ট, টেলিভিশন, রেডিয়ো এবং অনলাইন মিডিয়ার ২০ প্রতিবেদক। ১৯টি 'বিশেষ প্রতিবেদন' এ বছর শ্রেষ্ঠ হিসাবে পুরস্কৃত হয়েছে। ১৯ নভেম্বর রাজধানীর শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কারের ক্রেস্ট ও সনদ তুলে দেন তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ।

অনুষ্ঠানে ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, 'অনেক কষ্ট করে রিপোর্ট তৈরি করে আনেন প্রতিবেদক। অনেক রিপোর্ট আলোর মুখ দেখে না–এমন ঘটনাও ঘটে। এক্ষেত্রে মালিকপক্ষের হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়।' ডিআরইউ সভাপতি মুরসালিন নোমানীর সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক মাইনুল হাসান সোহেলের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন সেরা রিপোর্ট বাছাইয়ে গঠিত জুরি বোর্ডের চেয়ারম্যান শাজাহান সরদার, আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংকের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট জালাল আহমেদ। অনুষ্ঠানে প্রিন্ট ও অনলাইন বিভাগে ১৪ ক্যাটাগরিতে ১৪ জন, টেলিভিশন ও বেতার বিভাগে দুই ক্যাটাগরিতে তিনজন এবং তিনটি বিশেষ ক্যাটাগরিতে তিনজনকে পুরস্কৃত করা হয়। প্রিন্ট ও অনলাইন এবং টেলিভিশন ক্যাটাগরিতে পুরস্কারের অর্থমূল্য ৫০ হাজার টাকা। বিশেষ ক্যাটাগরির পুরস্কারের অর্থমূল্য ১ লাখ টাকা।

প্রিন্ট ও অনলাইন বিভাগে মুক্তিযুদ্ধ, ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি ক্যাটাগরিতে সমকালের আবু সালেহ রনি; বৈদেশিক সম্পর্ক (কূটনীতি ও জনশক্তি) বিষয়ে সমকালের রাজীব আহাম্মদ; 'নারী, শিশু ও মানবাধিকারে ভোরের কাগজের ঝর্না মণি; সুশাসন ও দুর্নীতিতে (অনুসন্ধানী) প্রথম আলোর আরিফুর রহমান; শিক্ষায় নিউ এজের শাহীন আক্তার; অপরাধ ও আইনশৃঙ্খলায় ঢাকা পোস্টের আদনান রহমান; তথ্য, যোগাযোগ ও প্রযুক্তিতে দৈনিক জনকণ্ঠের রহিম শেখ, ক্রীড়ায় কালের কণ্ঠের রাহেনুর ইসলাম, স্বাস্থ্যে যুগান্তরের হক ফারুক আহমেদ; সেবা খাতে প্রতিদিনের বাংলাদেশের ফয়সাল খান; কৃষি ও পরিবেশে চ্যানেল আই অনলাইনের আরেফিন তানজীব; আর্থিক খাতে (ব্যাংক, বিমা ও পুঁজিবাজার) কালবেলার ইউসুফ আরেফিন; রাজনীতি, প্রশাসন, বিচার, সংসদ ও নির্বাচন কমিশনে জাগো নিউজের জাহাঙ্গীর আলম এবং বিদ্যুৎ ও জ্বালানি ক্যাটাগরিতে শেয়ার বিজের ইসমাইল আলী শ্রেষ্ঠ রিপোর্টারের পুরস্কার পেয়েছেন।

টেলিভিশন ও রেডিয়ো বিভাগে শ্রেষ্ঠ রিপোর্টারের পুরস্কার পেয়েছেন কৃষি ও পরিবেশ বিষয়ে যৌথভাবে চ্যানেল টোয়েন্টিফোরের মাকসুদ উন নবী ও মাছরাঙা টেলিভিশনের আবু জাহেদ মুহ. সেলিম এবং নারী, শিশু ও মানবাধিকার ক্যাটাগরিতে চ্যানেল টোয়েন্টিফোরের মাসউদুর রহমান।

বিজিএমইএ-এর সৌজন্যে তিনটি পুরস্কার দেওয়া হয়–পোশাক খাতে সারাবাংলা ডটনেটের এমদাদুল হক তুহিন, সামগ্রিক অর্থনীতিতে ফিন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেসের দৌলত আক্তার মালা এবং অর্থনীতিতে অনুসন্ধান ক্যাটাগরিতে জসিম উদ্দিন হারুন শ্রেষ্ঠ রিপোর্টারের পুরস্কার পেয়েছেন। সূত্র: ২০ নভেম্বর ২০২৩, সমকাল

লতিফুর রহমান পুরস্কার পেলেন সাংবাদিক শিশির মোড়ল

প্রথম আলোর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মিডিয়া স্টার লিমিটেড ও ট্রান্সকম গ্রুপের প্রয়াত চেয়ারম্যান লতিফুর রহমানের নামে চালু করা বর্ষসেরা সাংবাদিকতার পুরস্কার পেয়েছেন শিশির মোড়ল। তিনি প্রথম আলোর বিশেষ প্রতিনিধি। দেশের স্বাস্থ্য খাত নিয়ে নিয়মিত প্রতিবেদন করেন। প্রথম আলোয় তিনি ১৭ বছর ধরে কাজ করছেন।

প্রথম আলোর রজতজয়ন্তী উপলক্ষ্যে ১৭ নভেম্বর রাজধানীর র‍্যাডিসন ব্লু ওয়াটার গার্ডেনে আয়োজিত সুধী সমাবেশে শিশির মোড়লের হাতে এ পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। (সূত্র: ১৮ নভেম্বর ২০২৩, প্রথম আলো)

পুরস্কার পেলেন তিন আদিবাসী গণমাধ্যমকর্মী

আদিবাসী ও দলিত জনগোষ্ঠীর মানবাধিকার সুরক্ষা এবং সংস্কৃতি বিকাশের লক্ষ্যে গণমাধ্যমে প্রকাশিত নির্বাচিত প্রতিবেদন ও নিবন্ধের জন্য তিন আদিবাসী গণমাধ্যমকর্মীকে পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। বেসরকারি সংস্থা নাগরিক উদ্যোগ এবং আদিবাসীদের অনলাইন সংবাদমাধ্যম ইন্ডিজেনাস পিপলস নিউজের (আইপি নিউজ) উদ্যোগে এ পুরস্কার দেওয়া হয়।

আদিবাসী ও দলিতবিষয়ক প্রতিবেদন-নিবন্ধের জন্য প্রথম পুরস্কার পান ডেইলি স্টারের প্রতিবেদক মিন্টু দেশোয়ারা। দ্বিতীয় পুরস্কার পান বান্দরবানের উচিথোয়াই মারমা এবং তৃতীয় পুরস্কার পান উজ্জ্বল মাহাতো। উচিথোয়াই ও উজ্জ্বল আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অধিকার নিয়ে কাজ করেন।

এ উপলক্ষ্যে ২১ ডিসেম্বর রাজধানীর বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র মিলনায়তনে 'আদিবাসী ও দলিতবিষয়ক শ্রেষ্ঠ প্রতিবেদন-নিবন্ধ' পুরস্কার অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে অতিথি ছিলেন প্রথম আলোর যুগ্মসম্পাদক কবি সোহরাব হাসান, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. আইনুন নাহার, বিশিষ্ট লেখক ও সাংবাদিক আলতাফ পারভেজ এবং বাংলাদেশ আদিবাসী নারী নেটওয়ার্কের সমন্বয়ক ফাল্গুনী ত্রিপুরা।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন আইপি নিউজের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক অ্যান্টনী রেমা এবং অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন নাগরিক উদ্যোগের প্রতিনিধি নাদিরা পারভীন। সূত্র: ২৬ ডিসেম্বর ২০২৩, সমকাল

ডুজা রিপোর্টার্স অ্যাওয়ার্ড পেলেন ছয় সাংবাদিক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতির (ডুজা) দ্বিতীয় রিপোর্টার্স আড্ডা এবং প্রথম দ্বিমাসিক

রিপোর্টার্স অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হয়েছে। ২৫ ডিসেম্বর সমিতির কার্যালয়ে এ আয়োজনে সভাপতিত্ব করেন ডুজা সভাপতি আল সাদী ভূঁইয়া। অতিথি হিসাবে সাবেক সভাপতি বোরহানুল হক সম্রাট এবং সাবেক সাধারণ সম্পাদক মাহমুদুল হাসান নয়ন পুরস্কার তুলে দেন। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন ডুজার সাধারণ সম্পাদক মহিউদ্দিন মুজাহিদ মাহি।

এ আয়োজনে ১০ আগস্ট থেকে ১০ অক্টোবর পর্যন্ত বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদনের ওপর ভিত্তি করে ছয়জনকে চারটি অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হয়। এতে 'গবেষণায় অপ্রতুল বরাদ্দ, তাও অর্ধেক খরচ হয়নি' শিরোনামে প্রতিবেদনের জন্য প্রথম হন সমকালের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি যোবায়ের আহমদ। এছাড়া দেশ রূপান্তরের ঢাবি প্রতিনিধি আমজাদ হোসেন হৃদয় ও ইনকিলাবের রাহাদ উদ্দীন যৌথভাবে দ্বিতীয় হন। ঢাকা পোস্টের খালিদ হাসান তৃতীয় এবং ভোরের কাগজের রাফিউজ্জামান লাবীব ও দৈনিক ইত্তেফাকের নেছার উদ্দিন যৌথভাবে চতুর্থ হন। সূত্র: ২৬ ডিসেম্বর ২০২৩, সমকাল

ডিআরইউর সভাপতি শুকুর আলী শুভ সাধারণ সম্পাদক মহিউদ্দিন

সাংবাদিক সংগঠন ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির (ডিআরইউ) নির্বাচনে সভাপতি সৈয়দ শুকুর আলী শুভ এবং সাধারণ সম্পাদক মহিউদ্দিন নির্বাচিত হয়েছেন। ৩০ নভেম্বর দিনভর ভোটগ্রহণের পর সন্ধ্যায় এ ফল ঘোষণা করেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক মনজুরুল আহসান বুলবুল।

সহসভাপতি শফিকুল ইসলাম শামীম, যুগ্মসম্পাদক মো. মিজানুর রহমান (মিজান রহমান), অর্থ সম্পাদক মো. জাকির হুসাইন, সাংগঠনিক সম্পাদক খালিদ সাইফুল্লাহ, দপ্তর সম্পাদক রফিক রাফি, নারীবিষয়ক সম্পাদক মাহমুদা ডলি, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক সুশান্ত কুমার সাহা, তথ্যপ্রযুক্তি ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক মো. রাশিম (রাশিম মোল্লা), ক্রীড়া সম্পাদক মো. মাহবুবুর রহমান, আপ্যায়ন সম্পাদক মোহাম্মদ ছলিম উল্লাহ এবং কল্যাণ সম্পাদক পদে মো. তানভীর আহমেদ নির্বাচিত হয়েছেন।

প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে কেক কাটছেন জাতীয় প্রেস ক্লাবের সভাপতি ফরিদা ইয়াসমিন, সাধারণ সম্পাদক শ্যামল দত্তসহ জ্যেষ্ঠ সদস্যরা

এছাড়া কার্যনির্বাহী সদস্য পদে (সাতটি) দেলোয়ার হোসেন মহিন, ফারহানা ইয়াসমিন (জুথী), মো. হাবিবুর রহমান (হাবিব রহমান), মো. শরিফুল ইসলাম, মুহিববুল্লাহ মুহিব, রফিক মৃধা এবং সাঈদ শিপন নির্বাচিত হয়েছেন। সাংস্কৃতিক সম্পাদক পদে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিজয়ী হন মো. মনোয়ার হোসেন। সূত্র: ১ ডিসেম্বর ২০২৩, দৈনিক ইত্তেফাক

জাতীয় প্রেস ক্লাবের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্‌যাপিত

কেক কাটা, মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, নৈশভোজ ও আকর্ষণীয় র‍্যাফল ড্রয়ের মধ্য দিয়ে ২০ অক্টোবর জাতীয় প্রেস ক্লাবের ৬৯তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হয়েছে।

প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে প্রেস ক্লাব ভবন ও প্রাঙ্গণ নান্দনিক আলোকসজ্জায় সাজানো হয়। বিকাল থেকে সদস্যদের পদচারণায় মুখর হয়ে ওঠে ক্লাব প্রাঙ্গণ। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের প্রধান আকর্ষণ ছিলেন বরেণ্য সংগীতশিল্পী সাবিনা ইয়াসমিন।

ক্লাবের যুগ্মসম্পাদক আইয়ুব ভুঁইয়ার সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ, জাতীয় প্রেস ক্লাবের সভাপতি ফরিদা ইয়াসমিন ও সাধারণ সম্পাদক শ্যামল দত্ত বক্তব্য দেন।

এর আগে সপ্তাহব্যাপী ক্লাব সদস্য, তাঁদের স্ত্রী ও সন্তানদের নিয়ে বিভিন্ন ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ১৩ অক্টোবর শিশু আনন্দমেলার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয় এবং ২০ অক্টোবর মিনি ম্যারাথনের মধ্য দিয়ে সপ্তাহব্যাপী ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা সমাপ্ত হয়। মিনি ম্যারাথন শেষে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী জাহিদ আহসান রাসেল।

এছাড়া সপ্তাহব্যাপী বিভিন্ন আয়োজনে বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন ক্লাবের সভাপতি ফরিদা ইয়াসমিন ও সাধারণ সম্পাদক শ্যামল দত্ত। সূত্র: ২১ অক্টোবর ২০২৩, প্রথম আলো

ঢাকা সাংবাদিক পরিবার বহুমুখী সমবায় সমিতি

সভাপতি আল-মামুন সম্পাদক মফিজুর রহমান

ঢাকা সাংবাদিক পরিবার বহুমুখী সমবায় সমিতি লিমিটেডের নির্বাচনে আবারও সভাপতি পদে মোহাম্মদ আল-মামুন (দৈনিক ইত্তেফাক) ও সম্পাদক পদে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মো. মফিজুর রহমান খান বাবু নির্বাচিত হয়েছেন। ২৮ নভেম্বর জাতীয় প্রেস ক্লাব মিলনায়তনে এ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ফল ঘোষণা করেন সমিতির নির্বাচন কমিশনের সভাপতি জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক মনজুরুল আহসান বুলবুল।

অন্য পদে নির্বাচিতরা হলেন সহসভাপতি এসএম মোশারফ হোসেন (বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতা), যুগ্মসম্পাদক পলি খান, কোষাধ্যক্ষ মো. মোশারফ হোসেন এবং ছয়টি পরিচালক পদে রাজেন্দ্র চন্দ্র দেব মন্টু, গোলাম নবী, ফজলুল হক বাবু, মো. সাজেদুল

ইসলাম (রাজু শিকদার), জয়নাল আবেদীন, আসলাম ইকবাল ও মনিরুল ইসলাম মানিক।

সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ। ঢাকা সাংবাদিক পরিবার বহুমুখী সমবায় সমিতি লিমিটেডের সভাপতি মোহাম্মদ আল-মামুনের সভাপতিত্বে ও সম্পাদক মো. মফিজুর রহমান খান বাবুর সঞ্চালনায় বিএফইউজের সভাপতি ওমর ফারুক, মহাসচিব দীপ আজাদ, জাতীয় প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক শ্যামল দত্ত, ডিইউজের সভাপতি সোহেল হায়দার চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক আকতার হোসেন, সিনিয়র সাংবাদিক মনজুরুল আহসান বুলবুল সভায় বিশেষ অতিথির বক্তৃতা করেন এবং মন্ত্রীর হাতে স্মারক সম্মাননা তুলে দেন। সূত্র: ২৯ নভেম্বর ২০২৩, কালের কণ্ঠ

বিএফইউজের (একাংশ) নির্বাচনে গাজী-গনি জয়ী

বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন-বিএফইউজের (একাংশ) নির্বাচনে সবকটি পদে জয় পেয়েছে গাজী-গনি পরিষদ। ২৯ ডিসেম্বর জাতীয় প্রেস ক্লাবে এ ভোট হয়। নির্বাচন পরিচালনা বোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন সাংবাদিক কায়কোবাদ মিলন।

সহসভাপতি পদে একেএম মহসিন, ওবায়দুর রহমান শাহীন ও মুহাম্মদ খায়রুল বাশার, সহকারী মহাসচিব পদে এহতেশামুল হক শাওন, ড. সাদিকুল ইসলাম স্বপন ও বাছির জামাল, কোষাধ্যক্ষ শহীদুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক এরফানুল হক নাহিদ, দপ্তর সম্পাদক আবু বকর এবং প্রচার সম্পাদক পদে শাজাহান সাজু নির্বাচিত হয়েছেন।

নির্বাহী সদস্য পদে বিজয়ীরা হলেন শাহীন হাসনাত, মোদাব্বের হোসেন, অর্পণা রায়, মুহাম্মদ আবু হানিফ, ম. হামিদুল হক মানিক, মির্জা সেলিম রেজা ও আব্দুর রাজ্জাক বাচ্চু। সূত্র: ৩০ ডিসেম্বর ২০২৩, সমকাল

নারী সাংবাদিক কেন্দ্র চট্টগ্রাম বিভাগীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ নারী সাংবাদিক কেন্দ্র (বিএনএসকে) চট্টগ্রাম বিভাগীয় সম্মেলন ১৩ অক্টোবর নগরীর একটি রেস্টুরেন্টে অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে সংগঠনের চট্টগ্রাম বিভাগীয় ১১ সদস্যের কার্যকরী কমিটি ঘোষণা করা হয়। কমিটির সদস্যরা হলেন সভাপতি ডেইজী মউদুদ, সহসভাপতি শামীম আরা লুসি ও ইয়াসমিন রীমা, সাধারণ সম্পাদক লতিফা আনসারী রুনা, যুগ্মসম্পাদক চিংমেপ্রু মারমা, সাংগঠনিক সম্পাদক ফেরদৌস লিপি, অর্থ সম্পাদক শারমিন সুমি, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক নিলা চাকমা এবং সদস্য ইয়াসমিন ইউসুফ, আসমা বীথি, মরিয়ম জাহান মুন্নি ও মারজান আক্তার।

সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে দৈনিক আজাদী সম্পাদক এমএ মালেক বলেন, অতীতের তুলনায় এখন সাংবাদিকতায় নারীর অংশগ্রহণ বেড়েছে। এ সংখ্যা আরও বাড়াতে হবে। বিএনএসকে কেন্দ্রীয় সভাপতি নাসিমুন আরা হক মিনু প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া সম্পাদকদের প্রতি ৩০ শতাংশ নারীকর্মী নিয়োগের আহ্বান জানান। চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাব সভাপতি সালাউদ্দিন মো. রেজা বলেন, সাংবাদিকতার মতো ঝুঁকিপূর্ণ পেশায় নারীর অংশগ্রহণ বাড়লেও তাঁরা লেগে থাকতে চান না। একপর্যায়ে ঝরে যান।

অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক দেবদুলাল ভৌমিক এবং সিইউজে সাধারণ সম্পাদক ম. শামসুল ইসলাম। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন দীপ্ত টিভির চট্টগ্রাম ব্যুরোপ্রধান লতিফা আনসারী রুনা। সূত্র: ১৪ অক্টোবর ২০২৩, দৈনিক ইত্তেফাক

অনলাইন নিউজ পোর্টাল অ্যাসোসিয়েশন

সভাপতি আমজাদ হোসেন সম্পাদক শাহীন চৌধুরী

সরকার নিবন্ধিত অনলাইন নিউজ পোর্টাল মালিকদের সংগঠন 'ওনাব'-এর নির্বাচনে ইপিবিডি ডটকমের সম্পাদক মোল্লাহ এম আমজাদ হোসেন সভাপতি এবং এবিনিউজ২৪বিডি ডটকমের সম্পাদক শাহীন চৌধুরী সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন।

নির্বাচিত অন্যরা হলেন সহসভাপতি লতিফুল বারী হামিম ও সৌমিত্র দেব। যুগ্মসম্পাদক মো. সিদ্দিকুর রহমান ও মো. আশরাফুল কবির এবং কোষাধ্যক্ষ মো. মোস্তাকিম সরকার। নির্বাচিত নির্বাহী পরিষদ সদস্যরা হলেন নজরুল ইসলাম মিঠু, তৌহিদুল ইসলাম মিন্টু, রফিকুল বাসার, অধ্যাপক অপু উকিল, হামিদ মো. জসিম, অয়ন আহমেদ, মহসিন হোসেন ও খোকন কুমার রায়।

প্রধান নির্বাচন কমিশনারের দায়িত্ব পালন করেন সিনিয়র সাংবাদিক ইউএনবির ফরিদ হোসেন, গ্লোবাল টিভির সৈয়দ ইশতিয়াক রেজা এবং জাতীয় প্রেস ক্লাবের নির্বাহী কমিটির সদস্য জুলহাস আলম। এর আগে সকালে জাতীয় প্রেস ক্লাবে সংগঠনের সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সূত্র: ৮ অক্টোবর ২০২৩, দৈনিক ইত্তেফাক

সিএমজেএফ সভাপতি গোলাম সামদানী সম্পাদক আবু আলী

পুঁজিবাজার নিয়ে কাজ করা সাংবাদিকদের সংগঠন ক্যাপিটাল মার্কেট জার্নালিস্ট ফোরামের (সিএমজেএফ) সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন সারাবাংলা ডটনেটের স্পেশাল করেসপনডেন্ট গোলাম সামদানী ভূইয়া। সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন আমাদের সময়ের সিনিয়র রিপোর্টার আবু আলী। তাঁরা ২০২৪-২৫ মেয়াদে দায়িত্ব পালন করবেন।

২৯ ডিসেম্বর পল্টনে সিএমজেএফ নিজস্ব কার্যালয়ে আয়োজিত বার্ষিক সাধারণ সভা শেষে সদস্যদের সরাসরি ভোটে তাঁরা নির্বাচিত হন। কমিটির সহসভাপতি ফিন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেসের সিনিয়র রিপোর্টার বাবুল বর্মণ, যুগ্মসাধারণ সম্পাদক ইব্রাহিম হোসেন রেজওয়ান, অর্থসম্পাদক মাহফুজুল ইসলামসহ কমিটির নির্বাচিত পাঁচ সদস্য হলেন জুনায়েদ শিশির, হামিদুল ইসলাম সরকার, এসএম নুরুজ্জামান তানিম, সুশান্ত সিনহা ও তৌহিদুল ইসলাম রানা। সিএমজেএফ বার্ষিক সাধারণ সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের বিদায়ি সভাপতি অর্থসূচকের সম্পাদক জিয়াউর রহমান। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন সাধারণ সম্পাদক আবু আলী। নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব পালন করেন সংগঠনের সিনিয়র সদস্য নাসির উদ্দিন চৌধুরী, জিয়াউর রহমান, শারমিন রিনভী, রাজু আহম্মেদ, মনির হোসেন ও মাইনুল হাসান সোহেল। সূত্র: ৩০ ডিসেম্বর ২০২৩, দৈনিক ইত্তেফাক

ডুরা'র সভাপতি মাসুম সম্পাদক শাহজাহান

সেবা খাতের রিপোর্টারদের সংগঠন ঢাকা ইউটিলিটি রিপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের (ডুরা)

কার্যনির্বাহী কমিটি-২০২৪ গঠন করা হয়েছে। এতে সভাপতি হিসাবে বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকমের সিনিয়র করেসপনডেন্ট ওবায়দুর মাসুম এবং সাধারণ সম্পাদক দৈনিক আমাদের সময়ের সিনিয়র রিপোর্টার শাহজাহান মোল্লাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। ২৯ ডিসেম্বর রাজধানীর হোটেল রেইনি রুফে বার্ষিক সাধারণ সভা শেষে এ কমিটি ঘোষণা করা হয়।

কমিটিতে সহসভাপতি হিসাবে এটিএন বাংলার চিফ রিপোর্টার শফিকুল ইসলাম শামীম, যুগ্মসাধারণ সম্পাদক ইনডিপেনডেন্ট টেলিভিশনের সিনিয়র রিপোর্টার হাসিফ মাহমুদ শাহ্, অর্থ সম্পাদক দৈনিক ইত্তেফাকের স্টাফ রিপোর্টার নিলয় মামুন, সাংগঠনিক সম্পাদক বাংলা ট্রিবিউনের স্টাফ রিপোর্টার আবির হাকিম, দপ্তর ও প্রচার-প্রকাশনা সম্পাদক বাংলাভিশনের স্টাফ রিপোর্টার সাদ্দাম হোসাইনকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

এছাড়া কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য হিসাবে রয়েছেন দৈনিক আজকের পত্রিকার বিশেষ প্রতিনিধি তোফাজ্জল হোসেন রুবেল, ভোরের কাগজের সিনিয়র রিপোর্টার রুহুল আমিন, বাংলাদেশ প্রতিদিনের সিনিয়র রিপোর্টার জয়শ্রী ভাদুড়ী ও রফিকুল ইসলাম রনি। সভায় ডুরার বিদায়ি সভাপতি মো. রুহুল আমিনের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক জয়শ্রী ভাদুড়ীর সঞ্চালনায় সংগঠনের শীর্ষ নেতারা বক্তব্য দেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সদস্যরা। সূত্র: ৩০ ডিসেম্বর ২০২৩, দৈনিক ইত্তেফাক

গাজায় ইসরায়েলি হামলায় শতাধিক সাংবাদিক নিহত

ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় যুদ্ধ শুরুর পর থেকে এখন পর্যন্ত হামলায় নিহত সাংবাদিকের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১০০ জনের বেশি। এই তালিকায় সবশেষ যুক্ত হয়েছেন বার্তা সংস্থা আল রাই এজেন্সির উপ-পরিচালক আহমাদ জামাল আল মাধুন। গাজা কর্তৃপক্ষের বরাত দিয়ে আল জাজিরার এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়।

গাজার জনসংযোগ দপ্তরের দাবি, গাজায় ইচ্ছাকৃতভাবে সাংবাদিকদের হত্যা করছে ইসরায়েলি সেনারা। যুদ্ধ নিয়ে ফিলিস্তিনি কণ্ঠকে নীরব ও সত্যকে আড়াল করতে এবং আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে খবর ও তথ্য পৌঁছাতে বাধা দিতে এসব করছে তারা।

সংবাদকর্মীদের অধিকার নিয়ে কাজ করা সংস্থা ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অব জার্নালিস্টের সহ-সাধারণ সম্পাদক টিম ডসন বলেন, অবরুদ্ধ গাজায় অস্বাভাবিক সংখ্যক সাংবাদিক নিহত হয়েছেন। তিনি বলেন, এর আগে আর কোনো একক সংঘাতে এত সংখ্যক সাংবাদিক নিহত হননি।

গাজা সরকারের গণমাধ্যম সংস্থার কার্যালয় জানিয়েছে, চলতি বছরের ৭ অক্টোবর থেকে এখন পর্যন্ত ১০১ জন সাংবাদিক প্রাণ হারিয়েছেন। একই সময়ে ইসরায়েলি বাহিনীর বর্বরোচিত হামলায় সংবাদমাধ্যমের অর্ধ-শতাধিক কার্যালয় পুরোপুরি বা আংশিক ধ্বংস হয়েছে। আল জাজিরার এক প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, তাদের অ্যারাবিক ক্যামেরাম্যান সামের আবুদাকাও হামলায় নিহত হয়েছেন। সূত্র: ২৪ ডিসেম্বর ২০২৩, দৈনিক ইত্তেফাক অনলাইন

সমাবেশে সাংবাদিক নেতারা পিটার হাসের বক্তব্য স্বাধীন গণমাধ্যমে অযাচিত হস্তক্ষেপ

গণমাধ্যমের ওপর ভিসা নীতি প্রয়োগ নিয়ে ঢাকায় নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত পিটার হাসের বক্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন দেশের সাংবাদিক নেতারা। তাঁরা বলেছেন, পিটার হাসের বক্তব্য বাংলাদেশের স্বাধীন গণমাধ্যমের ওপর অযাচিত হস্তক্ষেপ। যুক্তরাষ্ট্রের মুক্ত গণমাধ্যম নীতির সঙ্গেও সাংঘর্ষিক। সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতাসহ বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে কোনো ষড়যন্ত্র সাংবাদিক সমাজ মেনে নেবে না।

৩ অক্টোবর জাতীয় প্রেস ক্লাবে 'ভিসা নীতির নামে সংবাদমাধ্যমে মার্কিন চাপ' শীর্ষক প্রতিবাদ সমাবেশে বক্তারা এসব কথা বলেন। জাস্টিস ফর জার্নালিস্টস এ আয়োজন করে।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রীর সাবেক তথ্য উপদেষ্টা ইকবাল সোবহান চৌধুরী বলেন, আমরা কোনো প্রভু চাই না, বন্ধু চাই। বাংলাদেশ কোনো প্রভুর কাছে মাথা নত করবে না। মার্কিন রাষ্ট্রদূতের বক্তব্য আমাদের জন্য অবমাননাকর।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের (বিএফইউজে) সাবেক সভাপতি মনজুরুল আহসান বুলবুল বলেন, যুক্তরাষ্ট্র মুক্ত গণমাধ্যমের দেশ। সেখানেও সাংবাদিক নির্যাতন হয়। পিটার হাসের বক্তব্য তাঁর দেশেরই মুক্ত গণমাধ্যমের নীতির সঙ্গে সাংঘর্ষিক। তাঁর বক্তব্য পরোক্ষভাবে গণমাধ্যমের ওপর চাপ সৃষ্টি করেছে।

সংগঠনের জ্যেষ্ঠ সহসভাপতি ওবায়দুল হক খানের সভাপতিত্বে সমাবেশে আরও বক্তব্য দেন বিএফইউজের সাবেক মহাসচিব আব্দুল জলিল ভূঁইয়া, ডিইউজের সাবেক সভাপতি কুদ্দুস আফ্রাদ, ডিইউজের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মানিক লাল ঘোষ, যুগ্মসাধারণ সম্পাদক খায়রুল আলম, জাস্টিস ফর জার্নালিস্টসের চেয়ারম্যান কামরুল ইসলাম, মহাসচিব শাহীন বাবু, সাংবাদিক নেতা লায়েকউজ্জমান, আজমল হক হেলাল, আবু সাঈদ প্রমুখ। সূত্র: ৪ অক্টোবর ২০২৩, সমকাল

এমি অ্যাওয়ার্ড পেলেন যারা

যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক সিটিতে ২০ নভেম্বর রাতে বসেছিল ৫১তম আন্তর্জাতিক এমি অ্যাওয়ার্ডসের বর্ণিল আসর। এ বছরের এমি অ্যাওয়ার্ডসে ২০টি দেশের ৫৬ জন প্রতিযোগী মনোনয়ন পেয়েছেন।

এবারের আসরে সেরা ড্রামা সিরিজ নির্বাচিত হয়েছে 'দ্য এমপ্রেস'। এমির মঞ্চে এবার ছিল ভারতের জয়জয়কার। একাধিক বিভাগে মনোনয়ন পেয়েছিলেন তারকারা। শেফালি আর জিম সেরা অভিনেতা ও সেরা অভিনেত্রী হতে না পারলেও এমি অ্যাওয়ার্ড ঘরে আনলেন একতা কাপুর ও বীর দাস। দিল্লি ক্রাইমে অভিনয়ের জন্য সেরা অভিনেত্রী বিভাগে মনোনয়ন পেয়েছিলেন শেফালি শাহ। তবে হাতছাড়া হয় পুরস্কার। 'দ্য ডাইভ' ছবিতে অভিনয়ের জন্য মেক্সিকান অভিনেত্রী কার্লা সুজাকে এ সম্মাননা দেওয়া হয়। সেরা অভিনেতা বিভাগে ভারত থেকে মনোনয়ন পেয়েছিলেন অভিনেতা জিম সার্ভ 'রকেট বয়েজ'-এর জন্য। তবে তিনিও হেরে যান মার্টিন ফ্রিম্যানের কাছে। 'দ্য রেসপন্ডার' ড্রামায় অসাধারণ অভিনয়ের সুবাদে এ পুরস্কার পেয়েছেন তিনি। প্রযোজক একতা কাপুর পান এমি ডিরেক্টরেট অ্যাওয়ার্ড।

একনজরে আন্তর্জাতিক এমি পুরস্কারজয়ীদের তালিকা: সেরা টিভি মুভি/মিনি সিরিজ: ডাইভ, সেরা নন স্ক্রিপ্টেড এন্টারটেইনার: অ্যা পন্টে-দ্য ব্রিজ ব্রাসিল, সেরা শর্ট-ফর্ম সিরিজ: অ্যা ভেরি অর্ডিনারি ওয়ার্ল্ড, সেরা শিশুতোষ ফ্যাক্টচুয়াল অ্যান্ড এন্টারটেইনমেন্ট: বিল্ট টু সারভাইভ, সেরা ডকুমেন্টারি: মারিউপোল: দ্য পিপলস স্টোরি, সেরা স্পোর্টস ডকুমেন্টারি: হার্লে অ্যান্ড কাটিয়া, সেরা আর্টস প্রোগ্রামিং: বাফি সেইন্টে-ম্যারি: ক্যারি ইট অন, সেরা তেলেনোভেলা: ফ্যামিলি সিক্রেটস এবং সেরা শিশুতোষ অ্যানিমেশন: দ্য স্পেডস অ্যান্ড দ্য মুস।

শোক সংবাদ

মইনুল হোসেন

সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা, প্রখ্যাত আইনজীবী, বাংলাদেশের সাংবাদিকতার দিকপাল দৈনিক ইত্তেফাকের প্রতিষ্ঠাতা তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়ার জ্যেষ্ঠ পুত্র এবং ইংরেজি দৈনিক নিউ নেশনের প্রকাশক ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহি...রাজিউন)। ২ ডিসেম্বর রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। সর্বমহলে সুপরিচিত-শ্রদ্ধাভাজন এ মহান ব্যক্তিত্বের বয়স হয়েছিল ৮৩ বছর।

৩ ডিসেম্বর সকাল সাড়ে ১০টায় বারিধারা মসজিদে প্রথম জানাজা এবং বাদ জোহর তাঁর প্রিয় কর্মস্থল সুপ্রিম কোর্ট প্রাঙ্গণে দ্বিতীয় জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। পরে মা মাজেদা বেগম ও পিতা তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়ার কবরের পাশে তাঁকে আজিমপুর কবরস্থানে দাফন করা হয়।

ব্যক্তিজীবনে সদা হাস্যোজ্জ্বল, অতি সদালাপী, অমায়িক, প্রাণবন্ত, বিনয়ী, বন্ধুবৎসল আর প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর সাদা মনের মানুষ ছিলেন ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন হিরু। আইনাঙ্গন, সাংবাদিকতা, রাজনীতি এবং সামাজিক ক্ষেত্রে ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন ছিলেন এক উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো দেদীপ্যমান। দেশে আইনের শাসন, ন্যায়বিচার ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় অবিস্মরণীয় ভূমিকা পালন করেছেন তিনি।

২০০৭ সালে গঠিত ড. ফখরুদ্দীন আহমদের নেতৃত্বে গঠিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা হিসাবে তথ্য, আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রণালয়, গৃহায়ন ও গণপূর্ত এবং ভূমি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পালন করেন। আপন কর্মক্ষেত্রে নিরলস কর্মনিষ্ঠ কীর্তিমান ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন অন্য যে কোনো পরিচয়ের চেয়ে নিজেকে তিনি আইনজীবী হিসাবেই দেখতে পছন্দ করতেন। তিনি দৈনিক ইত্তেফাকের সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি হিসাবে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি বাংলাদেশ সংবাদপত্র পরিষদের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন। ২০০০-২০০১ মেয়াদে সুপ্রিম কোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশনের নির্বাচিত সভাপতি হিসাবেও তিনি দায়িত্ব পালন করেন। ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক সিনেট ও সিন্ডিকেট সদস্য। শাসনতান্ত্রিক প্রক্রিয়া রক্ষায় এবং সরকারের নির্বাহী বিভাগ হতে বিচার বিভাগকে পৃথক্‌করণে আইনাঙ্গনের সর্বজনশ্রদ্ধেয় এই সিনিয়র আইনজীবীর বলিষ্ঠ ভূমিকা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। বিভিন্ন সাংবিধানিক মামলায় আদালতের আহ্বানে অ্যামিকাস কিউরি হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ মত তুলে ধরেন। অসংখ্য আলোচিত ও গুরুত্বপূর্ণ মামলা পরিচালনা করেছেন তিনি।

বর্ণাঢ্য জীবনের অধিকারী ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন ১৯৪০ খ্রিষ্টাব্দের জানুয়ারিতে পিরোজপুর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। স্কুলের শিক্ষা তিনি লাভ করেন কলকাতা, পিরোজপুর ও ঢাকায়। ঢাকার নবাবপুর সরকারি উচ্চবিদ্যালয় থেকে তিনি ম্যাট্রিক পাশ করেন। ছাত্রজীবনে স্কাউট আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। ১৯৬১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি রাষ্ট্রবিজ্ঞানে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করে ব্যারিস্টারি পড়তে লন্ডন যান এবং মিডল টেম্পল-ইনে ভর্তি হন। ১৯৬৫ সালে তিনি ব্যারিস্টার হিসাবে বারে যোগ দেন এবং একই বছর ডিসেম্বরে ঢাকা হাইকোর্টে আইন ব্যাবসা শুরু করেন। লন্ডন অবস্থানকালে তিনি দৈনিক ইত্তেফাকের লন্ডনস্থ প্রতিনিধি হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। ওই সময় তিনি কমনওয়েলথ প্রেস ইনস্টিটিউটেরও একজন সদস্য ছিলেন। ইউরোপীয় কমন মার্কেট কমিশনের আমন্ত্রণে তিনি ব্রাসেলস পরিদর্শন করেন। ১৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দে পিতার আকস্মিক মৃত্যুর পর দৈনিক ইত্তেফাক সম্পাদনার গুরুদায়িত্ব তাঁকে পালন করতে হয়। ১৯৬৯ এবং ১৯৮৯ সালে চীনের জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে সরকার প্রেরিত প্রতিনিধিদলের অন্যতম সদস্য হিসাবে তিনি চীন সফর করেন। পিতা নির্ভীক সাংবাদিক তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়ার মৃত্যুর কারণে সৃষ্ট ইত্তেফাকের প্রাথমিক ধকল কাটিয়ে ওঠার পর আইন ব্যবসায় বেশি মনোযোগী হওয়ার অভিপ্রায়ে তিনি ১৯৭৩ সালে দৈনিক ইত্তেফাকের সম্পাদক পদে না থেকে সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি হন।

শীলব্রত বড়ুয়া

দৈনিক ইত্তেফাকের সাবেক যুগ্ম-বার্তাসম্পাদক ও ইউনিট চিফ শীলব্রত বড়ুয়া (৮২) আর নেই। ৬ অক্টোবর ঢাকার নিজ বাসভবনে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

তিনি ক্যানসারে আক্রান্ত ছিলেন। শীলব্রত বড়ুয়ার মরদেহ নেওয়া হয় জাতীয় প্রেস ক্লাবে। সেখানে সাংবাদিক সংগঠনগুলোর নেতারা পুষ্পমাল্য দিয়ে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। জাতীয় প্রেস ক্লাবের পক্ষ থেকেও তাঁর মরদেহে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।

রফিক ভূঁইয়া

রাজধানীর সেগুনবাগিচায় বিএনপি নেতাকর্মী ও পুলিশের সংঘর্ষের মধ্যে পড়ে আহত সাংবাদিক রফিক ভূঁইয়া (৭৩) ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহি...রাজিউন)। ২৯ অক্টোবর রাজধানীর একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়।

রফিক ভূঁইয়া সাংবাদিকতা শুরু করেন চট্টগ্রাম থেকে। এরপর ঢাকায় বিভিন্ন সংবাদপত্রে কাজ করেছেন। নিজেও একাধিক সংবাদপত্র প্রকাশ করেছেন। দীর্ঘদিন কানাডায় থাকাকালে সেখানেও সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। চট্টগ্রামে থাকাকালে রফিক ভূঁইয়া ঐক্যবদ্ধ সাংবাদিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। বিএফইউজের প্রথম কমিটিতে ছিলেন নির্বাহী সদস্য। তিনি জাতীয় প্রেস ক্লাবের স্থায়ী সদস্য ছিলেন। রফিক ভূঁইয়ার জন্ম ফেনীর দাগনভূঞায় ১৯৫১ সালে।

এম ওয়াহিদুল্লাহ

সাংবাদিক ও বীর মুক্তিযোদ্ধা এম ওয়াহিদুল্লাহ ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহি...রাজিউন)। ৭ ডিসেম্বর রাজধানীর একটি হাসপাতালে তিনি মারা যান। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭১ বছর। পরদিন বাদ জুমা দুই দফা জানাজা শেষে বনানী কবরস্থানে তাঁর লাশ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় দাফন করা হয়। এর আগে জাতীয় প্রেস ক্লাব প্রাঙ্গণে তাঁর কফিনে শেষ শ্রদ্ধা জানান সাংবাদিকদের বিভিন্ন সংগঠনের নেতারা।

এম ওয়াহিদুল্লাহ জাতীয় প্রেস ক্লাব এবং ডিআরইউর স্থায়ী সদস্য ছিলেন। এছাড়া চট্টগ্রাম জার্নালিস্ট ফোরাম-ঢাকার সভাপতি ছিলেন তিনি। দীর্ঘদিন দায়িত্ব পালন করেছেন চট্টগ্রামের দৈনিক আজাদীর ঢাকা ব্যুরোপ্রধান হিসাবে।

আমিনুর রহমান তাজ

জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক আমিনুর রহমান তাজ (৬৮) ১৬ অক্টোবর রাজধানীর মালিবাগ চৌধুরীপাড়ার বাসায় ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি...রাজিউন)।

আমিনুর রহমান তাজ আজকের দৈনিক পত্রিকার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক ছিলেন। তিনি বাংলাদেশ ক্রাইম রিপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের (ক্র্যাব) সাবেক সহসভাপতি এবং ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির (ডিআরইউ) জ্যেষ্ঠ সদস্য। ৭ অক্টোবর তিনি হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হন। ওইদিনই তাঁকে মিরপুর হার্ট ফাউন্ডেশনে ভর্তি করা হয়। চিকিৎসা শেষে বাসায় ফেরেন। সুস্থবোধ করায় অফিসও করেন।

১৬ অক্টোবর সকালে হঠাৎ অসুস্থবোধ করায় তাজকে বাসায়ই অক্সিজেন দেওয়া হয়। পরে সকাল ১০টার দিকে তিনি ইন্তেকাল করেন। বিকাল ৩টায় ডিআরইউ চত্বরে প্রথম জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। ডিআরইউ ও ক্র্যাবের কার্যনির্বাহী কমিটি এবং ডিআরইউ সমবায় সমিতির নেতারা তাঁর মরদেহে শ্রদ্ধা জানান। এরপর মতিঝিল এজিবি কলোনিতে

দ্বিতীয় জানাজা শেষে সন্ধ্যায় আজিমপুর কবরস্থানে তাঁর মরদেহ দাফন করা হয়।

আমিনুর রহমান তাজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ থেকে মাস্টার্স শেষে আজকের কাগজ দিয়ে সাংবাদিকতা শুরু করেন। পরবর্তী সময়ে ভোরের কাগজ, মানবকণ্ঠসহ বিভিন্ন পত্রিকায় সুনামের সঙ্গে কাজ করেন।

এসএম ইকবাল

চলে গেলেন পরোপকারী সাংবাদিক, আইনজীবী, সাহিত্যিক, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব, শিক্ষানুরাগী সমাজসেবক ও সংগঠক এসএম ইকবাল (৭৯)। ১৮ অক্টোবর বরিশাল শেরেবাংলা চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় (শেবাচিম) হাসপাতালে তিনি ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি...রাজিউন)। তিনি দীর্ঘদিন ক্যানসারে আক্রান্ত হয়ে বাসায় চিকিৎসা নিচ্ছিলেন।

সত্তরের দশক থেকে তিনি এ পর্যন্ত ঢাকা ও বরিশাল থেকে প্রকাশিত বিভিন্ন পত্রিকায় কাজ করেছেন। এ সময়কালে তিনি বাংলাদেশ, জনপদ, বিপ্লবী বাংলাদেশ, বাংলাদেশ টাইমস, দৈনিক দেশ, নিজের সম্পাদনায় 'কথা', বরিশাল থেকে প্রকাশিত দৈনিক আজকের বার্তার সম্পাদক ও সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন। সবশেষ তিনি বরিশালের আজকাল পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি ও দৈনিক দক্ষিণাঞ্চল পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। বরিশাল প্রেস ক্লাবের আটবার নির্বাচিত সভাপতি এবং পাঁচবার সাধারণ সম্পাদক হিসাবে নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেছেন এসএম ইকবাল। সাংবাদিকতায় মাইনুল হাসান স্মৃতি পদকসহ নানা পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন এ সাংবাদিক। এছাড়া ২৮টি সংগঠনের জোট বরিশাল সাংস্কৃতিক সংগঠন সমন্বয় পরিষদের তিনি দুবার নির্বাচিত সভাপতি ছিলেন। পঁচাত্তর-পরবর্তী সময়ে তিনি উদীচী বরিশাল জেলা সংসদের সহসভাপতির দায়িত্ব পালন করেন।

আব্দুল মজিদ মিয়া

দৈনিক ইত্তেফাকের ফরিদপুরের সদরপুর উপজেলার সাংবাদিক ও বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল মজিদ মিয়া ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে ১৭ অক্টোবর নিজ বাড়িতে ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহি...রাজিউন)। ১৮ অক্টোবর বাদ আসর রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় গ্রামের বাড়ি সদরপুর উপজেলার হাট কৃষ্ণপুর ইউনিয়নের রামচন্দ্রপুর গ্রামের কবরস্থানে তাঁর মরদেহ দাফন করা হয়।

সাংবাদিক আব্দুল মজিদ মিয়া দীর্ঘদিন দৈনিক ইত্তেফাকে কাজ করেছেন। তিনি সদরপুর উপজেলা প্রেস ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি এবং ফরিদপুর জেলা প্রেস ক্লাবের সিনিয়র সদস্য ছিলেন। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন তিনি ভারত থেকে প্রশিক্ষণ শেষে দেশে এসে সরাসরি রণাঙ্গনে অংশ নেন।

গৌতম বোস

দৈনিক ইত্তেফাকের সাবেক সিনিয়র আর্টিস্ট ও জাতীয় প্রেস ক্লাবের স্থায়ী সদস্য গৌতম বোস পরলোকগমন করেছেন। ২৪ ডিসেম্বর ঢাকার শ্যামলীতে বাংলাদেশ স্পেশালাইজড হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি দুই যুগের বেশি সময় দৈনিক ইত্তেফাকের আর্টিস্ট হিসাবে কাজ করেছেন।

মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫২ বছর। গৌতম বোস দীর্ঘদিন লিভার সিরোসিসে ভুগছিলেন।

শাহজাহান সিরাজ সাজু

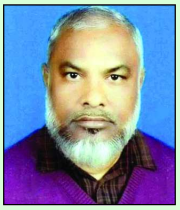

টঙ্গী প্রেস ক্লাবের সাবেক সভাপতি, সাপ্তাহিক অগ্নিসাক্ষীর সম্পাদক ও প্রকাশক মো. শাহজাহান সিরাজ সাজু (৫৩) ২৮ অক্টোবর রাজধানীর উত্তরার একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি...রাজিউন)। তিনি দীর্ঘদিন মায়োপ্যাথি রোগে ভুগছিলেন। সকালেই তাঁর লাশ চাঁদপুর জেলার মতলব (উত্তর) থানার ইসলামবাদ গ্রামে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে ২৯ অক্টোবর বাদ জোহর জানাজা শেষে পারিবারিক গোরস্থানে তাঁর লাশ দাফন করা হয়।

সাংবাদিক শাহজাহান সিরাজ সাজু দৈনিক দিনকাল, দৈনিক জনকণ্ঠসহ বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি সর্বশেষ দৈনিক জনকণ্ঠের সাব-এডিটর হিসাবে কর্মরত ছিলেন। আমৃত্যু নিজের প্রকাশনায় সাপ্তাহিক অগ্নিসাক্ষীর সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছেন।

সমুদ্র হক

বগুড়ার প্রবীণ সাংবাদিক দৈনিক জনকণ্ঠের জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক সমুদ্র হক (৭১) আর নেই (ইন্নালিল্লাহি...রাজিউন)। ১৪ নভেম্বর সকালে শহরের সূত্রাপুরের বাড়ি থেকে হাসপাতালে নিলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। জানাজা শেষে তাঁর লাশ দক্ষিণ বগুড়া গোরস্থানে দাফন করা হয়। ১৯৮৪ সালে সাংবাদিকতা শুরু করা সমুদ্র হক ফিচার লেখক হিসাবে সুপরিচিত ছিলেন।

আলতাফ হোসেন

কুড়িগ্রামের রাজারহাট উপজেলার দৈনিক ইত্তেফাকের সংবাদদাতা আলতাফ হোসেন (৫৩) ২৬ ডিসেম্বর রংপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি...রাজিউন)। তিনি দীর্ঘদিন কিডনি, ডায়াবেটিসসহ নানা জটিল রোগে ভুগছিলেন। ওইদিন রাত ৮টায় জানাজা শেষে পারিবারিক কবরস্থানে তাঁর লাশ দাফন করা হয়।

তারেক মাহমুদ

অভিনেতা, নির্মাতা ও কবি তারেক মাহমুদ আর নেই (ইন্নালিল্লাহি...রাজিউন)। ২৭ অক্টোবর রাতে হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হলে মগবাজার কমিউনিটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। গত শতাব্দীর শেষ দশকে শাহবাগের কবিতার আড্ডা থেকে আসেন অভিনয়ে, এরপর নির্মাণে। অভিনয় করেছেন মোস্তফা সরওয়ার ফারুকী ও তাঁর 'ভাইবেরাদার'দের বহু নাটকে। কথাসাহিত্য, প্রবন্ধ, চলচ্চিত্র, নাটক, ভাষা আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধ নানা বিষয়ে তাঁর লেখা বই রয়েছে। প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'কালার বাঁশি' (১৯৯৭)।

রায়ান ও'নিল

হলিউডের কিংবদন্তি অভিনেতা রায়ান ও'নিল মারা গেছেন। ৮ ডিসেম্বর লসঅ্যাঞ্জেলেসে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮২ বছর। তিনি মানুষকে হাসাতে ভালোবাসতেন। টেলিভিশনে শুরু হয়েছিল ও'নিলের বর্ণাঢ্য ক্যারিয়ার। সোপ অপেরা দিয়ে পরিচিত পান। এরপর সত্তর দশকের সিনেমা 'লাভ স্টোরি' কোটি কোটি মানুষকে কাঁদিয়েছে। এছাড়াও 'পেপার মুন', 'হোয়াটস আপ, ডাক?', 'ব্যারি লিন্ডন'-এর মতো চলচ্চিত্রে অভিনয় করে তিনি তারকাখ্যাতি অর্জন করেন। ২০০১ সালে ক্রনিক লিউকেমিয়া এবং ২০১২ সালে প্রোস্টেট ক্যানসারে আক্রান্ত হয়েছিলেন এই অভিনেতা।

কপিরাইট আইন এবং এর প্রয়োগ শীর্ষক কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তব্য দিচ্ছেন বাংলাদেশ কপিরাইট অফিসের রেজিস্ট্রার অব কপিরাইটস মো. দাউদ মিয়া। এসময় উপস্থিত ছিলেন প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ

মেধা ও সৃজনশীল কর্মের আইনি সুরক্ষাই কপিরাইট

মেধা ও সৃজনশীল কর্মের আইনি সুরক্ষাই হলো কপিরাইট। কোনো কর্মের প্রথম ব্যক্তিই হলো সেটার স্বত্বাধিকারী। এ স্বত্বাধিকার রক্ষা করার নামই হলো কপিরাইট আইন। কপিরাইট আইনটি যথাযথ ব্যবহার করতে পারলে মেধাস্বত্বের আর্থিক ও আইনগত সুরক্ষা পেত। এতে একদিকে যেমন মেধাস্বত্ব অক্ষুণ্ন থাকত, অপরদিকে দেশের প্রবৃদ্ধি বেড়ে যেত। কপিরাইট আইন সংবাদপত্র ও গণমাধ্যমের ক্ষেত্রেও ব্যবহার হতে পারে। আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষই জানে না কপিরাইট আইন কী কিংবা এর প্রয়োগ কীভাবে হয়। কপিরাইট একটি সর্বজনীন বিষয়। মূলত মেধাস্বত্ব রয়েছে–এমন কর্ম এর আওতায় পড়ে। World International Property Organization (WIPO)-এর নীতিমালা অনুযায়ী সাহিত্য বা নাটকের রচয়িতা, গানের ক্ষেত্রে সুরকার ও গীতিকার, স্থিরচিত্রের ক্ষেত্রে আলোকচিত্রকার, শিল্পকর্মের জন্য শিল্পী, চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে প্রযোজক, তথ্যপ্রযুক্তির ক্ষেত্রে সফটওয়্যার কিংবা ডিভাইস সৃষ্টিকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান। এছাড়া সব সৃষ্টিশীল কাজের অনুবাদ, সম্প্রচারমাধ্যমের ক্ষেত্রে সম্প্রচার সংস্থা, মুদ্রণ শিল্পের প্রকাশক, অনুষ্ঠানের অভিনয়শিল্পী ও কলাকুশলীর কর্মও কপিরাইটের আওতাভুক্ত।

৬ ডিসেম্বর 'কপিরাইট আইন ও এর প্রয়োগ' শীর্ষক কর্মশালায় আলোচকরা এসব কথা বলেন। প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর আয়োজনে পিআইবির সেমিনার কক্ষে এ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ মডারেটর হিসাবে কর্মশালা পরিচালনা করেন। এতে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ কপিরাইট অফিসের রেজিস্ট্রার অব কপিরাইটস (অতিরিক্ত সচিব) মো. দাউদ মিয়া, এনডিসি। আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ কপিরাইট অফিসের কপিরাইট ডেপুটি রেজিস্ট্রার (উপসচিব) আবুল কাশেম মোহাম্মদ ফজলুল হক। কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর পরিচালক (অধ্যয়ন ও প্রশিক্ষণ, চলতি দায়িত্ব) শেখ মজলিশ ফুয়াদ। কর্মশালায় র‍্যাপোর্টিয়ারের দায়িত্ব পালন করেন প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর প্রশিক্ষণ বিভাগের প্রতিবেদক এম এম নাজমুল হাসান।

কর্মশালার মডারেটর প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ বলেন, কপিরাইট আইন যথাযথ প্রয়োগ করতে পারলে মেধাস্বত্বের মূল্যায়ন হবে। এতে কারও সৃজনশীল কর্ম অন্য কেউ নিজের নামে চালিয়ে দিতে পারবে না। ফলে মানুষ তার কর্মের স্বীকৃতির পাশাপাশি আর্থিকভাবে লাভবান হবে, যা দেশের প্রবৃদ্ধি অর্জনে সহায়ক ভূমিকা রাখবে। তিনি সুরকার, গীতিকার, লেখকসহ সৃজনশীল মানুষের মেধাস্বত্ব অটুট রাখার জন্য কপিরাইট আইন প্রয়োগের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। কপিরাইট আইন গণমাধ্যমের ক্ষেত্রেও ব্যবহার হতে পারে বলে মত দেন তিনি।

আলোচনায় বাংলাদেশ কপিরাইট অফিসের রেজিস্ট্রার অব কপিরাইটস (অতিরিক্ত সচিব) মো. দাউদ মিয়া বলেন, কপিরাইট আইনটি যথাযথ ব্যবহার করতে পারলে মেধাস্বত্বের আর্থিক ও আইনগত সুরক্ষা পেত। এতে একদিকে মেধাস্বত্ব অক্ষুণ্ন থাকত। তিনি কপিরাইট আইন ও এর প্রয়োগ নিয়ে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন।

কর্মশালায় বাংলাদেশ কপিরাইট অফিসের কপিরাইট ডেপুটি রেজিস্ট্রার (উপসচিব) আবুল কাশেম মোহাম্মদ ফজলুল হক বলেন, কপিরাইট মূলত মেধাস্বত্ব ও সৃজনশীল কর্ম অটুট রেখে সমাজের কল্যাণ নিশ্চিতে কাজ করে। কারণ, কপিরাইট আইন বাস্তবায়ন করা সম্ভব হলে দেশ ও জাতির অগ্রগতি সাধিত হবে।

কর্মশালায় সংবাদকর্মী, লেখক, প্রকাশক, গবেষকসহ ৩২ জন অংশ নেন। অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীদের মতামত গ্রহণ করা হয়।

গণমাধ্যম এখনো প্রাতিষ্ঠানিক হয়নি

–সৈয়দ ইশতিয়াক রেজা

গণমাধ্যম এখনো প্রাতিষ্ঠানিক হয়নি, সংগঠনকেন্দ্রিক রয়ে গেছে। রাষ্ট্রের অন্যতম স্তম্ভ গণমাধ্যমকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপদান অত্যাবশ্যকীয় বলে মন্তব্য করেছেন গ্লোবাল টেলিভিশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সৈয়দ ইশতিয়াক রেজা। একই সঙ্গে সাংবাদিকদের

ঢাকা বিভাগের সাংবাদিকদের তিনদিনব্যাপী নির্বাচনবিষয়ক রিপোর্টিং প্রশিক্ষণের সমাপন অনুষ্ঠানে সনদ বিতরণ করছেন প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ ও গ্লোবাল টেলিভিশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সৈয়দ ইশতিয়াক রেজা

কাজের ক্ষেত্রে যত্নবান হওয়ার কথাও বলেছেন তিনি। ৩ অক্টোবর প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর সেমিনার কক্ষে ঢাকা বিভাগের সাংবাদিকদের তিনদিনব্যাপী নির্বাচনবিষয়ক রিপোর্টিং প্রশিক্ষণের সমাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।

সৈয়দ ইশতিয়াক রেজা বলেন, নির্বাচনকালীন রিপোর্টিংয়ের ক্ষেত্রে প্রধানত দুটি বিষয় খেয়াল রাখা জরুরি। একটি হলো আইন, অপরটি রাজনৈতিক দলগুলোর নির্বাচনকালীন কর্মপন্থা। নির্বাচনকালীন রিপোর্টিংয়ের ঝুঁকির বিষয়টি উল্লেখ করে তিনি সাংবাদিকদের রিপোর্টিংয়ের কৌশল সম্পর্কে আলোকপাত করেন।

অনুষ্ঠানের সভাপ্রধান প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ নির্বাচনকালীন রিপোর্টিংয়ের জন্য সংবিধান ও নির্বাচনি আচরণবিধিসহ অন্যান্য বিষয়ে সাংবাদিকদের সম্যক ধারণা রাখার কথা বলেন। কীভাবে নির্বাচনের সময় সাংবাদিকতা করতে হবে, সেসবের প্রায়োগিক দিক এবং নির্বাচন কমিশন ও তাদের ভূমিকাসহ অন্যান্য বিষয় আলোকপাত করেন পিআইবি মহাপরিচালক।

অনুষ্ঠানে প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর অধ্যয়ন ও প্রশিক্ষণ বিভাগের পরিচালক (চলতি দায়িত্ব) শেখ মজলিশ ফুয়াদ উপস্থিত ছিলেন। পিআইবির প্রশিক্ষক (চলতি দায়িত্ব) মো. শাহ আলমের সমন্বয়ে প্রশিক্ষণে ২৮জন সাংবাদিক অংশগ্রহণ করেন।

রাষ্ট্র কাঠামোয় সাংবাদিকতার গুরুত্ব অপরিহার্য

–উজ্জ্বল বিকাশ দত্ত

সাংবাদিকতা রাষ্ট্রের অন্যতম ইন্দ্রিয়, যার মাধ্যমে রাষ্ট্রের সম্যক ধারণা নেওয়া যায়। তাই জনগণের জন্য সাংবাদিকের ভূমিকা অপরিহার্য বলে মন্তব্য করেন সাবেক সচিব উজ্জ্বল বিকাশ দত্ত। একই সঙ্গে সাংবাদিকদের দায়িত্ববান হওয়ার কথাও উল্লেখ করেন তিনি। ২৭ অক্টোবর প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর সেমিনার কক্ষে ময়মনসিংহ বিভাগের বিভিন্ন জেলার সাংবাদিকদের তিনদিনব্যাপী নির্বাচনবিষয়ক প্রশিক্ষণের সমাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন তিনি। প্রধান অতিথি নির্বাচনকালীন রিপোর্টিংয়ের আইন-বিধি, আদেশ, অধ্যাদেশসহ বিভিন্ন বিষয়ে সম্যক ধারণা রাখার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

অনুষ্ঠানের সভাপ্রধান প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ নির্বাচনকালীন রিপোর্টিংয়ের জন্য সংবিধান ও নির্বাচনি আচরণবিধিসহ অন্যান্য বিষয়ে সাংবাদিকদের সম্যক ধারণা রাখার কথা বলেন। পিআইবির প্রশিক্ষক (চলতি দায়িত্ব) মো. শাহ আলমের সমন্বয়ে প্রশিক্ষণে ২৭ জন সাংবাদিক অংশগ্রহণ করেন।

স্বাধীনতার মূল্যবোধ সমুন্নত রাখার আহ্বান

–মো. ফারুক আহমেদ

বিবেক, নৈতিকতা ও স্বাধীনতার মূল্যবোধ সমুন্নত রেখে প্রতিবেদন তৈরি করা গণমাধ্যমকর্মীর অন্যতম দায়িত্ব বলে মন্তব্য করেছেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মো. ফারুক আহমেদ। ২ নভেম্বর প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর সেমিনার কক্ষে বরিশাল বিভাগের বিভিন্ন জেলার সাংবাদিকদের তিনদিনব্যাপী নির্বাচনবিষয়ক প্রশিক্ষণের সমাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন তিনি।

ময়মনসিংহ বিভাগের বিভিন্ন জেলার সাংবাদিকদের নির্বাচনবিষয়ক রিপোর্টিং প্রশিক্ষণের সমাপন অনুষ্ঠানে বক্তব্য দিচ্ছেন প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ

প্রজন্মের পর প্রজন্ম পারিপার্শ্বিক শিক্ষা গণমাধ্যম–টেলিভিশন, পত্রিকা, রেডিয়ো কিংবা অন্য মাধ্যমে পেয়ে থাকে বলে উল্লেখ করেন মো. ফারুক আহমেদ। এজন্য গণমাধ্যমকর্মীকে প্রতিবেদন তৈরিতে সংবেদনশীল হওয়ার কথাও বলেন তিনি।

মো. ফারুক আহমেদ আগামী নির্বাচন স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের অস্তিত্বের লড়াই উল্লেখ করে গণমাধ্যমকর্মীদের ইতিবাচক ভূমিকার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। কারণ, লেখনী এক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

অনুষ্ঠানের সভাপ্রধান প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ নির্বাচনকালীন রিপোর্টিংয়ের জন্য সংবিধান ও নির্বাচনি আচরণবিধি সম্পর্কে সম্যক ধারণা রাখার কথা বলেন। এছাড়া নির্বাচনি প্রতিবেদন ও অন্যান্য বিষয় নিয়ে আগেই মাঠ পর্যায়ে কাজ করার কথাও উল্লেখ করেন।

অনুষ্ঠানে পিআইবির পরিচালক (প্রশাসন, চলতি দায়িত্ব) মো. জাকির হোসেন, পরিচালক (অধ্যয়ন ও প্রশিক্ষণ, চলতি দায়িত্ব) শেখ মজলিশ ফুয়াদ উপস্থিত ছিলেন। পিআইবির প্রশিক্ষক (চলতি দায়িত্ব) মো. শাহ আলমের সমন্বয়ে প্রশিক্ষণে ২৮ জন সাংবাদিক অংশ নেন।

প্রতিবেদন তৈরিতে সাংবাদিকের দৃষ্টিভঙ্গি হবে নির্মোহ

- আনিসুর রহমান

প্রতিবেদন তৈরিতে সাংবাদিক হিসাবে নির্মোহ দৃষ্টিভঙ্গি রাখতে হবে। এটা একজন সাংবাদিকের অর্জনের বিষয়। নির্বাচনকালীন প্রতিবেদন তৈরিতে গুজব প্রতিরোধেও কাজ করবেন একজন সাংবাদিক। ১৩ নভেম্বর পিআইবির সেমিনার কক্ষে সিলেট বিভাগের বিভিন্ন জেলার সাংবাদিকদের তিনদিনব্যাপী নির্বাচনবিষয়ক প্রশিক্ষণের সমাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার (বাসস) ব্যবস্থাপনা সম্পাদক আনিসুর রহমান এ কথা বলেন।

আনিসুর রহমান আরও বলেন, ভোটার ও নির্বাচনসংশ্লিষ্টদের বিষয়টি মাথায় রেখে নির্বাচনকালীন প্রতিবেদন তৈরি করতে হবে। সেখানে দর্শক, শ্রোতা ও পাঠকের বিষয়টি অগ্রাধিকার দিয়ে প্রতিবেদন তৈরি করা বাঞ্ছনীয়। প্রত্যেক মানুষের রাজনৈতিক চিন্তাচেতনা রয়েছে। সাংবাদিক এর বাইরে নন। তবে প্রতিবেদন তৈরিতে পক্ষপাতদুষ্টতা

নির্বাচনবিষয়ক প্রশিক্ষণের সমাপন অনুষ্ঠানে সনদ বিতরণ করছেন প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ ও বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার (বাসস) ব্যবস্থাপনা সম্পাদক আনিসুর রহমান

পরিহার করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন তিনি।

অনুষ্ঠানের সভাপ্রধান প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ আগামী নির্বাচনকে স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্রের অস্তিত্বের লড়াই উল্লেখ করে গণমাধ্যমকর্মীদের ইতিবাচক ভূমিকার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। কারণ, লেখনী এক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

জাফর ওয়াজেদ আরও বলেন, নির্বাচনকালীন রিপোর্টিংয়ের জন্য সংবিধান ও নির্বাচনি আচরণবিধি সম্বন্ধে সম্যক ধারণা রাখা অত্যাবশ্যক। এছাড়া নির্বাচনি প্রতিবেদন ও অন্যান্য বিষয় নিয়ে আগেই মাঠ পর্যায়ে কাজ করার কথাও উল্লেখ করেন তিনি। অনুষ্ঠানে পিআইবির পরিচালক (অধ্যয়ন ও প্রশিক্ষণ, চলতি দায়িত্ব) শেখ মজলিশ ফুয়াদ উপস্থিত ছিলেন।

পিআইবির প্রশিক্ষক (চলতি দায়িত্ব) মো. শাহ আলমের সমন্বয়ে প্রশিক্ষণে ২৮ জন সাংবাদিক অংশগ্রহণ করেন।

অসম্পাদিত তথ্য কখনো সংবাদ হতে পারে না

–নঈম নিজাম

কখনো যা সম্পাদিত হয় না, তা সংবাদ হতে পারে না। তাই যে তথ্য সম্পাদিত, তা সংবাদমাধ্যমের উপাদান হিসাবে গণ্য।

কুমিল্লা জেলার সাংবাদিকদের তিনদিনব্যাপী বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের সমাপন অনুষ্ঠানে বক্তব্য দিচ্ছেন বাংলাদেশ প্রতিদিনের সম্পাদক নঈম নিজাম। এসময় উপস্থিত ছিলেন পিআইবি মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম অসম্পাদিত হওয়ায় সেটা সংবাদ হিসাবে পরিগণিত হতে পারে না বলে মন্তব্য করেন বাংলাদেশ প্রতিদিনের সম্পাদক নঈম নিজাম। ১৭ নভেম্বর প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর সেমিনার কক্ষে কুমিল্লা জেলার সাংবাদিকদের জন্য তিনদিনব্যাপী বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের সমাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন তিনি।

নঈম নিজাম বলেন, সংবাদমাধ্যম ও সংবাদকর্মীকে শব্দচয়নে যত্নশীল হতে হবে। তা না হলে প্রতিবেদনের পুরো অর্থই পরিবর্তন হয়ে ভিন্ন অর্থ প্রকাশ পাবে। যে কারণে সংবাদমাধ্যম ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং পাঠক ভুল বার্তা পাবে। এসব বিষয়ে সতর্ক থাকার পরামর্শ দেন তিনি।

সাংবাদিকতাকে চ্যালেঞ্জিং পেশা উল্লেখ করে বাংলাদেশ প্রতিদিনের সম্পাদক নঈম নিজাম কপি-পেস্ট পরিহার করে মাঠপর্যায়ে কাজ করে প্রতিবেদন তৈরির ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি আরও বলেন, সংবাদকর্মীর জ্ঞানের ভান্ডার অনেক উঁচু দরের হতে হবে। নতুবা বস্তুনিষ্ঠ ও রসাত্মকবোধক প্রতিবেদন তৈরি করা সম্ভব হবে না।

প্রধান অতিথি এনজিও জার্নালিজম, সিন্ডিকেট জার্নালিজমসহ বিভিন্ন ধরনের সাংবাদিকতার বৃত্ত থেকে বেরিয়ে নিজস্ব ঢঙে প্রতিবেদন তৈরির কথা বলেন। তিনি বলেন, কাজ করতে হলে বাধা আসবে। সেটিকে চ্যালেঞ্জ হিসাবে নিয়ে উত্তরণের পথ গ্রহণ করতে হবে। এছাড়া সত্তর দশকের সাংবাদিকতার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোচনা করেন তিনি। এমনকি রংপুর অঞ্চলের সাংবাদিক মোনাজাতউদ্দিনের বিশেষ প্রতিবেদনের কথাও উল্লেখ করেন তিনি।

নঈম নিজাম ইরাক, সিরিয়া ও ফিলিস্তিনের যুদ্ধের উদাহরণ টেনে বলেন, সাংবাদিকতার বিভিন্ন ক্ষেত্র রাজনীতি, অর্থনীতি ও সামাজিকতার ওপর নির্ভর করে। তিনি বলেন, পশ্চিমারা নিজ দেশের স্বার্থের ক্ষেত্রে দেশের কথা তাদের মিডিয়ায় প্রচার করে না। অথচ আমরা এর বিপরীত।

অনুষ্ঠানের সভাপ্রধান প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ সাংবাদিকতার অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ শীর্ষক আলোচনা করেন। সেখানে তিনি গণমাধ্যমকর্মীদের স্বীয় ভূমিকায় প্রতিবেদন তৈরির ওপর গুরুত্বারোপ করেন। জাফর ওয়াজেদ আগামী নির্বাচনকে স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্রের অস্তিত্বের লড়াই উল্লেখ করে গণমাধ্যমকর্মীদের ইতিবাচক ভূমিকা রাখার কথা বলেন।

কিশোরগঞ্জের হাওড় এলাকার সাংবাদিকদের তিনদিনব্যাপী হাওড়বিষয়ক রিপোর্টিং প্রশিক্ষণের সমাপন অনুষ্ঠানে সনদ বিতরণ করছেন বাংলাদেশ হাওড় ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো. আখতারুজ্জামান ও প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ

অনুষ্ঠানে পিআইবির পরিচালক (অধ্যয়ন ও প্রশিক্ষণ, চলতি দায়িত্ব) শেখ মজলিশ ফুয়াদ উপস্থিত ছিলেন। পিআইবির প্রশিক্ষক (চলতি দায়িত্ব) মো. শাহ আলমের সমন্বয়ে প্রশিক্ষণে ২৮ জন সাংবাদিক অংশ নেন।

জীববৈচিত্র্য রক্ষা করে হাওড়ে পর্যটন বিকাশ সম্ভব

–মো. আখতারুজ্জামান

পরিবেশবান্ধব অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে হাওড়ের জীববৈচিত্র্য রক্ষা করে পর্যটন বিকাশলাভ সম্ভব। এমনকি হাওড়ের পরিবেশ, জলবায়ু ও চ্যালেঞ্জের বিষয়টি মাথায় রেখে পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা অতীব জরুরি। তাহলে হাওড়ের স্বাভাবিক পরিবেশ বজায় রাখা সম্ভব বলে মন্তব্য করেন বাংলাদেশ হাওড় ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো. আখতারুজ্জামান।

২০ নভেম্বর প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর সেমিনার কক্ষে কিশোরগঞ্জ জেলার হাওড় এলাকার সাংবাদিকদের জন্য তিনদিনব্যাপী হাওড়বিষয়ক রিপোর্টিং প্রশিক্ষণের সমাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন তিনি।

মো. আখতারুজ্জামান বলেন, দেশের ৩৭টি উপজেলায় ছোটো-বড়ো ৩৭৩টি হাওড় রয়েছে। এসব হাওড়ে ফ্লাইওভারের মতো সংযোগ সড়ক নির্মাণ করে পর্যটনের মতো একটি খাতের দুয়ার উন্মোচিত হতে পারে। একই সঙ্গে হাওড়ের পরিবেশ-পরিস্থিতি বুঝে মৎস্য, কৃষিসহ অন্যান্য বিষয় চাষাবাদ করা সম্ভব। এতে একদিকে পরিবেশ অক্ষুণ্ন থাকবে, অপরদিকে দেশের মোট জিডিপিতে সংযোজিত হবে।

বাংলাদেশ হাওড় ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বলেন, হাওড়গুলোর চতুর্দিকে টেকসই বাঁধ দিয়ে ভাঙন রোধ করা সম্ভব। একই সঙ্গে হাওড়ের পানিতে প্রায় এক বিলিয়ন টন সেডিমেন্ট আসায় তলদেশ ভরাট হয়ে যাচ্ছে। সেটা রোধ করতে নির্দিষ্ট পরিমাণ মাটি কেটে হাওড়ের নাব্যতা বৃদ্ধি সম্ভব।

মো. আখতারুজ্জামান বলেন, মরুকরণ প্রক্রিয়া প্রতিহত করে নাব্যতা অক্ষুণ্ন রাখতে মৎস্যচাষের মাধ্যমে প্রোটিনের চাহিদা মেটানো হাওড়ের সঠিক ব্যবস্থাপনার বিকল্প নেই।

অনুষ্ঠানের সভাপ্রধান প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ বলেন, সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে হাওড় অঞ্চলের সাংবাদিকদের কাজের পরিধি একটু বেশিই। এখানে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন, ফিচার প্রতিবেদন, নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনাসহ সব ধরনের প্রতিবেদন করার সুযোগ থাকে।

জাফর ওয়াজেদ স্বাধীনতাযুদ্ধের সময় হাওড় অঞ্চলের যোদ্ধাদের বীরত্বের কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, নির্বাচনকালীন হাওড় এলাকায় রিপোর্টিংয়ের জন্য সংবিধান ও নির্বাচনি আচরণবিধি সম্বন্ধে সাংবাদিকের সম্যক ধারণা রাখা অত্যাবশ্যক।

অনুষ্ঠানে পিআইবির পরিচালক (অধ্যয়ন ও প্রশিক্ষণ, চলতি দায়িত্ব) শেখ মজলিশ

সিরাজগঞ্জ জেলার সাংবাদিকদের তিনদিনব্যাপী মোবাইল সাংবাদিকতাবিষয়ক প্রশিক্ষণের সমাপন অনুষ্ঠানে বক্তব্য দিচ্ছেন প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ

ফুয়াদ উপস্থিত ছিলেন। পিআইবির প্রতিবেদক এম এম নাজমুল হাসানের সমন্বয়ে প্রশিক্ষণে ২৮ জন সাংবাদিক অংশ নেন।

যোগাযোগের দক্ষতা প্রতিবেদকের অন্যতম যোগ্যতা

যোগাযোগের দক্ষতা প্রতিবেদকের অন্যতম যোগ্যতা, যা অর্জন করা কষ্টসাধ্য বিষয়। কারণ, নিয়মিত তথ্য আদান-প্রদানের মাধ্যমেই যোগাযোগ অক্ষুণ্ন থাকে। তাই একজন প্রতিবেদকের অন্যতম কাজ হলো যোগাযোগ দক্ষতা বৃদ্ধি করা। এমন মন্তব্য করেন সিনিয়র সাংবাদিক মো. শফিকুল করিম সাবু।

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর সেমিনার কক্ষে ২৩ নভেম্বর সিরাজগঞ্জ জেলার জন্য তিনদিনব্যাপী মোবাইল সাংবাদিকতাবিষয়ক প্রশিক্ষণের সমাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে একথা বলেন তিনি।

মো. শফিকুল করিম সাবু বলেন, আগের দিনে সংবাদের জন্য টেলিফোন ও ফ্যাক্সের ওপর নির্ভর করতে হতো। বর্তমানে সেটা নেই। আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তির যুগে মোবাইল ফোনসহ অন্যান্য ডিভাইসের মাধ্যমে সহজে কাজ করতে পারছেন সংবাদকর্মী। প্রধান অতিথি আরও বলেন, আগে সংবাদমাধ্যমগুলোর মধ্যে প্রতিযোগিতা ছিল। কিন্তু বর্তমানে সেটা পরিলক্ষিত হয় না।

মো. শফিকুল করিম সাবু বলেন, ভালো প্রতিবেদন তৈরি করতে হলে সংবাদকর্মীকে অবশ্যই মাঠপর্যায়ে কাজ করতে হবে। নতুবা ভালো প্রতিবেদন করা সম্ভব নয়। তিনি আরও বলেন, কর্মেই মুক্তি, কর্মেই জীবন।

অনুষ্ঠানের সভাপ্রধান প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ বলেন, সাংবাদিকতায় মোবাইল সাংবাদিকতার পরিধি একটু বেশিই। এখন মোবাইল ফোনের মাধ্যমে প্রতিবেদন, ফিচার, নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনাসহ সব ধরনের প্রতিবেদন করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

জাফর ওয়াজেদ নির্বাচনকালীন মোবাইল সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে সংবিধান ও নির্বাচনি আচরণবিধি মেনে সাংবাদিকতাকে এগিয়ে নেওয়ার আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে পিআইবির পরিচালক (অধ্যয়ন ও প্রশিক্ষণ, চলতি দায়িত্ব) শেখ মজলিশ ফুয়াদ উপস্থিত ছিলেন। পিআইবির সহকারী প্রশিক্ষক জিলহাজ উদ্দিন নিপুণের সমন্বয়ে প্রশিক্ষণে ২৬ জন সাংবাদিক অংশ নেন।

নির্বাচন অর্থবহ করতে সাংবাদিকের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ

- আবু আলম মো. শহিদ খান

নির্বাচনে প্রিসাইডিং অফিসার ও পোলিং এজেন্টদের পাশাপাশি সাংবাদিকের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, নির্বাচন অর্থবহ করতে এ তিনের সমন্বয়ে কাজ করা অপরিহার্য বলে মন্তব্য করেন সাবেক সচিব আবু আলম মো. শহিদ খান।

২৭ নভেম্বর প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর সেমিনার কক্ষে রংপুর বিভাগের বিভিন্ন জেলার সাংবাদিকদের তিনদিনব্যাপী নির্বাচনবিষয়ক রিপোর্টিং প্রশিক্ষণের সমাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি একথা বলেন।

নির্বাচনের সময় সাংবাদিকের প্রত্যুৎপন্নমতিতা নিয়ে কাজ করার পরামর্শ দিয়ে আবু আলম মো. শহিদ খান বলেন, পরিবেশ-পরিস্থিতি বিবেচনা করে প্রতিবেদন তৈরি ও কাভারেজের বিষয়টিকে প্রাধান্য দিতে হবে। নির্বাচনকালীন গণমাধ্যমকর্মীদের ইতিবাচক ভূমিকার ওপর গুরুত্বারোপ করে তিনি বলেন, সাংবাদিকদের প্রতিবেদনই পারে নির্বাচনসংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ডে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে।

অনুষ্ঠানের সভাপ্রধান প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ নির্বাচনকালীন প্রতিবেদন তৈরির সময় সংবিধান, নির্বাচনি আচরণবিধি ও অন্যান্য বিষয় যেন সাংবাদিক মেনে চলেন, সে বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন। এছাড়া নির্বাচনি প্রতিবেদন তৈরির ক্ষেত্রে মাঠ পর্যায়ে কাজ করার কথাও উল্লেখ করেন তিনি।

অনুষ্ঠানে পিআইবির পরিচালক (অধ্যয়ন ও প্রশিক্ষণ, চলতি দায়িত্ব) শেখ মজলিশ

রংপুর বিভাগের বিভিন্ন জেলার সাংবাদিকদের তিনদিনব্যাপী নির্বাচনবিষয়ক রিপোর্টিং প্রশিক্ষণের সমাপন অনুষ্ঠানে বক্তব্য দিচ্ছেন প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ

ফুয়াদ উপস্থিত ছিলেন। পিআইবির প্রতিবেদক এম এম নাজমুল হাসানের সমন্বয়ে প্রশিক্ষণে ২৮ জন সাংবাদিক অংশ নেন।

পিআইবির কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত

পিআইবির কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য 'myGov Implementation: Service Validation' শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয় ২৯ নভেম্বর। কর্মশালায় প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদের সঞ্চালনায় আলোচক হিসাবে আলোচনা করেন পিআইবির পরিচালক (প্রশাসন, চলতি দায়িত্ব) মো. জাকির হোসেন ও এটুআইয়ের প্রতিনিধি। কর্মশালায় র‍্যাপোর্টিয়ারের দায়িত্ব পালন করেন প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর প্রভাষক ও বিকল্প ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা myGov টিমের শুভ কর্মকার। কর্মশালায় পিআইবির ১৫ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী অংশগ্রহণ করেন।

অসাম্প্রদায়িকতা ও মানুষের মুক্তির দর্শন প্রতিফলিত হয়েছে সংবিধানে - হেদায়েতুল্লাহ আল মামুন

সংবিধানে অসাম্প্রদায়িক চেতনা ও মানুষের মুক্তির দর্শন প্রতিফলিত হয়েছে। বঙ্গবন্ধু এই চেতনা ধারণ করতেন বলেই সংবিধানে সবার

রাজশাহী বিভাগের বিভিন্ন জেলার সাংবাদিকদের তিনদিনব্যাপী নির্বাচনবিষয়ক রিপোর্টিং প্রশিক্ষণের সমাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি সাবেক সিনিয়র সচিব হেদায়েতুল্লাহ আল মামুন নিজের লেখা উপনিবেশবাদ ও বাঙালির সংস্কৃতি গ্রন্থটি পিআইবি'র মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদকে উপহার হিসাবে দেন

উপরে স্থান দিয়েছেন, যা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মন্তব্য করেন সাবেক সিনিয়র সচিব হেদায়েতুল্লাহ আল মামুন।

৩০ নভেম্বর প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর সেমিনার কক্ষে রাজশাহী বিভাগের বিভিন্ন জেলার সাংবাদিকদের তিনদিনব্যাপী নির্বাচনবিষয়ক রিপোর্টিং প্রশিক্ষণের সমাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে একথা বলেন তিনি।

সাবেক সিনিয়র সচিব হেদায়েতুল্লাহ আল মামুন আরও বলেন, একাত্তরের মার্চে বঙ্গবন্ধুর ভাষণে যে মুক্তির বার্তায় সমগ্র জাতি উদ্বুদ্ধ হয়েছিল, তা মানবমুক্তি হিসাবে গণ্য। তিনি আরও বলেন, সাংবাদিকদের নির্বাচনের সময় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে হবে। কারণ, জনসাধারণ এ মাধ্যমেই সব তথ্য পায়। সেজন্য বস্তুনিষ্ঠ প্রতিবেদন তৈরির ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

অনুষ্ঠানের সভাপ্রধান প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ নির্বাচনকালীন সাংবাদিকদের প্রতিবেদন তৈরির সময় ভুল বা বিভ্রান্তি এড়িয়ে চলার পরামর্শ দেন। তিনি বলেন, অসংলগ্ন কথাবার্তা বা সংবেদনশীল প্রতিবেদনে ভিন্ন ধারণা তৈরি হয় জনমনে। এসব বিবেচনায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

অনুষ্ঠানে প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ প্রধান অতিথিকে পিআইবি প্রকাশিত কয়েকটি প্রকাশনা উপহার দেন। একই সময়ে প্রধান অতিথি হেদায়েতুল্লাহ আল মামুন তার নিজের লেখা 'উপনিবেশবাদ ও বাঙালির সংস্কৃতি' গ্রন্থটি পিআইবির মহাপরিচালককে উপহার হিসাবে দেন।

অনুষ্ঠানে পিআইবির পরিচালক (অধ্যয়ন ও প্রশিক্ষণ, চলতি দায়িত্ব) শেখ মজলিশ ফুয়াদ উপস্থিত ছিলেন। পিআইবির সহকারী প্রশিক্ষক জিলহাজ উদ্দিন নিপুণের সমন্বয়ে প্রশিক্ষণে ২৮ জন সাংবাদিক অংশ নেন।

পিআইবি'র কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য 'myGov Implementation: Service Validation' শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালায় উপস্থিত প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ ও অন্যান্য কর্মকর্তা এবং এটুআইয়ের প্রতিনিধিরা

প্রতিবন্ধিতা কোনো বাধা নয়

প্রতিবন্ধিতা কখনো বাধা হতে পারে না। কারণ এটা জিনগত ও পারিপার্শ্বিক বিভিন্ন সমস্যার কারণে সৃষ্ট। বর্তমান সরকার প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিষয় বিবেচনায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, অফিস-আদালতসহ বিভিন্ন স্থানে অবকাঠামোগত

উন্নয়ন সাধন করছে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সঠিক পরিচর্যা করতে পারলে কর্মক্ষেত্রে তারা স্বাভাবিক মানুষের চেয়ে বেশি কর্মদক্ষ হয়ে ওঠবে। একসময় প্রতিবন্ধিতাকে সমাজের বোঝাস্বরূপ বিবেচনা করা হতো। এখন এটা সত্য প্রমাণিত যে, প্রতিবন্ধিতা কোনো অভিশাপ নয়।

১১ ডিসেম্বর 'গ্লোবাল ডিসঅ্যাবিলিটি সামিটে বাংলাদেশ সরকারের দেওয়া প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে সাংবাদিকদের অবহিতকরণ এবং দক্ষতা উন্নয়ন' বিষয়ক কর্মশালায় আলোচকরা এসব কথা বলেন। অ্যাকসেস বাংলাদেশ ফাউন্ডেশন ও প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি) এ কর্মশালার আয়োজন করে। পিআইবির সেমিনার কক্ষে এ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ কর্মশালা উদ্‌বোধন করেন। এতে স্বাগত বক্তব্য দেন অ্যাকসেস বাংলাদেশ ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক আলবার্ট মোল্লা। কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর পরিচালক (অধ্যয়ন ও প্রশিক্ষণ, চলতি দায়িত্ব) শেখ মজলিশ ফুয়াদ।

কর্মশালার উদ্‌বোধক পিআইবির মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ বলেন, প্রতিবন্ধীদের অগ্রযাত্রা মসৃণ করতে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিত ও সামাজিক বৈষম্য দূরীকরণে কুসংস্কার প্রতিরোধের ক্ষেত্রে সাংবাদিকদের প্রতিবেদন ও ফিচার তৈরির ওপর জোর দেন। এছাড়া প্রতিবন্ধীদের অধিকার, কর্মক্ষেত্রে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহারে সহায়তাসহ ভাষা (শব্দচয়নের) প্রয়োগে সংযমী হওয়ার কথা বলেন তিনি। পিআইবির মহাপরিচালক বলেন, সাংবাদিকতার শক্তিমত্তা তখনই প্রকাশ পায়, যখন সমাজের পিছিয়ে পড়া বা অনগ্রসর জাতিকে তাদের ন্যায্যতা সমাজের সামনে উপস্থাপন করা হয়।

বৈঠকে অ্যাকসেস বাংলাদেশ ফাউন্ডেশনের চেয়ারপারসন মহুয়া পাল বলেন, প্রতিবন্ধিতা কখনো বাধা হতে পারে না। কারণ, এটা জিনগত ও পারিপার্শ্বিক বিভিন্ন সমস্যার কারণে সৃষ্ট। বর্তমান সরকার প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিষয় বিবেচনায় রেখে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, অফিস-আদালতসহ বিভিন্ন স্থানে অবকাঠামোগত উন্নয়ন সাধন করছে।

কর্মশালায় অ্যাকসেস বাংলাদেশ ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক আলবার্ট মোল্লা বলেন, পরিবার ও সমাজে অসচেতনতার কারণে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের

'গ্লোবাল ডিসঅ্যাবিলিটি সামিটে বাংলাদেশ সরকারের দেওয়া প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে সাংবাদিকদের অবহিতকরণ এবং দক্ষতা উন্নয়ন' বিষয়ক কর্মশালায় বক্তব্য দিচ্ছেন প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ

জীবন একসময় দুর্বিষহ হয়ে পড়ে। কিন্তু আমরা যদি সঠিক পরিচর্যা ও চিকিৎসা করাতে পারি তবে তারা স্বাভাবিক মর্যাদাপূর্ণ জীবনযাপন করতে সক্ষম হবে। বর্তমান সরকার প্রতিবন্ধিতা শনাক্তকরণ করে সুবর্ণ কার্ডের বিপরীতে ভাতা, শিক্ষা উপবৃত্তি ও অনুদানসহ নানাবিধ সুযোগ প্রদান করছে।

আলোচনায় বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক খায়রুজ্জামান কামাল অংশগ্রহণ করেন। তিনি মূলত সংবাদে ডিসঅ্যাবিলিটি উপস্থাপনার কৌশল ও সমাজে ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে করণীয় শীর্ষক আলোচনা করেন। সংবাদ উপস্থাপনের ক্ষেত্রে তিনি পাঠক ও দর্শকের বিষয়টি মাথায় রেখে প্রস্তুত করার কথা বলেন।

কর্মশালায় যমুনা টেলিভিশনের স্টাফ রিপোর্টার তাজনুর ইসলাম বলেন, বর্তমানে গণমাধ্যম প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও তাদের মানসিক এবং শারীরিক স্বাস্থ্য নিয়ে ইতিবাচক প্রতিবেদন তৈরি করছে। যার প্রভাব সমাজে পরিলক্ষিত হয়। এসব প্রতিবেদনের কারণে বর্তমানে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে নিয়ে উপহাস ও এড়িয়ে চলার প্রবণতা হ্রাস পেয়েছে। এছাড়া তিনি ক্লিক বেজ নিউজের যুগে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনে শব্দচয়ন, ছবি ও ভিডিয়ো উপস্থাপনের ওপর জোর দেন।

দৈনিক কালবেলার স্টাফ রিপোর্টার শাহনেওয়াজ খান সুমন বলেন, কর্মক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করা নাগরিক, সমাজ ও রাষ্ট্রের দায়িত্ব। তিনিও সংবাদ উপস্থাপনের ক্ষেত্রে পাঠকের বিষয়টি মাথায় রেখে কাজ করেন বলে জানান।

কর্মশালায় দৈনিক ইত্তেফাকের রাবেয়া বেবী বলেন, গণমাধ্যমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির উন্নয়ন, উপস্থাপন এমনকি সবল-দুর্বল, কুটিল চরিত্র প্রভৃতি বিষয় প্রচার করা হয়; যা মূলত সমাজে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। রাবেয়া বেবী গণমাধ্যমে ডিসঅ্যাবিলিটি উপস্থাপনের ক্ষেত্রে ভুক্তভোগী কীভাবে টিকে থাকে কর্মক্ষেত্রে, তার ভূমিকা ও পদবি এমনকি সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার বিষয় নিয়েও আলোচনা করেন। এছাড়া প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকারভিত্তিক সিদ্ধান্তগ্রহণ, ক্ষমতায়ন ও জাগরণের বিষয় তুলে ধরেন।

দৈনিক ভোরের কাগজের প্রতিবেদক মরিয়ম সেজুতি গণমাধ্যমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির উপস্থাপনের ক্ষেত্রে ভারসাম্যতার কথা উল্লেখ করেন। তিনি প্রতিবন্ধী আইন ও নীতিমালা নিয়ে আলোচনা করেন।

অনলাইন নিউজ পোর্টাল ঢাকা মেইলের সিনিয়র প্রতিবেদক মো. বুরহানউদ্দিন মিডিয়া বা গণমাধ্যমগুলোয় প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সক্ষমতা বাড়ানোর ওপর জোর দিয়ে বলেন, মিডিয়া মনিটরিং বা গণমাধ্যম পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে কর্মক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অংশগ্রহণ ও কীভাবে প্রতিবেদনে উপস্থাপন করা হচ্ছে, সেটা অন্যতম গুরুত্ব বহন করে। কারণ, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে প্রতিবেদনে শব্দ, ছবি, ভিডিয়োতে কীভাবে উপস্থাপন করা হচ্ছে, সেটা মুখ্য বিষয়। সেখানে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে দুর্বল নাকি সবল, কুটিল, অগ্রগতি বা অবনমন কোনটি প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে, সেটা বিবেচ্য বিষয়।

কর্মশালায় অ্যাকসেস বাংলাদেশ ফাউন্ডেশনের প্রজেক্ট অফিসার এলিজাবেথ ইতি ও প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর প্রশিক্ষণ বিভাগের সহকারী প্রশিক্ষক জিলহাজ উদ্দিন নিপুণের সমন্বয়ে ২৬ জন সাংবাদিক অংশ নেন।

ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিই জাতিসত্তার ধারক

'হৃদয়ে রবে প্রেরণায়' স্লোগানকে ধারণ করে শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস উপলক্ষ্যে পিআইবি আয়োজিত সেমিনারে বক্তব্য দিচ্ছেন প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ

একটি জাতিসত্তা নিশ্চিহ্ন করতে হলে সেই জাতির ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে ধ্বংস করতে হয়। নতুবা সেই জাতির পুনর্জন্ম হয়। আর জাতির ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি ধারণ করে রাজনীতিবিদ, সাংবাদিক, শিক্ষক, সাহিত্যিক ও কবি। তাই পাকিস্তানি সামরিক জান্তা একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধে নিশ্চিত পরাজয় বুঝতে পেরে বাছাই করে ধারাবাহিকভাবে রাজনীতিবিদ, সাংবাদিক, শিক্ষক, সাহিত্যিক ও কবিদের হত্যা করে। যেন বাঙালি জাতি কখনো নিজস্ব সত্তায় দাঁড়াতে না পারে।

১৪ ডিসেম্বর 'হৃদয়ে রবে প্রেরণায়' স্লোগানকে ধারণ করে শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস উপলক্ষ্যে প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর আয়োজনে পিআইবির সেমিনার কক্ষে আলোচকরা এসব কথা বলেন। পিআইবির মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ সেমিনারে মডারেটরের দায়িত্ব পালন করেন। আলোচনা করেন শহিদ সাংবাদিক সিরাজুদ্দীন হোসেনের সন্তান জাহীদ রেজা নূর ও শহিদ সাংবাদিক শিবসাধন চক্রবর্তীর সহোদর বীর মুক্তিযোদ্ধা তরুণ তপন চক্রবর্তী। সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগের সহযোগী সম্পাদক আবুল কালাম মোহাম্মদ শামসুদ্দিন, পরিচালক (প্রশাসন, চলতি দায়িত্ব) মো. জাকির হোসেন, অধ্যয়ন ও প্রশিক্ষণ বিভাগের পরিচালক (চলতি দায়িত্ব) শেখ মজলিশ ফুয়াদ এবং গবেষণা ও তথ্য সংরক্ষণ বিভাগের পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব) ড. কামরুল হক।

সেমিনারের মডারেটর প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ বলেন, একাত্তরের স্বাধীনতাযুদ্ধের সময় বাংলাদেশের গণমাধ্যম ছিল অবরুদ্ধ। তারপরও সাংবাদিকরা বিভিন্ন পন্থায় মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত তথ্য বিভিন্ন মাধ্যমে প্রকাশ করে জনমনে আস্থার সঞ্চার করেছেন। তবে মুক্তিযুদ্ধের সময় কিছু সাংবাদিকের গুপ্তচরবৃত্তির কথাও উল্লেখ করেন তিনি। এছাড়া যুদ্ধের সময় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় ক্লাস ও পরীক্ষা নেওয়া শিক্ষক এবং অংশগ্রহণ করা শিক্ষার্থীদের কথা বলেন। নতুন প্রজন্মের সাংবাদিকদের তিনি ইতিহাসের পাঠোদ্ধারের সহায়তায় ভূমিকা রাখার কথা বলেন। মুক্তিযুদ্ধকালে শিল্পীসমাজের ভূমিকা নিয়েও কথা বলেন মহাপরিচালক।

আলোচনায় শহিদ সাংবাদিক সিরাজুদ্দীন হোসেনের সন্তান জাহীদ রেজা নূর বলেন, একটি জাতিসত্তা নিশ্চিহ্ন করতে হলে সেই জাতির ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে ধ্বংস করতে হয়। নতুবা সেই জাতির পুনর্জন্ম হয়। আর জাতির ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি ধারণ করেন রাজনীতিবিদ, সাংবাদিক, শিক্ষক, সাহিত্যিক ও কবি। তাই পাকিস্তানি সামরিক জান্তা একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধে নিশ্চিত পরাজয় বুঝতে পেরে বাছাই করে ধারাবাহিকভাবে রাজনীতিবিদ, সাংবাদিক, শিক্ষক, সাহিত্যিক ও কবিদের হত্যা করে। যেন বাঙালি জাতি কখনো নিজস্ব সত্তায় দাঁড়াতে না পারে। তিনি বলেন, বাঙালি জাতি অসাম্প্রদায়িক ও সামাজিক সাম্যের মাধ্যমে একটি সোনার বাংলা গড়তে চেয়েছিল। কিন্তু পঁচাত্তরের পনেরোই আগস্টের পর সব এলোমেলো হয়ে যায়। জাহীদ রেজা নূর বলেন, একাত্তরে ঢাকার ম্যাসাকারের দায়িত্বে ছিল রাও ফরমান আলী এবং ঢাকার বাইরে খাদেম হোসেন রাজা। তৎকালীন সাংবাদিক সায়মন ড্রিং ৩০ মার্চ ঢাকার প্রকৃত চিত্র দ্য টেলিগ্রাফে তুলে ধরেন। পাকিস্তানিরা নিশ্চিত পরাজয় বুঝতে পেরে যখন এদেশকে মেধাশূন্য করতে তৎপর, এর একটি বিবরণ দিয়ে তিনি বলেন, একাত্তরের ১০ ডিসেম্বর রাও ফরমান আলী গভর্নরের সঙ্গে দেখা করতে যান। এরপর ১০ থেকে ১৩ ডিসেম্বর তারা পর্যায়ক্রমে সাংবাদিক হত্যা করে, ১৪ ডিসেম্বর শিক্ষক, ১৫ ডিসেম্বর চিকিৎসক এভাবে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত হত্যা করতে থাকে। যদি ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীন না হতো, তাহলে তারা আরও কতটা ভয়ঙ্কর হতো সেটা অনুমানযোগ্য।

শহিদ সাংবাদিক শিবসাধন চক্রবর্তীর সহোদর বীর মুক্তিযোদ্ধা তরুণ তপন চক্রবর্তী মুক্তিযুদ্ধ, মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি বলেন, মুক্তিযুদ্ধ ছিল এদেশের মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার সশস্ত্র সংগ্রাম, যা আমরা নয় মাস যুদ্ধ করে ছিনিয়ে এনেছি। তিনি পাকিস্তানে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বাংলাদেশি সৈনিকদের বিরুদ্ধে গঠিত ট্রায়ালের কথাও উল্লেখ করেন।

পিআইবির পরিচালক (প্রশাসন) মো. জাকির হোসেন বলেন, একটি জাতিকে মেধাশূন্য করতে হলে যা করার দরকার, পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী এর সবকিছুই করেছিল একাত্তরে। তারা বাছাই করে এদেশের রাজনীতিবিদ, সাংবাদিক, শিক্ষক, চিকিৎসকসহ বুদ্ধিজীবীসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার লোককে হত্যা করে বাঙালি জাতিসত্তা চিরতরে নিস্তব্ধ করে দিতে চেয়েছিল। আর এ কাজ করতে সক্ষম হয়েছিল এদেশীয় তাদের দোসর রাজাকার, আলবদর, আলশামসের সহায়তায়। তারা উল্লেখযোগ্যসংখ্যক বাংলার শ্রেষ্ঠ সন্তান বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করে। বুদ্ধিজীবী হত্যার ঠিক দুইদিন পর ১৬ ডিসেম্বর জেনারেল নিয়াজির নেতৃত্বাধীন বর্বর পাকিস্তানি বাহিনী আত্মসমর্পণ করে এবং স্বাধীন দেশ হিসাবে বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে।

সেমিনারটিতে প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর প্রশিক্ষণ বিভাগের প্রশিক্ষক (চলতি দায়িত্ব) মোহাম্মদ শাহ আলমের সমন্বয়ে ২৮ জন সাংবাদিক, কবি, সাহিত্যিক ও গবেষক অংশগ্রহণ করেন।